নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা

শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী



নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭১, দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০০৩. গ্রন্থস্বত্ব : যাহেদ করিম, প্রচ্ছদ : সুখেন দাস, বিজয় রায় কর্তৃক নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫ প্যারী দাস রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং দিলীপ রায় কর্তৃক অনু প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২ জয় চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

বিষয়-সূচী

[প্রথম খণ্ড]

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ : ১-১০ ॥

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ১১-১৪ ॥

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ১৫-২২ ॥

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ২৩-৩৯ ॥

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ৪০-৪৮ ॥

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ৪৯-৮৩ ॥

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাটক ও কাব্য

কাব্য ও নাটকের মূলগত সত্যের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, অর্থাৎ উভয়েরই উদ্দেশ্য হইতেছে বিশেষকে নির্বিশেষ করিয়া তোলা। সেইজন্যই বোধহয় প্রাচীন আলংকারিকরা কাব্য ও নাটককে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য—কাব্যকে তাঁহারা এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। আবার 'কাব্যেষ্‌ নাটকম্‌ রম্যম্‌'—এই কথাটি হইতে বোঝা যায় যে, তাঁহাদিগের মতে সকল প্রকার কাব্যের মধ্যে নাটকই শ্রেষ্ঠ। কাব্য ও নাটকের মূলগত সত্য এক হইলেও, যে অর্থে আলংকারিকরা কাব্যকে শ্রব্যকাব্য বলিয়া থাকেন, নাটকের ঠিক সে অর্থ নয়।[১] চোখে না দেখিয়া শুধু কানে শুনিয়া মনের দ্বারাই শ্রব্যকাব্যের রসগ্রহণ করিতে পারা যায়; কিন্তু নাটকের বেলায় চোখ, কান ও মন—এই তিনেরই প্রয়োজন হয়। এই তিনের সমন্বয়ে যে রসলোকের সৃষ্টি হয়, তাহাই নাটকের জগৎ।

কাব্য ও রস

কাব্য ও নাটক উভয়েরই উদ্দেশ্য হইতেছে রস-সৃষ্টি। মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে মানসিক ও বাহ্যিক দুই প্রকার উপাদান আছে। আলংকারিকরা বলেন, ঐ বাহ্যিক উপাদানের ক্রিয়ায় মনের ভাব রূপান্তরিত হইলে রসে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঐ বাহ্যিক উপাদানের রসে পরিণতির একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন :—

> "বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রং, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে: তাহা নহে,—তাহার সঙ্গে আমাদের ভালোলাগা, মন্দলাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত। তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্ররসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে। এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।" —(সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ)

মানুষের এই হৃদয়বৃত্তি নানা অবস্থায় তরঙ্গিত। কাব্যের প্রথম পরিচয়

১। বাঙলা সাহিত্যে নাটক, প্রহসন প্রভৃতির ধারণা পাশ্চাত্ত্য আদর্শ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র অনুযায়ী রূপকের ১০টি শ্রেণীর ১টি হইতেছে নাটক।

হইল ভাষার সাহায্যে হৃদয়ের গতিচাঞ্চল্যকে প্রকাশ করা। হৃদয়ের এই গতিচাঞ্চল্য ভাব ও আবেগের মধ্য দিয়া কাব্য পাঠকের মনে আনন্দের সঞ্চার করে। লৌকিক ভাব বা আবেগের সংস্পর্শে অন্তরের মধ্যে যে আনন্দের উৎপত্তি হয়, সেই আনন্দময় অবস্থায় আমাদের অনুভূতি যে আস্বাদনের কাজটা করিতে থাকে, সেই আস্বাদনের অবস্থাটাই রসের অবস্থা। ভাষার মধ্যে রসের প্রকাশ হইলেই তাহাকে কাব্য বলা হয়। 'রসাত্মক বাক্য'—মাত্রেই যে কাব্য তাহা সংস্কৃত আলংকারিকরা বলিয়া গিয়াছেন। রস স্বপ্রকাশ, অখণ্ড ও চিন্ময়। সেইজন্য সমস্ত রসই মূলতঃ এক। 'ভবেৎ সৌন্দর্যমঙ্গানাং সন্নিবেশঃ যথোচিতম্'—কাব্য সুন্দর হইতে হইলে কাব্যের রস যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতেই কাব্য সার্থক হইয়া ওঠে।

রস ও আর্ট

আমরা যাহাকে রস বলি, ইউরোপীয়েরা তাহাকেই বলে আর্ট। রস ও আর্ট—উভয়েই আনন্দের অনুভূতি ও অনুরাগ হইতে জন্মলাভ করে। ভারতীয় দার্শনিকরা পরমেশ্বরকেই রসস্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে, রসস্বরূপের রস প্রাপ্ত হইয়াই জীব আনন্দিত হয়। যাহা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই ভগবানের অমৃতরূপ, আনন্দরূপ। ধীর ব্যক্তিগণ বিজ্ঞানদ্বারা ঐ রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। ইহাই জীবের পরমগতি, পরমসম্পদ্, পরমলোক এবং পরমানন্দ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও দৃশ্যমান্ জগৎ ব্যতীত চিন্ময় জগতের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। স্বভাব, মনোবৃত্তি, আত্মা, ভগবানের রসময়তা ও সৌন্দর্যের পরিচয় তাঁহারা বহু স্থানে দিয়াছেন। তাহাদিগের মতে আর্টের মধ্যে মানস-আদর্শই শিল্প-কলার গঠনরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আর্টিস্ট নিজের অন্তরে একটা বিশেষ মুহূর্তে যে সত্যের সন্ধান পান, তাহাকেই তিনি স্থিতিশীল রূপদান করেন। তখন তাঁহার ব্যক্তি-অনুভূতি একান্ত তাঁহার নিজের নয়। তাই আর্টিস্টমাত্রে কিছু পরিমাণে নির্বিশেষ এবং আর্টমাত্রেই কিছু পরিমাণে ব্যক্তিনিরপেক্ষ। আর্ট মানসিক আদর্শ ও ভাবরাশির সাংকেতিক রূপ। প্রস্তর, শব্দ ও বাক্যের সাহায্যে মানসিক আদর্শ ও অনুভূতিকে বাহিরে প্রকাশ করায় আর্টের সার্থকতা।

"The universal need for expression in art, lies, therefore, in man's rational impulse to exalt the inner and outer world into a spiritual consciousness for himself, as an object in which he recognises his own self."—(Hegel)

সুতরাং ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে রস ও আর্টের উপলব্ধি বিষয়ে কোন ভিন্নতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সুপণ্ডিত বিপিনচন্দ্র

পাল মহাশয় এই রস ও আর্টের প্রকৃতিগত সমতার একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

"*Anandam* or bliss or joy is the soul of all art. This *Anandam* is the eternal quest of art, whether of painting or sculpture or architecture or poetry or music. A synonym for this *Anandam* in Hindu thought and realisation is *Rasa*. The Absolute has been described in the *Upanishad* as *Rasa*. 'রসো বৈ সঃ'—He is *Rasa*. রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি,—Through gaining this *Rasa* all beings are possessed with *Anandam*"—(Bengal Vaisnavism)

আর্ট ও সৌন্দর্য

আর্টের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে সৌন্দর্য-সৃষ্টি। সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। "There is but one power to which all are eager to bow down, to which all take pride in paying homage; and that is the power of beauty"—(Hare) মানুষের এই সৌন্দর্যস্পৃহা হইতেই আর্টের জন্ম হইয়াছে। কিন্তু সংযমহীন ভোগীর নিকট সৌন্দর্য কখনও প্রকটিত হয় না। তপস্যারত যোগীর ন্যায় নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারিলেই সৌন্দর্যের মর্মস্থান হইতে রস গ্রহণ করিতে পারা যায়।

"বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যের সমস্ত মহিমার অন্তঃপুরে যে সতীলক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন, তিনিও আমাদের সম্মুখেই আছেন, কিন্তু শুচি না হইলে দেখিতে পাইব না। যখন বিলাসে হাবুডুবু খাই, ভোগের নেশায় মাতিয়া বেড়াই, তখন বিশ্বজগতের আলোকবসনা সতীলক্ষ্মী আমাদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধান করেন। এ-কথা ধর্মনীতি-প্রচারের দিক হইতে বলিতেছি না; আনন্দের দিক্ হইতে—যাহাকে ইংরেজীতে আর্ট বলে—তাহারই তরফ হইতে বলিতেছি।" (সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ)

সৌন্দর্যের সঙ্গে আমাদের আনন্দের সম্বন্ধ আছে। এই আনন্দ আমাদের চিত্ত-মুক্তি আনিয়া দেয়। পূর্ণতা বোধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ম-চর্চাকে, নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলেই এই চিত্ত-মুক্তি লাভ করা যায়। চোখ ও মনের দৃষ্টির সহযোগিতায় সৌন্দর্য আমাদের নিকট প্রকটিত হয়। সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্যের অনুভূতি এক হইয়া গেলে সাহিত্য সংগীত, চিত্রকলা সার্থক হইয়া ওঠে।

"মানুষ তাহার কাব্যে, চিত্রে, শিল্পে সত্যমাত্রকেই উজ্জ্বল করিয়া

তুলিতেছে। পূর্বে যাহা চোখে পড়িত না বলিয়া আমাদের কাছে অসত্য ছিল, কবি তাহাকে আমাদের দৃষ্টির সামনে আনিয়া আমাদের সত্যের রাজ্যের, আনন্দের রাজ্যের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছেন। সমস্ত তুচ্ছকে অনাদৃতকে মানুষের সাহিত্য প্রতিদিন সত্যের গৌরবে আবিষ্কার করিয়া কলাসৌন্দর্যে চিহ্নিত করিতেছে। যে কেবলমাত্র পরিচিত ছিল, তাহাকে বন্ধু করিয়া তুলিতেছে। যাহা কেবলমাত্র চোখে পড়িত, তাহার উপরে মনকে টানিতেছে।" (সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ)

ভারতীয় পণ্ডিতগণ, সৌন্দর্যতত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গীভূত করেন নাই। তাঁহারা রসতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে, ভগবান্ সুন্দর বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুন্দর। এক অদ্বিতীয় পুরুষই এক ভাবে জড়, এক ভাবে জীব এবং একভাবে জড় ও জীবের অতীত। তিনি ভিন্ন জগতে কোন সত্তা নাই, কোন তত্ত্ব নাই। সৌন্দর্যতত্ত্ব সেই অদ্বয় জ্ঞানের, রসের ও আনন্দের পরিপূর্ণ প্রকাশ। ভক্তি শাস্ত্রের মতে, রসই সৌন্দর্য। রসরাজই নিখিল সৌন্দর্যের খনি। ভূতসমূহ তাহার রস পান করিয়া পরমানন্দ ভোগ করে।

আর্ট ও নাটক

আর্টের প্রধান লক্ষ্য সৌন্দর্য-সৃষ্টি হইলেও, কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে, আর্ট মানুষের প্রয়োজন সাধনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। সৌন্দর্য অপেক্ষা প্রয়োজন প্রধান হইয়া পড়িলে আর্টের ধর্মচ্যুতি ঘটে। সেইজন্য আর্টকে চারুকলা (Fine Arts) এবং কারুকলা (Practical Arts)—এই দুই শাখায় বিচ্ছিন্ন করিয়া বিচার করা হয়। কারুকলার মধ্যে মানুষের নিত্য প্রয়োজনের ব্যবহারিক দিক্‌টা যত স্পষ্ট হইয়া ওঠে, শিল্প-সত্য তেমন প্রতীয়মান হয় না। কিন্তু চারুকলায় বস্তুর মধ্যে বস্তুর অতীত স্পর্শ সৃষ্টি করাই আর্টিস্টের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। রন্ধনবিদ্যা, অলংকার-নির্মাণ, গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি কারুকলার অন্তর্গত। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রবিদ্যা, সংগীত ও কাব্যকে চারু-কলা বলা হয়। কিন্তু নাটক, বাগ্মিতা, নৃত্যবিদ্যা প্রভৃতি খাঁটি চারুকলা নয়। সৌন্দর্য-সৃষ্টি ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, প্রযোগকৌশলের উপর ইহাদের সার্থকতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেইজন্যই ইহাদের মিশ্র-চারুকলা (Mixed Arts) নামে অভিহিত করা হয়। এখানেই কাব্য ও নাটকের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

নাটককে যে মিশ্র-চারুকলা বলা হয়, তাহার কারণ নাটকের অতিরিক্ত লক্ষণ হইতেছে অভিনয়। এই অভিনয় বলিতে বোঝা যায়—অভিনেতা, সাজসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ,দৃশ্যপট, সংলাপ, সংগীত ও দর্শক। অভিনয়কালে লৌকিক

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চোখে দেখিয়া কানে শুনিয়া এবং অন্তরে অনুভব করিয়া রসের মায়ালোকে পৌছিতে হয়। কিন্তু কাব্য-পাঠক বস্তুবিশ্বকে এরূপ প্রত্যক্ষভাবে দেখিবার সুযোগ পান না। তিনি কাব্যের সাংগীতিক ও চিত্র রূপ আপনার অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়া এক বিষয়ান্তর-নিরপেক্ষ রসলোকে উত্তীর্ণ হন। সেখানে তিনি তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া গভীর আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন। সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ সেই জন্যই এই আনন্দের উপলব্ধিকে 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলিয়াছেন।

নাটক ও কাব্যের প্রকাশভঙ্গী

সাহিত্য-হিসাবেও নাটক ও কাব্যের প্রকাশভঙ্গীতে যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। স্নেহ, শোক, ভয় প্রভৃতি ভাব যখন মানুষের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন তাহার সম্পূর্ণটা বাহিরে প্রকাশিত হয় না। কিছুটা ব্যক্ত হয়, কিছুটা গোপন থাকে। যাহা ক্রিয়া বা কথার দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহা নাট্যকারের সামগ্রী, যেটুকু গোপন থাকে তাহাতে কবির অধিকার।[২] বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নাটক ও মহাকাব্যের আংশিক স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। গীতিকাব্য, মহাকাব্য ও নাটক তিনই কাব্য এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ইহারা ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

> "মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে, ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক ও গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। * * সত্য বটে যে, গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে, নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যের অধিকার।"
>
> —(গীতিকাব্য—বঙ্কিমচন্দ্র)

নাটকে কবিত্ব

কবিত্ব নাটকের অন্যতম উপাদান হইলেও, কেবলমাত্র কবিত্ব থাকিলেই নাটক হয় না। নাটকীয় সৌন্দর্য বা নাট্যরস মানবজীবনের একটা বিশেষ ঘটনার মধ্যে নিহিত থাকে। ঘটনার সেই বাস্তবরূপকে নানা চরিত্র-সৃষ্টি ও অবস্থার মধ্য দিয়া প্রকাশ করা নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। মানব-চরিত্রের

২। নাটকে ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত প্রভৃতিরও স্থান রহিয়াছে। গ্রীক নাটক, শেক্সপীয়রের নাটক, আধুনিক রূপক প্রতীক প্রভৃতি নাটকে অব্যক্ত অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে।

সুন্দর ও অসুন্দর এই উভয়বিধ ব্যাপার লইয়া নাটকের সার্থকতা।[৩] একদিক্ ছাড়িয়া আর একদিক্ দেখান নাটকের পক্ষে সম্ভব নয়। সু-কে ফুটাইবার জন্য কু-র প্রয়োজন হয়। তথাপি কোন কিছুর আতিশয্য ভাল নয়। সুবিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

> "কবিত্বের রাজ্য সৌন্দর্য। নাটকের রাজ্য অনন্ত মানবচরিত্র। এখন মানব চরিত্রে সুন্দর ও কুৎসিত, এই দুই দিকই আছে। নাটকে মানুষের কুৎসিত দিকটাও দেখানর প্রয়োজন হয়। বস্তুতঃ নাটকে মানবচরিত্রের কুৎসিত দিক্ ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ সুন্দর দিক দেখান শক্ত। শেক্সপীয়র তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলিতে সমস্ত মানব-চরিত্র মন্থন করিয়াছেন। তাঁহার King Lear নাটকে যেমন বন্ধুত্ব, পিতৃস্নেহ আছে, তেমনি পিতৃবিদ্বেষ ও ক্রুরতা—স্বেচ্ছাচারিতা আছে। তাঁহার Hamlet-এ একদিকে ভ্রাতৃহত্যা ও লালসা আছে, অপরদিকে পিতৃভক্তি ও প্রেম আছে। Othello-তে যেমন সারল্য ও পাতিব্রত্য আছে, তেমনই জিঘাংসা ও অসূয়া আছে। Julius Ceasar-এ যেমন পতিভক্তি ও দেশভক্তি আছে, তেমনই লোভ ও দণ্ড আছে। Macbeth-এ যেমন রাজভক্তি ও সৌন্দর্য আছে, তেমনি রাজদ্রোহিতা ও কৃতঘ্নতা আছে। * * নাটকে বীভৎস ব্যাপারের অবতারণা করিতে হইবে—সুন্দরকে আরও বেশি ফুটাইবার জন্য। যে নাটকে সুন্দর কিছু নাই, সেখানে জঘন্য ব্যাপারের অবতারণা করা অমার্জনীয়। এমন কি, নাটকে কুৎসিত ব্যাপারের আতিশয্য ও প্রাধান্য পরিহার্য।"
>
> —(ভবভূতি ও কালিদাস—দ্বিজেন্দ্রলাল)

নাট্যকাব্য

এক শ্রেণীর নাটক আছে যাহাতে নাটকীয় গুণ অপেক্ষা কাব্যাংশই বেশি। এ-গুলিকে নাট্যকাব্য (Dramatic poems) বলা হয়। এই ধরনের রচনায় নাটকের ন্যায় কথোপকথন থাকে, কিন্তু নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, ঘটনার পরিবর্তন বা মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ কোনটাই তেমন দেখা যায় না। আকৃতির বিচারে ইহারা নাটক, কিন্তু প্রকৃতির বিচারে ইহারা গীতিকাব্য। রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী', 'নরকবাস', 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' এবং 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' এই শ্রেণীর রচনা। Dramatic monologue বা নাটকীয় আত্মভাষণ ঠিক এ পর্যায়ভুক্ত নয়। নাটকীয় আত্মভাষণে কোন বিশেষ ব্যক্তি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শ্রোতাদের

৩। কাব্যও তাই। তবে কাব্য প্রধানতঃ কল্পনাধর্মী আর নাটক বাস্তবতা প্রধান। নাটকে সেজন্য মানবচরিত্রকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

নিকট আপন মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু নাট্যকাব্যের মধ্যে এমন একটা নাটকীয় পরিণতি থাকে, যাহা নাটকীয় বিষয়বস্তুকে গীতিকাব্যের ভিতর দিয়া একটা বিশিষ্ট সার্থকতার পথে পৌঁছিয়া দেয়। তথাপি এই শ্রেণীর রচনায় গীতোচ্ছ্বাসের প্রবলতা থাকে বলিয়া কথোপকথনের আকারে রচিত হইলেও, এ-গুলি ঠিক নাটক নয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত মতটি প্রণিধানযোগ্য।

> "দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয় এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রথিত এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তৎশ্রেণীস্থ এমন নহে। এ দেশের লোকের সাধারণতঃ উপরিউক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রথিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক, তাহার মধ্যে অনেকগুলি নাটক নহে। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রথিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। Comus, Manfred, Faust ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা ও উত্তররাম-চরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। * * আখ্যানকাব্যও নাটকাকারে গ্রথিত হইতে পারে; অথবা গীত-পরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপধারণ করিতে পারে। বাঙ্‌লা ভাষায় শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই।" —(গীতিকাব্য—বঙ্কিমচন্দ্র)

কথোপকথন যে নাটকের একমাত্র মাপকাঠি নয় বা অভিনয়োপযোগী নাটকমাত্রেই যে নাটক নয়, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশে অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া পঠিত ও অভিনীত হইলেও, আসলে সেগুলি নাটক নয়। নাটকের মধ্যে যে কঠিন সংযম, সীমারেখা এবং ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্ব থাকে, সে-গুলির মধ্যে তাহা লক্ষিত হয় না। সুতরাং সেগুলি কাব্যান্তর্গত সাহিত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাট্যকাব্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছে এবং সেগুলির মধ্যে সব কয়খানি যে নাটক হিসাবে সার্থকতা লাভ করিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। সেগুলি যে গীত-পরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতি-নাট্যের রূপ ধারণ করিয়াছে, সে কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।[৪] তবে সাহিত্য-হিসাবে সেগুলি যে চিরকাল সাহিত্য-রসিকদের আনন্দদান করিবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর নাটককেই Reading drama বলে।

৪। 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি অপেরার কথা এখানে বলা হইয়াছে। এগুলি মূলতঃ কাব্যধর্মী তা স্বীকার করিতেই হইবে।

পূর্বে অমিত্রাক্ষর ছন্দ অবলম্বনে এক প্রকার নাটক লেখা হইত, সেগুলি এই নাট্যকাব্যের অন্তর্গত। অধিকাংশ পৌরাণিক নাটক এইরূপ অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা ভাঙ্গা অমিত্রাক্ষরের আশ্রয়ে লেখা হইত। পদ্যে রচিত নাটকে হাস্যরসাত্মক দৃশ্যে গদ্য বসানোর রীতি ছিল। এইরূপ ধরনের নাটক এখন আর খুব বেশি লেখা হয় না। এখন মানুষের মন পরিবর্তিত হইয়া গদ্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পদ্যের অনাবিল সৌন্দর্য এখন আর তাহাদের মনকে নাড়া দিতে পারে না। কিন্তু এই কাব্য-সৌন্দর্য উপভোগের দিন আবার ফিরিয়া আসিবে, এরূপ মন্তব্য অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রীক নাটকের মধ্যে যে দুটি অংশ ছিল তাহার একটি বিবৃতির অংশ (Epic), অপরটি সংগীতাংশ (Lyric)। সূত্রধার বিবৃতি দিয়া যাহা বুঝাইতেছেন, কোরাস গায়কেরা তাহাই সংগীতে ফুটাইয়া তুলিতেন (The Greek drama as a literary composition, was therefore, a union of the epic and the lyric forms of poetry.) এলিজাবেথীয় যুগেও কবিতা নাটককে বহুল পরিমাণে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। তাই এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য-সমালোচক বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—

> "Verse drama perished because it became imitative and literary, instead of carrying on the Elizabethan traditions of creativeness and dramatic purpose ; it has perished justly. Yet may be a new age will arise to revitalize the form and give back to the theatre this powerful medium of expression"—(Theory of Drama—Nicoll)

গদ্যাত্মক ও পদ্যাত্মক নাটক

নাটক গদ্যাত্মক কি পদ্যাত্মক তাহা ধরা পড়ে রূপে নয় রসে। সমগ্র নাটকের মূল সুরটির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই এই প্রভেদ সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। নাটক গদ্যে লেখা হইলেই গদ্যাত্মক নয়, আবার পদ্যে লেখা হইলেও পদ্যাত্মক নয়। এমন অনেক নাটক আছে যাহা গদ্যে লেখা, অথচ সেগুলি পদ্যধর্মী। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'। তপতীর চরিত্র-সৃষ্টি, ঘটনা-বিন্যাস, ভাষা সবই কবিত্বময়। তপতীর মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর যে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার পরিণতি ঘটিয়াছে আন্তর-রসে। চরিত্রগুলি নিজেদের স্বাভাবিক ধর্মে পরিস্ফুট হয় নাই। চরিত্রগুলি এইরূপ হওয়াতে তাহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে সমুৎপন্ন ঘটনাবলীও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা হইতে ভিন্ন প্রকারের। আবার দ্বিজেন্দ্রলালের 'তারাবাই' ও 'ভীষ্ম' যথাক্রমে

অমিত্রাক্ষর ও গদ্য-পদ্যে রচিত। কিন্তু এই দুইখানি নাটকে কাব্যের মাধুর্য নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও এ-কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই দুইখানি নাটককে গদ্যাত্মক নাটক বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না।

আধুনিক কাব্য ও নাটক

নাটক বা দৃশ্যকাব্যের প্রধান লক্ষণ হইতেছে দৃশ্যত্ব। কিন্তু বর্তমানে দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্যের প্রভেদ ক্রমেই লোপ পাইতে বসিয়াছে। মানব-জীবনের অসংখ্য সাম্প্রতিক সমস্যা এখন কাব্য, নাটক, গল্প ও উপন্যাসের বিষয়ীভূত হইতেছে। লেখক নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বুদ্ধির সাহায্য লইতেছেন। এখনকার সাহিত্যে হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা চিত্তবৃত্তির* প্রাধান্য অধিক লক্ষিত হইতেছে। সেইজন্য গল্প ও উপন্যাসের ন্যায় নাটকও হইয়া উঠিতেছে সমস্যার ঘূর্ণিপাক। চিন্তাশীলতার আতিশয্যে বর্তমান নাট্য-সাহিত্য যতটা বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রবন্ধে পরিণত হইতেছে, ততটা দৃশ্যকাব্য হইতেছে না।

ভালো কথা শুনিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন মানুষের যথেষ্ট আছে। কিন্তু এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর একটা জিনিস আছে যাহার তাগিদ্ কাব্য, নাটক, শিল্প, সংগীত ও নৃত্যের অন্তরে। শিল্পী তাহাকে কথায়, ছন্দে, সুরে, বর্ণে, রেখা ও গতির ভঙ্গিমায় মূর্ত করিয়া চিরন্তন করিয়া রাখেন। আধুনিক কাব্য ও নাটকে এই চিরন্তনতার সুরটি আমরা হারাইতে বসিয়াছি।

আধুনিক কাব্য ও নাটকে যে সাধনা চলিতেছে তাহা কঙ্কালের সাধনা, তাহা প্রাণের সাধনা নয়। যেখানে প্রাণ নাই সেখানে আনন্দও নাই। আনন্দ না থাকিলে কোন রচনাই সাহিত্য-পদবাচ্য হয় না। দেহ ও আত্মা লইয়া যেমন একটি মানুষ, রূপ ও রসের সমন্বয়ে তেমনি সাহিত্য। একটিকে ছাড়িলে অপরটি অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। আধুনিক কাব্য ও নাটকে আত্মাকে বাদ দিয়া কেবল এই দেহ-নির্মাণের চেষ্টাই চলিতেছে। উহা সম্ভবতঃ সুলক্ষণ নয়।

প্রাকৃতজনের নিকট কাব্য ও নাটকের স্থান

কাব্য ও নাটকের প্রধান কার্য যদিও রসোদ্ঘাটন করা, তথাপি কাব্য ও নাটকের রস সবাই সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি লোকদের পক্ষে কাব্যের রস গ্রহণ করা যত সহজ, অশিক্ষিত ও অমার্জিত

* চিত্তবৃত্তি বলিতে বুদ্ধিবৃত্তি বা মনোবিশ্লেষণকে বুঝানো হইতেছে

রুচিসম্পন্ন লোকদের পক্ষে তত সহজ নয়। তাই প্রাকৃতজনের রসগ্রহণের পক্ষে নাট্যাভিনয়ই শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। নাটকের প্রত্যক্ষ অভিনয় তাহাদিগের মনে রসানুভূতির সহায়তা করে। এই নিমিত্তই পূর্বে আমাদের দেশে রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্যের সার্বজনীন গীতাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল।

বৌদ্ধেরা বোধহয় নাট্যাভিনয়ের দ্বারা সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা একদিকে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য যেমন পালি ভাষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি নাট্যাভিনয়কে তাঁহাদিগের ধর্মপ্রচারের বাহন করিয়াছিলেন। অশ্ব ঘোষের নাটক ও তাহার সহিত প্রাপ্ত আর একখানি নাটকের ভগ্নাংশ দেখিলেই এ-কথার সত্যতা প্রমাণ হইবে।

ইংলণ্ডের Mistery and Miracle Morality শ্রেণীর নাটকগুলি ঐ একই উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। নাট্যাভিনয়ের দ্বারা ধর্মপ্রচার ছিল খ্রীষ্টান-প্রচারকদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহারা মনে করিতেন, ঐ উপায়েই ধর্মের মূল তথ্যগুলি জনসাধারণের মনে সহজেই রেখাপাত করিবে। ঐ চেষ্টা আদপেই ব্যর্থ হয় নাই। ঐরূপ চেষ্টার ফলেই ইংলণ্ডে নাট্য-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাটক ও উপন্যাস

নাটক ও উপন্যাসের উদ্দেশ্যের মধ্যে তেমন কোন প্রভেদ নাই। পাঠক বা দর্শককে গল্প শোনান, ইহাই উভয় শ্রেণীর সাহিত্যেরই কাজ। মানুষের মনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, প্রতিহিংসা প্রভৃতি নানাবিধ দ্বন্দ্ব নাটক ও উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়। এক কথায় মানবজীবনের প্রতিচ্ছবির প্রতিফলনই নাটক ও উপন্যাসে দেখিতে পাওয়া যায়। কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ ও গতি যেমন একখানি নাটক সৃষ্টির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, তেমনি একখানি উপন্যাস রচনার পক্ষে এগুলির কোনটাকে বাদ দিলে একেবারেই চলে না। নাটক ও উপন্যাস সুখময় বা দুঃখময়, যে কোন ভাবেরই হইতে পারে এবং উভয়শ্রেণীরই উপকরণ বাস্তব হইতে সংগৃহীত হয়। সকল প্রকার শিল্প-সৃষ্টির ন্যায় ইহাদেরও মুখ্য লক্ষ্য নূতন রসলোকের সৃষ্টি করা।

নাটক ও উপন্যাসের রস সৃষ্টির কৌশল

কিন্তু নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের রসসৃষ্টি করিবার কৌশল এক নয়। "The novel relates and reports, the drama imitates by action and speech"—(Hudson). নাট্যকারের সৃষ্টি লোকে দেখিয়া থাকে, আর ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি লোকে পড়িয়া থাকে। এই দেখা এবং পড়ার কার্য কিন্তু এক; কারণ রসোপলব্ধি উভয়েরই লক্ষ্য। নাটকের প্রধান শিল্প-কৌশল প্রকাশিত হয় ঘটনা-পারম্পর্যে, উপন্যাসের হয় ঘটনা-বিন্যাসে। নাটকের ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হয় দ্রুতগতিতে, উপন্যাসের ঘটনা ধীর-মন্থর। উপন্যাসের আঙ্গিক রচিত হয় ঘটনা ও মানসিক অবস্থার বর্ণনায়, নাটকের বিকাশ হয় অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বে এবং ক্রিয়ায়। উপন্যাসে আত্মগত রস কল্পনার স্থান আছে, কিন্তু নাটকে তাহা একেবারেই নাই। সেইজন্য নাটকে নাটকীয় চরিত্র কথা বলে, উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নিজেই কথা বলেন। উপন্যাসের ব্যাখ্যা করেন স্বয়ং রচয়িতা, আর নাটকের ব্যাখ্যা করেন স্বয়ং অভিনেতা। নাট্যকার যেমন চরিত্র-সৃষ্টি করেন, ঔপন্যাসিকও তেমনি চরিত্র-সৃষ্টি করেন—কিন্তু নাট্যকারের সৃষ্ট-চরিত্র কথোপকথনের এবং কার্যের ভিতর দিয়া বিশ্লেষিত হয়, ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট-চরিত্র কার্যধারা ও বিবরণের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। নাটকের লক্ষ্য হইতেছে জীবন্ত মানুষকে প্রদর্শন

করা, আর উপন্যাসের লক্ষ্য হইতেছে জীবন-চরিত শোনান। নাট্যকার দর্শকের কল্পনার উপর যত বেশি দাবি করেন, ঔপন্যাসিক পাঠকের কল্পনার উপর তত বেশি দাবি করেন না। কারণ, ঔপন্যাসিক যাহা কিছু বলেন তাহা বুঝাইয়া বলেন; কিন্তু নাট্যকার তাঁহার সকল কথা বুঝাইয়া দিতে পারেন না, তাঁহার অনেক কথাই গোপন থাকিয়া যায়[১]: সেইজন্য সাধারণ লোকের কাছে উপন্যাস যেমন প্রিয় হয়, নাটক তেমন হয় না। কিন্তু সু-অভিনয়ের দ্বারা অভিনেতা যখন নাট্যকারের গোপন কথাটি বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তখন অনেক সময় তাহা জনসাধারণের প্রিয় হয়।

সাহিত্য-হিসাবে নাটকের মূল্য

কেবলমাত্র কথার সহিত সম্বন্ধযুক্ত সাহিত্যকেই বিশুদ্ধ সাহিত্য বলে। উপন্যাস বিশুদ্ধ সাহিত্য; কিন্তু নাটককে কেহ বিশুদ্ধ সাহিত্য বলে না, কারণ নাটক বলিতে কথা ছাড়া আরও অনেক জিনিসকে বোঝায়।
"The drama is a multiple art, using words, scenic effects music, the gestures of the actors, and the organizing talents of the producer"—(Ifor Evans). আবার আর্ট হিসাবেও নাটক নিছক চারুকলার মধ্যে পড়ে না। নাটককে অভিনয়ের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিতে হয় বলিয়া নাটককে মিশ্র-চারুকলা নামে অভিহিত করা হয়। উপন্যাসকে কাহারও মুখ চাহিয়া চলিতে হয় না। উপন্যাসের মধ্যে অভিনেতা, সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, কাহিনী বর্তমান থাকে। সুতরাং উপন্যাসকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। উপন্যাস কেবলমাত্র কথার সাহায্যে নিজেকে প্রকাশ করে বলিয়া উপন্যাস বিশুদ্ধ সাহিত্য, আর কোন বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী নয় বলিয়া উহা সম্পূর্ণাঙ্গ। উপন্যাসের মধ্যে এই বৈচিত্র্য ও প্রসারতা থাকে বলিয়া পাঠকের কাছে নাটক অপেক্ষা উপন্যাসের আদর বেশি। মুদ্রিত নাটক পাঠ করিলে তেমন আনন্দ পাওয়া যায় না, যেমন আনন্দ মুদ্রিত উপন্যাস পাঠে পাওয়া যায়। উপন্যাসে যে বর্ণনা, ব্যাখ্যা এবং লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির অনুশীলন থাকে, নাটকে তাহা থাকে না। মুদ্রিত নাটককে সমগ্র নাটকের কঙ্কাল বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে কেহ কেহ নাটকের প্রতি দৃশ্যে একটি করিয়া দীর্ঘ বিবৃতি জুড়িয়া দিতেছেন। কেহ কেহ আবার নাটকের সমাপ্তিতেও একটি ক্ষুদ্র ভাষণ সংযোগ করিয়া তাঁহাদিগের বক্তব্য বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতেছেন।

১। এই অভিমতই যথার্থ। পূর্বে নাটক ও কাব্যের প্রকাশভঙ্গী'র অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, 'যাহা ক্রিয়া বা কথার দ্বারা ব্যক্ত হয় তাহা নাট্যকারের সামগ্রী।' তা নাটকের ক্রিয়া প্রাধান্যকে বোঝানোর জন্যই বলা হইয়াছে।

এই সকল অতিরিক্ত সাহায্যের ফলে সাহিত্য-হিসাবে নাটক উপন্যাসের মত কিছুটা লোকপ্রিয় হইতেছে।

নাটক রচনার রীতি

রচনা লিখিতে হইলে যেমন ব্যাকরণ না মানিলে চলে না, নাটক রচনার কালেও তেমনি নাটক রচনার কৌশলগুলি না জানিলে চলে না। এই কৌশল অধিগত করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সেইজন্যই বোধ হয়, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র একবার বলিয়াছিলেন,—'যতপ্রকার রচনা আছে, নাটক রচনা সর্বাপেক্ষা কঠিন ও শ্রেষ্ঠ।' কথা-সাহিত্যিক নিজের ইচ্ছামত তাঁহার রচনাকে প্রসারিত করিতে পারেন, কিন্তু নাট্যকারের সে স্বাধীনতা নাই। নাট্যকার নাটকের কেন্দ্রগত রসকে লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার কল্পনাকে বিস্তৃত করিতে পারেন না। তাহা ছাড়া নাট্যকারকে রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকাইয়া দৃশ্য সাজাইতে হয় এবং অভিনয়ের সময় সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে হয়। নাটক দীর্ঘ হইলে অভিনয়োপযোগী হয় না। ঔপন্যাসিকের ন্যায় নাট্যকার তাঁহার কাহিনী যথেচ্ছা বাড়াইতে পারেন না, অথবা অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের সমাবেশ করিতে পারেন না। যে ঘটনা ও চরিত্র অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবে নাটকের কেন্দ্রগত রসের পরিপুষ্টি সাধন করে, নাট্যকারকে সেগুলি বাছিয়া বাছিয়া সন্নিবেশ করিতে হয়। অসাবধানী ও অজ্ঞ লেখকদের হাতে পড়িলে নাটক একেবারে মাঠে মারা যায়। উপন্যাস রচনার তেমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। তবুও অক্ষম লেখকের হাতে পড়িলে উপন্যাসও অনেকস্থলে শিথিল হইয়া পড়ে। কোন একখানি উপন্যাসের নাট্য-রূপ দিতে হইলে, উপন্যাসের অনেক ঘটনা ও চরিত্র বাদ দিতে হয়। আবার নাট্যরস পরিস্ফুটনের নিমিত্ত নাটকে অনেক নূতন দৃশ্য ও চরিত্রের সৃষ্টি করিতে হয়। উপন্যাসে বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইতে পারে, কিন্তু নাটকে একটিমাত্র ঘটনা বিচিত্র হইয়া ওঠে।

নাটক, উপন্যাস ও চিত্র-লিপি

নাটক ও উপন্যাসের সম্মিলন ঘটিয়াছে চলচ্চিত্রের চিত্র-লিপিতে। চলচ্চিত্রের চিত্র-লিপি উপন্যাস ও নাটকের আঙ্গিকে গঠিত হয় অর্থাৎ উপন্যাসের স্থান ও কালের বিস্তৃতি এবং নাটকের সংঘর্ষ ও সমাধান, এই সকল উপাদানই চলচ্চিত্রাভিনয়ে লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র চরিত্রের মুখ দিয়া কথা বলান ছাড়াও, অজস্র নরনারীর সমাবেশ, নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্য, বিচিত্র-পরিচ্ছদ, বহুবিধ সামাজিক প্রথা ও উৎসব, এই সবের পরিচয়

চলচ্চিত্র হইতে পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া সংগীত ও নৃত্যকলার নূতন নূতন সুর ও পরিকল্পনা সমগ্র কাহিনীটিকে উপভোগ্য করিয়া তোলে। এক কথায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্র অনেক কিছুই পরিবেশন করিয়া থাকে। সেইজন্য দেখা যাইতেছে, নাটক ও উপন্যাস চলচ্চিত্রের এই নবরূপ গ্রহণ করিয়া দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে এবং তাহারই ফলে নাটকের আদর যেন ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে।

বর্তমানে নাট্যাভিনয় অপেক্ষা চলচ্চিত্রের প্রদর্শনীতে অধিক লোক সমাগম হয়। ইহার কারণ হয়তো এই, ছায়াছবিতে জনসাধারণের মনোরঞ্জনার্থ যত রকম উপাদানের আয়োজন থাকে, নাটকে তাহা থাকে না। আর সুদক্ষ নট-নটীর সমাবেশও নাটক অপেক্ষা ছায়াছবিতে বেশি। এমন কি লোকপ্রিয় মৃত অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের ছায়াছবিতে দেখা সম্ভব হয়। প্রবেশ মূল্যও নাট্যালয় অপেক্ষা ছবিঘরগুলিতে অনেক কম। এত সুবিধা থাকিতেও, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের দেশের, বিশেষ করিয়া বাংলার ছায়াছবিগুলিতে সাহিত্যিক-মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। সেগুলি অবান্তর ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে মূল্যহীন হইয়া পড়িতেছে। অথচ চলচ্চিত্রের প্রতি-লিপি যে নিজস্বরূপের দিক দিয়া লিখিত সাহিত্যের সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারে, এমন উদাহরণও দুর্লভ নয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নাটক

রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী করিয়া যে সাহিত্য রচিত হয়, তাহাই সাধারণতঃ নাটক। নাটক চলিষ্ণু মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি, কিন্তু তাহা নাট্যাভিনয়ের দ্বারা পরিস্ফুট হয়। সেইজন্য নাটকমাত্রেই দৃশ্যকাব্য। আবার বহির্জগতের রূপের ভিতর দিয়া অন্তর সৌন্দর্যের মহিমা অনুভব করা যায় বলিয়া নাটকের অপর নাম রূপক। নাটক কোন বাস্তব ঘটনাকে যথাযথ দেখায় না, তাহাকে বড় করিয়া, বিস্তৃত করিয়া দেখায়। কিন্তু কেহ কেহ নাটককে জীবনের যথাযথ চিত্র-লিপি বলিয়াও প্রচার করিয়াছেন। একজন সমালোচকের মতে—"the show on the stage must reproduce the forms of the things represented—nor more, nor less"—(Castelvetro)। আবার আধুনিক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার Granville Barker নাটকের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"A play is anything that can be made effective upon the stage of a theater by human agency. And I am not sure that this definition is not too narrow". মানুষের বুদ্ধির সাহায্যে কলাকৌশলের দ্বারা নাটককে বাস্তব করিয়া তোলা নাটকের একটা উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু তাহাতেই কি নাটকের সার্থকতা? কাব্যের ধর্ম যেমন কেবলমাত্র ভাব, বস্তু, রীতি বা অলংকার নয়—কাব্যাতিরিক্ত এক অতি-ব্যঞ্জনা; নাটকের ধর্মও তেমনি কেবলমাত্র অভিনেতা, সাজসজ্জা, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি নয়, সেও রসের এক অতি-ব্যঞ্জনা। সে রস-ব্যঞ্জনা বুদ্ধি-গ্রাহ্যই হোক্ বা আবেগময়ই হোক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আসল কথা হইতেছে, নাটক সকল সময়েই গতিশীল, প্রোজ্জ্বল ও প্রসন্ন হইবে। এই গুণগুলি আসিবে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাতে, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিরোধিতায়, ব্যক্তির সঙ্গে অবস্থার সংঘর্ষে এবং হয়তো আরও অনেক প্রকারে। এক এক সময় নাটকে এমন একটা পরম মুহূর্তের সৃষ্টি হয়, যাহা অনির্বচনীয়। সেইজন্য নাট্যাভিনয় মানে জাঁকজমক বহুলোকের সমাবেশ বা সুদৃশ্য দৃশ্যপট নয়। এগুলি থাকিলে ক্ষতি নাই, না থাকিলেও নাটকের পক্ষে হানিকর নয়।

নাটকের ভিত্তি

নাটক ঠিক জীবনের অনুকরণ (Imitation) নয় বা প্রতিচিত্র (Representation) নয়। নাটক যদি কেবলমাত্র জীবনের অনুকৃতি বা প্রতিচিত্রণ হইত, তাহা হইলে আনন্দের জন্য অথবা রসোপলব্ধির জন্য আমরা নাটক দেখিতাম না। কারণ মূল আদর্শ অপেক্ষা আদর্শানুযায়ী গঠিত পদার্থ কখনই অধিক সুন্দর হয় না। জগতের প্রত্যক্ষ চিত্র দেখিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে আনন্দ অনুকৃত চিত্রের মধ্যে কখনই পাওয়া যায় না। কিন্তু নাটক ঠিক অনুকৃত চিত্র নয় বলিয়া নাটক দেখিবার জন্য আমাদের এত আগ্রহ। আর একটা কথা এই যে, মানব জীবনের অভাব-অভিযোগ, হাসি-কান্নার সবটুকু অনুকরণ করা যায় না। কিছুটা গ্রহণ, কিছুটা বর্জন করিতে হয়। ইহা না হইলে কোন জিনিসই সাহিত্য হইয়া ওঠে না। নাটকের মধ্যে এই গ্রহণ বর্জনের ব্যাপারটা আছে বলিয়া নাটককে ঠিক অনুকৃত সাহিত্য বলা যায় না। নাটক আমাদের মনকে ঘাত-প্রতিঘাতের আঘাতে উদ্দীপ্ত (Intoxicate) করিয়া তোলে। তাহারই ফলে আমরা নিজেদেরকে জানিয়া আমাদের আত্মার অপরিসীম ক্ষমতাকে উপলব্ধি করিতে চাই। অনেক স্থলেই আমরা যাহাকে প্রাকৃত বলি তাহার অনেকখানিই আমাদের অপ্রত্যক্ষ থাকে। একটুখানি দেখিতে পাইলেই মনে করি যেন সব খানিই দেখিতে পাইলাম। এইজন্য কোন মানুষ সম্বন্ধে বিচার করিতে বসিয়া একজন যাহাকে বলে দেবতা, আর একজন তাহাকেই বলে দানব। এই বৈপরীত্য এই কারণেই আসে যে, তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ দেখা নয়। কোন কিছু সম্পূর্ণভাবে দেখিতে হইলে আপনার অন্তরের মধ্যে তাহাকে নিবিড় করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়। নাটকের মধ্যে এই উপলব্ধির আনন্দ আছে বলিয়া নাটক আমাদের কাছে এত প্রীতিকর।

নাটকের ভ্রান্তি

অভিনয়কালে বাস্তবানুকৃতি দেখিয়া দর্শকের মন কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে নাট্যকারের কোন সৃষ্টিমূলক কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না। আর এ-কথাও ঠিক যে, কোন দর্শকই অভিনয় দেখিয়া মনে করেন না যে, তিনি রঙ্গমঞ্চে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সত্য। তিনি এই কথাই বরং মনে করিয়া থাকেন যে, অভিনীত কাহিনীটি সত্য বলিয়া মনে হইতেছে বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এই কাল্পনিক ঘটনাটি নাটকে সত্যের সংকেতরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সত্যকে বিতাড়িত করিয়া ইহা আপনাকে প্রতিষ্ঠিত

করে না। সেইজন্য সাধারণ জীবনে যে ভ্রান্তি বা মায়ার দ্বারা আমরা প্রতারিত হই, নাটকের অভিনয় দেখিয়া সেরূপ কোন অবস্থার মধ্যে আমাদিগকে পড়িতে হয় না। নাটকের ভ্রান্তি আমাদিগকে সৌন্দর্যের স্বপ্নলোকে পৌঁছিয়া দেয়।

"Drama exists when a human-being pretends for artistic reasons, that he is something or someone else. Drama is more than imitation. A portrait is an imitation, and artistic likeness. Drama is an artistic illusion, although it is not a perfect illusion of reality by which we are entirely deceived"—(The Development of Dramatic Art—Stuart)

নাট্যরস ও কলাবিদ্যা[১]

অভিনয়াদি দ্বারা উপস্থাপিত আন্তর রসই নাটকের প্রাণ। এক কথায় ইহাকেই নাট্যরস বলে। নাটক একটি ঘটনার সহিত আর একটি ঘটনার প্রাণগত বন্ধন দৃঢ় করিয়া তোলে। এই বন্ধনের ফলে যে ভাবরসের সৃষ্টি হয়, তাহাতেই নাটকীয় সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয়। অভিনয়কালে অভিনেতা মানব জীবনের যে বিশেষ ভাবটি উপস্থাপিত করেন, তাহা অভিনেতার সু-অভিনয়ের ফলে দর্শকের মনে জ্ঞানে আনন্দময় হইয়া ওঠে। দর্শক ও অভিনেতা তখন নিজেদের একাত্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সেই একাত্ম রসানুভূতি হইতেই নাটকের জন্ম হয়। সেইজন্য নাটকের জগৎ বস্তুবিশ্ব নয়, বস্তুবিশ্বের অতীত এক সৌন্দর্যময় মায়ালোক।

নাটকীয় সৌন্দর্য বা নাট্যরস মানব-জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার মধ্যে নিহিত থাকে। নাট্যকার নেপথ্যে থাকিয়া নাটকের পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়া সেই ঘটনার বিষয় দর্শকদের নিকট পৌছাইয়া দেন। সেই নিমিত্ত সমালোচকেরা নাট্য-সাহিত্যকে objective form of literature বা বস্তুলীন সাহিত্য বলিয়া থাকেন। ইহা নাটকের আঙ্গিকের কথা, ভাবের কথা নয়। অনেক সময় নাট্যকারগণ পাত্র-পাত্রীদের কথার সঙ্গে নিজেদের ধ্যান-ধারণার বিষয়ও যোগ করিয়া থাকেন। এই আত্মগত রস-কল্পনা নাটকে প্রবেশ করিয়া নাটককে অতিমাত্রায় কাব্যধর্মী করিয়া তোলে। তাহা ছাড়া নাট্যকার নিজেকে অত্যন্ত সজাগ করিয়া তোলার ফলে, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যও অনেকটা প্রচারমূলক হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে এই আত্মলীনতার প্রাচুর্য থাকায়, সেগুলি এক বিশেষ শ্রেণীর নাটকের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। আসল কথা হইতেছে, নাট্যকার নিজের কোন জিনিস ব্যাখ্যা করিবার অধিকার রাখেন না, কলা-বিদ্যাই তাঁহার একমাত্র সহায়।

১। কলাবিদ্যা বলিতে নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিকতাকে বুঝানো হইয়াছে। নাট্যকার নিজে ব্যাখ্যা বা প্রচার না করিয়া বস্তুগতভাবে বিষয়কে বিবৃত করিবেন।

তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টিতে বিশেষ একটা নৈর্ব্যক্তিকতা বর্তমান থাকে। সংসার ও সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের চরিত্র যখন প্রবলতর হইয়া ওঠে, তখনই তাহা নাটকীয় আখ্যা লাভ করে। নাটক সেই বিশেষ মুহূর্তের ইতিহাস। যে-ঘটনা দর্শকের মনে কৌতূহল উদ্দীপন করে না, যে-চরিত্রে নাটকীয় রসের অভিব্যক্তি নাই, সে-ঘটনা ও সে চরিত্র দৃশ্যকাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে না।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নাটকে রসসৃষ্টির আদর্শ

কোন কোন সমালোচক বলিয়া থাকেন, নাটক রচনায় প্রাচ্যের প্রধানতম লক্ষ্য হইতেছে রস এবং প্রতীচ্যের ঘটনা। কিন্তু সে-কথা আংশিকভাবে সত্য হইলেও, সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, কেবলমাত্র ঘটনার বিবৃতিতেই নাটক জমিয়া ওঠে না। নাটক যেখানে সার্থক হইয়া ওঠে সেখানে রসসৃষ্টির স্থানও কম নয়। এই রীতি ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয় দেশের নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে সমাভাবেই প্রযোজ্য। আধুনিক ইউরোপীয় স্বভাবধর্মী নাটকের (Naturalistic drama) মধ্যেও কল্পনা ও কবিত্বের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কল্পনা ও কবিত্বকে বাদ দিলে জীবনকে পূর্ণভাবে দেখা সম্ভব হয় না। জীবনের ভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে হইলে অনাবশ্যককে বর্জন করিয়া আবশ্যককে গ্রহণ এবং চরিত্র ও ঘটনার সমন্বয় ঘটাইতে হয়। শেকস্‌পীয়রের রচনায় ঘটনা অপেক্ষা রস-মাধুর্য প্রধান। এই রসের প্রাধান্য কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথেরও বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে ইউরোপে স্বভাবধর্মী নাটকের সঙ্গে সঙ্গে ভাবাত্মক নাটকও (Poetical drama) সমান ভাবেই আদৃত হইতেছে। তবে স্বভাবধর্মী নাটকের প্রভাব ও প্রতাপ সর্বত্রই অধিক।

আধুনিক বুদ্ধিগ্রাহ্য নাটক

এই আধুনিক স্বভাবধর্মী নাটকের অধিকাংশই যতখানি বুদ্ধিগ্রাহ্য হইয়া উঠিতেছে, ততখানি রসময় হইতেছে না, এইরূপ একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। অবশ্য বুদ্ধিগ্রাহ্য হইলেই নাটক যে রসময় হয় না, সে-কথাও ঠিক নয়। Bernard Shaw, Galsworthy, Ibsen, Granville Barker, Haughtman, Jerome K. Jerome প্রভৃতির নাটক ইহার উদাহরণ। তবে যাঁহারা নাটকের প্রাণ অপেক্ষা কঙ্কালকে বড় করিয়া দেখিতেছেন, তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। আধুনিক নাটকগুলি অনেক ক্ষেত্রে নাট্যকার-দের ব্যক্তি পুরুষকে প্রকাশ করিবার বাহনরূপে গৃহীত হইতেছে। কিন্তু নাটকের উদ্দেশ্য নাট্যকারকে প্রকাশ করা নয়, চরিত্রকে প্রকাশ করা। তাহা ছাড়া নানা সাম্প্রতিক সমস্যার জটিলতা নাটককে ঘোরালো করিয়া তুলিতেছে। সেইজন্য আধুনিক নাটকে মানুষের জীবনকে তেমন ভাসিয়া

উঠিতে দেখা যায় না, যেমন দেখা যায় বুদ্ধির সাহায্যে নাট্যকারের আত্মপ্রকাশ। কেবলমাত্র লৌকিকতা সম্পাদনই নাটকের ধর্ম নয়, দেখার ভিতর দিয়া না-দেখা ভাবরসকেও নাটকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। 'দশরূপকে'র লেখক ধনঞ্জয় পণ্ডিত বলেন,—"আনন্দ নিস্যন্দী নাট্যের ফল সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তিমাত্র নয়। যাঁহারা ইতিহাস প্রভৃতির ন্যায় ইহাকে সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি মাত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, সেই সব অল্পবুদ্ধি সাধুদের নমস্কার। রসের আস্বাদ কি তাহা তাঁহারা জানেন না।" প্রাচীনতার দোহাই দিয়া অনেকে হয়তো বলিবেন যে, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের ঐ মত এ যুগে অচল। কিন্তু প্রাচীন হইলেই সকল জিনিস অচল হইয়া যায় না। ধনঞ্জয় পণ্ডিত নাটকের চিরন্তন ভাবের কথা বলিয়াছেন, যাহার অপর নাম রস। এই রস সাহিত্য-মাত্রেরই প্রাণধর্ম। নাটক যদি সাহিত্যের অন্তর্গত হয়, তবে নাটকের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা নিশ্চয় বর্তমানকালের জন্য নয়, চিরকালের জন্য। যাহা জ্ঞানের কথা তাহা একবার জানিলেই শেষ হইয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা কখনও পুরাতন হয় না। তাই নাটকের প্রধান অবলম্বন ঠিক জ্ঞানের কথা নয়, অনেকটা ভাবের কথাও বটে। এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া এ-যুগের একজন সুপ্রসিদ্ধ নাট্য-সমালোচক বলিয়াছেন,—

"We may without fear lay aside the narrower realistic views; were we to hold to these, we should be bound to rule out as bad drama or as completely undramatic the work of Æschylus, Aristophanes, Shakespeare and Moliere" (—The Theory of Drama—Nicoll).

নাটক ও জাতীয় জীবন

জাতীয় জীবনের সহিত নাটকের একটি সুনিবিড় সম্পর্ক আছে। মানুষের ভাব-সাধনার সুচিন্তিত পথে নাটকের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেইজন্য নাটক ব্যক্তিবিশেষের জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে—A nation is known by its theatre—অর্থাৎ রঙ্গালয় হইতেই জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকে সমগ্র জাতির ধ্যান, ধারণা, একজন লেখকের প্রতিভাকে অবলম্বন করিয়া একটা বিশেষ-কালে প্রকাশিত হয়। সুতরাং মহামুনি ভরতের কথায় বলা যাইতে পারে—"ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনং"—অর্থাৎ সকলের হৃদয়ভাব প্রকাশ করাই নাটকের উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"নানা ভাব, নানা অবস্থান্তর এবং নানা লোক চরিত্রের অনুকরণ করাই নাটকের উদ্দেশ্য। দুঃখার্ত, শ্রমার্ত ও শোকার্তের পক্ষে নাট্যই বিশ্রামস্থল। নাট্য হইতে ধর্ম

ও যশ আহরণ করা যায়। নাট্য আয়ুর্বৃদ্ধিকর ও বুদ্ধি-বিবর্ধক। নাট্য হইতে উপদেশ লাভ করা যায়। এমন জ্ঞান নাই, এমন শিল্প নাই, এমন বিদ্যা নাই, এমন বল নাই, এমন যোগ নাই, এমন কর্ম নাই—যাহা নাট্য হইতে পওয়া যায় না।" এক কথায়, নাটক হইতেছে জাতির পরিণত অবস্থার ঐতিহ্যময় আলেখ্য। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"নাটক যেন উন্নতিশীল, বীরত্বমণ্ডিত, গৌরবময় জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জাতির যৌবনের দৃপ্ত তেজ ও উন্মাদনা কাটিয়া গেলে চিন্তাশীলতা ও দার্শনিকতত্ত্বান্বেশীলতা জাতীয় জীবনকে অধিকার করিলে নাট্যসাহিত্যের উৎস সেখানে শুকাইয়া যায়। ইংরেজি সাহিত্য রোমান্টিক ও ভিক্টোরিয়া যুগের অনেক প্রতিভাবান্ কবি নাটককে ঠিক জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই; নাটকের মূল রহস্যটি তাঁহাদের নিকট ধরা দেয নাই। সাহিত্য-রাজ্যে নাটক যেন রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যা; এবং ইহাকে জাগাইবার সোনার কাঠি জাতীয় জীবনের কোন্ গোপন স্তরে লুকান আছে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন"—(রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য)

নাটক ও রঙ্গমঞ্চ

নাটক রঙ্গমঞ্চনিরপেক্ষ হইবে কি, হইবে না—ইহা লইয়াও বহু বাক-বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ফরাসী নাট্যকার Moliere দর্শকদের উৎসাহপূর্ণ হাত-তালিকেই নাটকের চরম সার্থকতা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"Speaking generally, I would place considerable reliance on the applause of the pit. ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া আর একজন সমালোচক বলিয়াছেন,—"The Rules of English Comedy don't lie in the Compass of Aristotle, or his followers, but in the pit, Box and Galleries—"(Farquhar). আবার Alexander Duma Scribe-এর নাট্য-সমালোচনা করিতে গিয়া নিন্দাচ্ছলে বলিয়াছেন—"M. Scribe did not attempt to write Comedies; he sought merely to write for the theatre." এই দুইটি বিরোধী মতের সমাধান করিতে হইলে বলা যায় যে, নাটক যখন অভিনয়ের জন্য লিখিত তখন রঙ্গমঞ্চের সহিত তাহার একটি অনিবার্য যোগ থাকিবেই। অর্থাৎ নাটকের কাহিনী এবং চরিত্র-সৃষ্টিতে এমন পারদর্শিতা দেখাইতে হইবে যাহা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়, এবং দর্শকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। আবার এই অভিনয়-সাফল্যকে নাটকের প্রধান গুণ বলিয়া ধরিয়া লওয়াও চলে না; কারণ এমন দেখা গিয়াছে যে, কোন নাটক হয়তো তদানীন্তন-

কালের নাট্য-দর্শকদের প্রীতিলাভ করিয়াছে, অথচ সাহিত্য-হিসাবে স্থায়িত্বলাভ করে নাই। অন্যপক্ষে নাট্য-দর্শকদের ধিক্কার সহ্য করিয়াও সাহিত্য-হিসাবে নাটক যে বাঁচিয়া গিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সুতরাং সেই নাট্যকারের রচনা সার্থক, যিনি তাঁহার রচনায় সাহিত্য ও নাটকীয় রসসৃষ্টির উপাদান একত্র করিতে পারেন। নাটক যাচাই করিতে গেলে দেখিতে হইবে নাটকের বিষয় বিন্যাসের মধ্যে দৃশ্যমানতা আছে কিনা। বিষয়-বিন্যাস অপেক্ষা দৃশ্য-মানতার প্রাধান্য নাটকের পক্ষে অতি প্রয়োজন; কারণ "Visible representation is essential to the dramatic form." সুতরাং কোন নাটক বিচারের সময় এই কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে যে, "a dramatic work must always be regarded from a double point of view—how far it is poetical and how far it is theatrical."—(Schlegel)

নাটক ও নীতিশিক্ষা

একজন সমালোচক বলিয়াছেন,—"morality is utterly unnecessary in a drama dramatic poetry is made for pleasure and amusement alone." এ-কথা ঠিক যে, আমরা যখন নাটকের অভিনয় দেখিতে যাই, তখন নীতিকথা শুনিতে যাই না। আনন্দলাভ করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু কোন কোন নাটকে দেখা যায় যে, নাট্যকার সুপ্রচুরভাবে নীতিকথা শুনাইতেছেন বা নাটকের প্রয়োজনের বাইরেও দর্শকদিগকে উপদেশ দিতেছেন। সে-ক্ষেত্রে সেই নাট্যকারের রচনাকে আমরা বড় সৃষ্টি বলিব না। নীতির উপদেশ শুনিব বলিয়া আমরা নাটকের অভিনয় দেখি না বা নাটক পাঠ করি না। তবে এ-কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, কোন বড় সৃষ্টিই একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন হইতে পারে না। এখানে Goethe-এর একটি বাণী স্মরণীয়—"if a poet has as high a soul as Sophocles, his influence will always be moral." সব নাট্যকারের রচনার মধ্যে একটা আদর্শ থাকে। জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল কাহিনীই একটা না একটা বিশেষ অর্থ প্রকাশের জন্যই সাহিত্যে নিয়োজিত হয়। নাট্যকার লক্ষ্যে হোক, অলক্ষ্যে হোক নাটকের মধ্য দিয়া মানবজীবনের সেই চিরন্তন আদর্শ দর্শকের চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরেন। তবে সে আদর্শ নাটকের নিজস্ব আদর্শকে লঙ্ঘন করিয়া নয়, তাহা এই আদর্শের অঙ্গীভূত।

নাটকে লোকশিক্ষা

ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে নাটকের ব্যবহার চিরকাল জগতের সকল দেশেই ছিল, এখনও আছে। আমাদের দেশে ঋত্বিকগণ এক এক দেবতার সজীব

প্রতীকরূপে যে সূক্তগুলি গান ও আবৃত্তি করিতেন, তাহা হইতেই নাটকের জন্ম হইয়াছিল। গ্রীসদেশে ব্যাকাস্ বা ডায়োনিশাস দেবের পূজা হইতেই নাটকের আরম্ভ। ভারতবর্ষ ও গ্রীস দেশের মত জাপানেও নাট্যশিল্প জন্মলাভ করিয়াছে উৎসব ক্রীড়া হইতে। জাপানে আজও 'এনিয়ো' উৎসবে নৃত্য-গীতের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। এখনও মন্দিরে মন্দিরে 'কাগুরা' নৃত্য রহিয়াছে।

কাব্যের সাহায্যে ছড়া কাটিয়া নিজেদের বক্তব্য বিষয়কে প্রচার করার চেষ্টা সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে তর্জা, খেউড়, আখড়াই, কবিগান, পাঁচালী, ঝুমুরগান ও কথকথার সাহায্যে গান ও উত্তর-প্রত্যুত্তর দিয়া লোকরঞ্জনের চেষ্টা বরাবরই ছিল। আজিও এই উপায়ে লোকশিক্ষার চেষ্টা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। তবে ভবিষ্যতে হয়তো যাইবে। এই সকল নৃত্যগীত হইতেই বাংলা দেশে যাত্রাভিনয়ের সৃষ্টি হয়। যাত্রারও মূল উদ্দেশ্য হইতেছে পৌরাণিক কাহিনীর সাহায্যে ধর্মশিক্ষা দেওয়া।

বর্তমানে 'ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়'—এইরূপ কোন উপদেশ নাটকে থাকে না বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে নাটককে লোকশিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করা হইতেছে।

> "ম্যাক্সুইনি জাতীয়শিক্ষার জন্য জাতীয় নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, জাতীয় নাটকের প্রচার করিয়া সোভিয়েট রাসিয়ার 'মস্কো আর্ট থিয়েটার' এখন প্রধান জাতীয় শিক্ষা নিকেতন। আমাদের দেশেও একদিন জাতীয় রঙ্গমঞ্চ এইরূপ শিক্ষামন্দিরে পরিণত হইয়াছিল।.. 'বুদ্ধদেব' নাটক অভিনয় দেখিয়া অনেকে বলি বন্ধ করিয়াছিলেন, 'বলিদান' অভিনয় দেখিয়া বাঙ্গালী-হৃদয় পণপ্রথার উচ্ছেদ-সাধন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, 'সিরাজদ্দৌল্লা' 'মিরকাসিম' 'প্রতাপাদিত্য' 'রাণাপ্রতাপ' দেখিয়া অনেকে বাংলাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিল"—
> (গিরিশচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত)

বর্তমানে নাটককে যুদ্ধ ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে জনগণের সাহস ও ধৈর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যুদ্ধ সম্পর্কিত নানাপ্রকার বিষয় লইয়া লিখিত নাটক রঙ্গমঞ্চ ও সিনেমায় অভিনীত হইতেছিল। সম্প্রতি রেডিও ভ্যান, গ্রামোফোন ও বেতার-বার্তার সাহায্যে এইরূপ প্রচারমূলক কার্য বিস্তার করিবার সুব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রমিক সংঘ, মহিলা-সমিতি, ছাত্র-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির নানাপ্রকার দলগত আদর্শসমন্বিত নাটকও মাঝে মাঝে অভিনীত হইতে দেখা যায়। এই সকল অভিনয়ের দ্বারা দেশের লোকশিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাটকের আঙ্গিক বা শিল্প-রীতি

নাটক বিচারকালে নাটকের আঙ্গিক বা শিল্পরীতির একটা বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। এই শিল্পরীতি শিথিল হইলে কোন নাটকই প্রথম শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হয় না। সাহিত্য রচনা করিবার পক্ষে যেমন একটা নিয়ম বা ব্যাকরণ আছে, নাটকের বেলায় এই শিল্পরীতিই (Technique) তাহার ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ অধিগত হইলে তবেই যে কোন নাট্যকার নাটক রচনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এখানে এ-কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সাহিত্য-স্বষ্টির মূলে তাহার ব্যাকরণই যেমন সবস্ব নয়, নাটক-স্বষ্টির বেলায়ও ঠিক তাই। সাহিত্য ও ব্যাকরণ পরস্পর যেমন সম্বন্ধযুক্ত, নাটক ও তাহার আঙ্গিক তেমনই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। একের সাহায্য ব্যতিরেকে আর একটি পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

(ক) নাটকের চারটি অঙ্গ

নাটকের প্রধান অঙ্গ চারটি—কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা-সমাবেশ ও সংলাপ। নাট্যকার অভিনেতার জন্য এমন কতকগুলি কথার স্বষ্টি করেন, যাহার সাহায্যে অভিনেতারা তাহাদিগের গৃহীত চরিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তোলেন। যখন সেই কথাগুলিকে একত্র করিয়া একটি কাহিনীর ভিতর দিয়া দেখা হয়, তখন তাহার মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য ফুটিয়া ওঠে। এই সামঞ্জস্যই নাটকের পক্ষে একটি আবশ্যকীয় বিষয়। কাহিনী চরিত্রগুলির প্রয়োজনয়ীতা ঘোষণা করে, চরিত্রগুলি কাহিনীকে প্রকাশ করে, উপযুক্ত ঘটনা-সমাবেশে চরিত্র ও কাহিনী মূর্ত হইয়া ওঠে। আবার সংলাপ চরিত্রকে মুখর করিয়া তোলে।

১। কাহিনী

Aristotle বলিয়াছেন, একখানি ভাল নাটকের পক্ষে একটি সুবিন্যস্ত কাহিনীর বিশেষ প্রয়োজন।[১] একখানি ছবিতে রেখার যে মূল্য, একখানি নাটকের পক্ষে কাহিনীরও অনেকটা সেই মূল্য। কিন্তু এই কাহিনীর ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন হইলে চলে না, ঘটনাগুলির মধ্যে একটা পারম্পরিক যোগ

১। একাধিক কাহিনীও নাটকে থাকিতে পারে। সেখানে গৌণ কাহিনীকে শাখাকাহিনী বা উপকাহিনী বলা হয়।

থাকা নিতান্ত আবশ্যক। নাটকের ঘটনা এমন করিয়া সাজান উচিত, যাহাতে নাটকের ভিন্ন ভিন্ন উপাদানগুলি এক হইয়া মিলিয়া যায়। ভাল নাটক-মাত্রেই এইরূপ একটি সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুসঙ্গতি লাভ করিয়াই প্রথম শ্রেণীর নাটকগুলি নূতন শক্তি লাভ করে। এই নূতন শক্তি বা গতি নানা খণ্ড অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া এক অখণ্ড পরিণতিতে গিয়া পৌছায়। এই অখণ্ড পরিণতিতেই নাটকের সার্থকতা। ভাল নাট্যকারেরা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া ভাবী পরিণতির বীজটিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর করাইয়া দেন। পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের রচনা আলোচনা করিলেই এ কথা সহজেই বোঝা যায়।

অনেক নাটক আছে, যাহা পড়িলেই মনে হয় যে, তাহাতে বুঝি কোন কাহিনী নাই। আপাতদৃষ্টিতে তাহা মনে হইলেও, কাহিনী নাই এমন কোন নাটকই হইতে পারে না। কথোপকথনের মধ্য দিয়া গল্প বলাই নাটকের কাজ। তবে কোন নাটকে গল্প বেশী থাকে, কোনটিতে কম। এই গল্প বলার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের মধ্যে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঔপন্যাসিকের গল্প বলার যে স্বাধীনতা আছে, নাট্যকারের তাহা নাই। উপন্যাস এক জায়গায় বসিয়া পড়িয়া শেষ না করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু নাট্যাভিনয় একটা বিশেষ স্থানে বসিয়া বিশেষ সময়ের মধ্যে দেখিয়া শেষ করিতে হয়। সুতরাং নাট্যকারের পক্ষে কাহিনী সংক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজন। একটি বিস্তৃত কাহিনীর অনাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্রগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র অত্যাবশ্যক ঘটনা ও চরিত্রগুলি লইয়া নাট্যকারকে কাহিনী সাজাইতে হয়। কাহিনী সাজাইবার সময় নাট্যকারকে রঙ্গমঞ্চের দিকেও সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। ঔপন্যাসিক ভাষার দ্বারা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা দিয়া থাকেন, নাট্যকারকে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হয় না। কারণ রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট, সাজসজ্জা সে অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে। তথাপি ঔপন্যাসিক অপেক্ষা নাট্যকারের কার্য অধিক আয়াসসাধ্য। একটি কাহিনীর সকল অবান্তর অংশ বাদ দিয়া সেই কাহিনীকে নানা ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বে গতিশীল করিয়া তোলা নাট্যকারের কাজ। এ কাজ যে বিশেষ কষ্টসাধ্য তাহা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমানে নাটকের প্রকৃতি ও আদর্শ অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। এই আঙ্গিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের নিয়ম-কানুনও কিছু কিছু ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য আধুনিক নাটকে পূর্বাপেক্ষা অধিক বস্তু-সংক্ষেপ দৃষ্ট হয়। শেকসপীয়রের সময় পঞ্চাঙ্কের মধ্যে যে কাহিনী বিবৃত হইত, তাহা এখন তিন অঙ্ক বা একাঙ্কের মধ্যে গ্রথিত হইতেছে। ইহার কারণ তখনকার জীবনধারা ও সমস্যা এখন পরিবর্তন লাভ করিয়াছে।

"শেকসপীয়রের সময়ের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যে উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রবলতা, যে উচ্চ স্বরে বাঁধা হৃদয়তন্ত্রী ছিল, আধুনিককালে তাহার তীব্রতা অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে; আজকাল জীবনের দুঃখজ্বালা, জীবনসমস্যার সংঘাত অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। পুরাতন ট্রাজিডির বীরত্বপূর্ণ, অলংকার বহুল ভাষা আমাদের কর্ণে যেন অনেকটা অর্থহীন কোলাহলের মতই ধ্বনিত হয়—"With little meaning, though the words are strong." বর্তমান জীবনের চরম মুহূর্তগুলি (crises) শেকসপীয়রের যুগের সহিত এক নয়। সুতরাং এই অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রাখিয়া নাটকেরও প্রকৃতি ও আদর্শ রূপান্তরিত হইতেছে।"—(রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য—ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

২। চরিত্র

অনেকে কাহিনী অপেক্ষা নাটকীয় চরিত্রকে অধিক মূল্যবান্ বলিয়া প্রচার করিয়াছে। "In theatrical work, story, incident and situation should be only another phase of the development of character... Characterisation is really fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work."—(Hudson)। বিভিন্ন চরিত্রই নাটকীয় কাহিনীকে গতিশীল করিয়া থাকে। সেইজন্য নাটকে চরিত্রের একটি বিশেষ মূল্য আছে। নাটকের কাহিনী নাট্যকারেরা নাটকীয় চরিত্রের কথপোকথন এবং তাহাদের কার্য দিয়াই বিবৃত করিয়া থাকেন। নাট্যকার ঔপন্যাসিকের মত স্বাধীনভাবে কোন কথাই বলিতে পারেন না। নাটকীয় ক্রিয়া ও দ্বন্দ্বের অধীনে চরিত্রগুলি পরিচালিত হয়। তাই Glasworthy বলিয়াছেন,—"A dramatist who hangs his plot on characters instead of hanging characters on plot commits a cardinal mistake."

এখানেও নানা মুনির নানা মত দেখা যাইতেছে। এখানে আর এক জনের মত উদ্ধৃত করিতেছি। তাঁহার মতে গল্পই বলুন, ঘটনাই বলুন, আর ঘাত-প্রতিঘাতই বলুন—চরিত্র হইতেছে এ সকলের বাহন। "Story and incident and situation in theatrical work are, unless related to character, comparatively childish and unintellectual"—(Henry Arthur Jones). কিন্তু এই চরিত্রের সৃষ্টি ব্যাপারে নাট্যকারকে অতি সন্তর্পণে কলম ধরিতে হয়। নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতকে সম্পূর্ণতা দান করিতে যে কয়টি চরিত্রের প্রয়োজন হয় এবং সেই সকল চরিত্রের

জীবন-প্রবাহের যতটুকু অংশ নাটকের পক্ষে অপরিহার্য, শুধু সেইটুকু অংশই নাট্যকার দর্শকদিগকে উপহার দিয়া থাকেন। তাহার বাহিরে যাইবার উপায় তাঁহার নাই।

কিন্তু ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। সেইজন্য কোন উপন্যাসের নাট্যরূপ গঠনের কালে অনেক পরিচিত চরিত্র বাদ পড়িয়া যায়, আবার নাটকীয় ঘটনার সন্ধিগুলি জুড়িবার সময় দু'একটি অপরিচিত মুখকেও আহ্বান করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকখানি ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'রাজর্ষি' উপন্যাস হইতে 'বিসর্জনে'র কাহিনীটি সংগৃহীত হইয়াছে; কিন্তু রাজর্ষির সকল চরিত্রই বিসর্জনে স্থান পায় নাই; আবার বিসর্জনে, এমন চরিত্র আছে যাহা রাজর্ষিতে নাই। গোবিন্দমাণিক্য, নক্ষত্র-রায়, রঘুপতি ও জয়সিংহ এই কয়টি চরিত্র রাজর্ষি ও বিসর্জনে আছে; কিন্তু গুণবতী, অপর্ণা, নয়নরায়, চাঁদপাল বিসর্জনের মধ্যে কবির নূতন সৃষ্টি। উপন্যাসিক ও নাট্যকারের পক্ষে চরিত্র সৃষ্টি অনিবার্য ব্যাপার হইলেও চরিত্র সৃষ্টির পথ উভয়ের সম্পূর্ণ ভিন্ন।[২]

Shakespeare অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন। ইতি-হাস হইতে তিনি কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার রচিত নাটক গুলি কেবলমাত্র ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়। মানব-বিশ্বের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে তিনি আপনার আন্তররসে পরিপুষ্ট ও বিস্তারিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মুখে যে সংলাপ দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ঘটনাপুঞ্জের যে আবর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদের স্বকীয়তা পরিস্ফুট হইয়াছে। শেক্স্‌পীয়রের নাটকগুলি যে আমাদের ভাল লাগে, তাহার কারণ নাটকের গল্পাংশ নয়; নাটকান্তর্গত বিচিত্র নর-নারীর সুখ-দুঃখ-বিমথিত অনবদ্য চরিত্র-গুলিই আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

শেকস্‌পীয়রের নাটক রচনার অনুকরণে বাঙ্‌লা দেশে অনেকেই নাটক রচনা করিয়াছেন। শেকস্‌পীয়রের চরিত্র সৃষ্টির আদর্শ বাঙ্‌লার অনেক নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ-প্রসাদ শেকস্‌পীয়রের অনুকরণে ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সৃষ্ট চরিত্রগুলি অতিমাত্রায় দেশাত্ম-বোধের অনুপ্রেরণা ও ভাবাতিবেগের আতিশয্যে ভাসমান। তাই আর্ট

২। নাটকের চরিত্রে দ্বন্দ্ব থাকিবে। বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বযুক্ত চরিত্রই নাটকের চরিত্র। ইহার মধ্যে আবার অন্তর্সংঘাতযুক্ত চরিত্রই নাটকের উৎকৃষ্ট নাট্যিক চরিত্র। যথা, হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, মিসেস আরভিঙ, নুরজাহান, সাজাহান, জয়সিংহ প্রভৃতি। দ্বন্দ্বহীন চরিত্রও নাটকে থাকে, তাদের সাধারণত টাইপ (type) চরিত্র বলা হয়। যেমন, ইয়াগো, ফলষ্টাফ, তোরাপ, করিমচাচা প্রভৃতি। ঘটনা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি ঘটিবে।

হিসাবে সেগুলি ব্যর্থ হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রগুলি অনেকক্ষেত্রে উজ্জ্বল, কিন্তু সেগুলি রসসৃষ্টির বিচারে শেকস্‌পীয়রের অনেক নিম্নে। শেকস্‌পীয়রের চরিত্র-সৃষ্টিতে মানস-আদর্শ প্রধান হইলেও সেগুলির স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রগুলি সবই যেন একই প্রকারের। দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মকেন্দ্রিক মনোধর্ম মনুষ্যত্ব বিকাশের দিকে যতটা সচেতন, বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির দিকে ততটা নয়। তাই চাণক্য, সাজাহান, নূরজাহান, শক্তসিংহ প্রভৃতির যে রূপ ফুটিয়াছে, তাহা তাহাদিগের স্বধর্মে ততখানি হয় নাই, যতখানি হইয়াছে দ্বিজেন্দ্রলালের মনোধর্মে। তবু একথা স্বীকার করিতে হয় যে, দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র-সৃষ্টিতে অসামান্যতা থাকিলেও, কোনপ্রকার অস্বাভাবিকতা নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদ ঐতিহাসিক চরিত্র-সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অপেক্ষা অধিক পারদর্শী। তাঁহার চরিত্রগুলিতে মহিমা থাকিলেও ব্যক্তিত্বের আলোক কিছুই কম নাই। প্রতাপাদিত্য, আলমগীর তাহার প্রমাণ।

সামাজিক চরিত্র-সৃষ্টিতে দীনবন্ধুর জোড়া মেলে না। তাঁহার 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ, কাঞ্চন ও ঘটিরাম সাহিত্যের দরবারে এখনও উঁচু আসন দখল করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার 'নীলদর্পণ' সাময়িক বিক্ষোভের বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক কল্যাণের দিক্ হইতে ইহার যথেষ্ট মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টি ও ঘটনা-বিন্যাসের দিক হইতে ইহার তেমন মূল্য নাই। ধর্মমূলক ও পৌরাণিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব সবার চাইতে বেশি। গিরিশচন্দ্রের জনা, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি এখনও ধর্মরসপিপাসু দর্শকবৃন্দকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়া থাকে। হাস্যরসাত্মক চরিত্র-সৃষ্টিতে অমৃতলাল অনবদ্য। অমৃতলালের 'চাটুজ্যেবাঁড়ুজ্যে'র চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে 'খাস দখলে'র নিতাই ও ঠাকুর্দা, 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র নন্দ ও মিঃ সিং প্রভৃতি চরিত্র হাস্যরসে সমুজ্জ্বল।

রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-সৃষ্টিতে কোন প্রকার গতানুগতিকতা নাই। তাঁহার অধিকাংশ চরিত্রই ভাবাত্মক। 'চিত্রাঙ্গদা' পৌরাণিক ও 'বিসর্জন' ঐতিহাসিক কাহিনী লইয়া লিখিত হইলেও, সেগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবি-রূপটি প্রকাশিত হইয়াছে। ডাকঘর, রক্তকরবী, রাজা, অচলয়াতন, মুক্তধারা, ফাল্গুনী, শারদোৎসব প্রভৃতির মধ্যে যে চরিত্রগুলি আছে, সেগুলি দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ। এই সকল চরিত্র চিরন্তনতার রসে অভিষিক্ত বলিয়া, এ-গুলি বস্তু সংসারের প্রতিরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে বৈকুণ্ঠের খাতার 'বৈকুণ্ঠ' শেষরক্ষার 'গদাই' চিরকুমার সভার 'অক্ষয়' সহজ স্বাভাবিক মানুষ। তাহারা নিজেদের সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সরল পথ ধরিয়া পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে।

৩। ঘটনা-সমাবেশ

নাটকের একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, চরিত্রগুলিকে কয়েকটি বাছাই করা স্থানে সংস্থাপিত করিতে হয়। নাটকীয় কাহিনীর সমস্ত উপাদান এই বিশেষ বিশেষ স্থানে স্থাপিত চরিত্রের ভাষণের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয়। এইখানেই উপন্যাসের কাহিনী রচনার সঙ্গে নাটকের কাহিনী রচনার প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। লেখক যে কাহিনী উপন্যাসে বিস্তৃত করিয়া বলিতে পারেন, নাটকে তিনি তাহা পারেন না। নাটকে লেখক কথা বলেন না, কথা বলে তাঁহার সৃষ্ট-চরিত্র। সেই চরিত্রগুলি আবার পাঠকের বা দর্শকের চোখের সামনে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিয়াই কথা বলে। নাট্যকার জীবন্ত মানুষকে এক একটা বিশেষ অবস্থা ও স্থানের মধ্যে স্থাপন করিয়া প্রদর্শন করেন, কিন্তু ঔপন্যাসিক জীবন্ত মানুষের পরিবর্তে যে-কোন মানুষের কাহিনী শোনান। এইজন্য উপন্যাস রচনায় লেখকের যে স্বাধীনতা থাকে, নাটকের বেলায় তাহা থাকে না।

কিন্তু এই ঘটনা-সমাবেশের স্থানগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে চলে না। একটির সঙ্গে আর একটির নিবিড় সম্বন্ধ থাকে। ইহাকেই বলে নাটকীয় সামঞ্জস্য। কোন নাটকে নাটকীয় সামঞ্জস্য না থাকিলে, সে নাটক সার্থক হইয়া ওঠে না।[৩] নাটককে সাধারণত Composite Art বলা হয়, কারণ নাটকে ভাষণকে ফুটাইয়া তুলিতে হয় উচ্চারণ, অভিনয় এবং ভাব-ভঙ্গীর দ্বারা। তাহা ছাড়া রঙ্গাধ্যক্ষের একটা কর্তব্য আছে। তিনি নানা প্রকার মনোরম সাজপোষাক ও দৃশ্যাবলীর দ্বারা অভিনেয় বিষয়বস্তুটিকে সবজনের প্রীতিকর করিয়া তোলেন। সেইজন্য বলা চলে যে, "The drama is, therefore, a Composite Art, in which the author, the actor and the stage manager all combine to produce the total effect."—(Worsfold) এই total effect-ই নাটকের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা। অভিনয় ব্যাপারে নাটকে যেমন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন, রচনা-বিষয়েও সেই কথা প্রযোজ্য। এই সামঞ্জস্য নির্ভর করে সুনিপুণভাবে ঘটনা-সংস্থাপনের উপর। কিন্তু একাজ অতি কঠিন ব্যাপার। উপন্যাসে যেমন পাত্র-পাত্রীকে এক স্থান হইতে অপর স্থানে মিনিটে মিনিটে লইয়া যাওয়া যায়, নাটকে তাহা সম্ভব নয়। নাটকের পক্ষে ক্ষণে ক্ষণে এ-ঘর হইতে ও-ঘরে পাত্র-পাত্রীকে লইয়া যাওয়া এবং সেইরূপভাবে ঘটনা সাজান একেবারেই অসম্ভব।

৩। এই সম্বন্ধে এরিষ্টটল বলিয়াছেন, "There will be nothing irrational in the whole range of action." পারম্পর্যহীন কোনো অস্বাভাবিক ঘটনার স্থান নাটকে নাই। নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাগুলির নিবিড় যোগসূত্র থাকিবে। নাটকের পরিণতিতে চমকপ্রদ বা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনার সমাবেশ থাকিবে না।

অথচ বাঙ্‌লা নাটকে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে ১৭টি দৃশ্য আছে। বাঙ্‌লা নাটক খুঁজিলে এরূপ উদাহরণ আরও অনেক পাওয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,"যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে, সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।"

উপযুক্তভাবে ঘটনা-সমাবেশ করিতে না পারায় যে কত বাঙ্‌লা নাটক নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' নাটকের কথাই ধরা যাক্। নাটকের প্রথম পৃষ্ঠা খুলিলেই প্রথমেই চোখে পড়ে—"Huldighat is the Thermopylæ of Mewār ; the field of Dewir is her Marathon.' পড়িয়া মনে হয় যে, এই নাটকের বিষয় বস্তু হইবে হলদিঘাটের যুদ্ধ—রাজপুতানার গৌরবসূর্য রাণা প্রতাপসিংহের অবিনশ্বর কীর্তিকাহিনী। প্রথম অঙ্কে সেই ঘটনা অতি নিপুণতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। প্রতাপ মানসিংহের সহিত সামাজিকভাবে একত্র ভোজন না করায় মানসিংহ যখন বলিলেন—"রাণা প্রতাপসিংহ! তোমার যদি অহংকার চূর্ণ করতে না পারি তো আমার নাম মানসিংহ নয়!" এখানেই নাটকীয় সংঘর্ষের সূত্রপাত হইল। ইহার ফলে হলদিঘাটের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সমাপ্তি হইয়াছে প্রথম অঙ্কে। এই বিষয়টিকে বিস্তৃত করিয়া লিখিলেই তো একখানি উৎকৃষ্ট পঞ্চাঙ্কের নাটক হইতে পারিত এবং নাটকের মর্যাদাও রক্ষিত হইত। কিন্তু অশ্রুমতী ও সেলিমের অবাস্তর প্রণয়-কাহিনী বইখানিকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে। লেখক ইহার একটা ব্যাখ্যাও দিয়াছেন। তাঁহার মনের মধ্যে শুধু দেশাত্মবোধ জাগরিত করিবার ইচ্ছা ছিল না, প্রকৃত অনুরাগ হইলে তিনি হিন্দু-মুসলমান পাত্র-পাত্রীর মিলনের পক্ষপাতীও ছিলেন, এবং সেইজন্য তিনি রাণা প্রতাপের এক কল্পিত কন্যার সঙ্গে রাণা প্রতাপের চিরশত্রু মোগল-সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী সেলিমের সহিত মিলন কল্পনা করিয়াছিলেন। ভাবের দিক্ দিয়া ইহা ভাল হইলেও, আদর্শের দিক দিয়া কি ইহা সমীচীন হইয়াছে? রাণা প্রতাপকে ছাড়িয়া এ বিষয়ে তিনি অন্য কোন কাহিনী লইয়া আর একখানি নাটক লিখিলেতো ভাল করিতেন। এক কথায় বলা যায়, নাটকখানি যাহা হইতে পারিত তাহা হয় নাই। অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা ছিল না সে কথাতো বলা চলে না। তিনি শক্তিমান লেখক ছিলেন তাঁহার হাতে কোন কোন নাটকতো বেশ উৎরাইয়া গিয়াছে। কাহিনীর সুসঙ্গত কল্পনা ও উপযুক্ত ঘটনা-সমাবেশ করিতে পারিলে, এ নাটকখানিও যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৪। সংলাপ

সংলাপও নাট্যসৃষ্টির পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। কিন্তু যে কোন সংলাপ বা কথোপকথন হইলেই যে রচনা নাটক হইয়া ওঠে, তাহা নয়। "তোমার নাম কি?"—"আমার নাম রাম"—এরূপ কথাবার্তায় নাটকীয় ভাব প্রকাশ পায় না, উহাকে নাটকও বলা যায় না। পাত্র-পাত্রীগণের কথা-বার্তার সময় তাহাদিগের পরস্পরের মনে যদি বিকার (Intoxication) উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে সে কথাবার্তা নাটকের যোগ্য হয় না। এই বিকারের ঢেউ সংলাপের সাহায্যে দর্শকদের মনে পৌঁছিলে, সেখানেও তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এইরূপে অভিনেতা ও দর্শকের মনের যোগাযোগে নাটকের জন্ম হয়। নাটকীয় ভাষণের ভাল-মন্দের ওপর চরিত্রগুলির শক্তি নির্ভর করে। যে চরিত্র সমাজের যে স্তরের লোক, তাহার মুখে ঠিক সেইরূপ কথাবার্তা দিতে হয়। একটি গ্রাম্যলোকের মুখে দর্শনের বড় বড় কথা দিলে যেমন বেমানান হয়, আবার রাজা বা অভিজাত রাজপুরুষের মুখে গ্রাম্য কথাবার্তা দিলেও তেমনি বেমানান হয়। এইরূপ বেমানান সংলাপের দৃষ্টান্ত বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে বিরল নয়।

নাট্য শাস্ত্রে আছে "নাট্যকার এইরূপ কৌশল ও নিপুণতার সহিত নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কথাবার্তা রচনা করিয়া দিবেন যে, তাহা যেন চরিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী হয়। পাত্র-পাত্রীদের নাম মনে রহিয়াছে, অথচ ব্যক্তি লক্ষ্য নাই, এইরূপ স্থলে অবস্থাগত কথোপকথন শুনিয়া যদি ব্যক্তিগ্রহ না হয়, তবে সেটা ভাষার দোষ বা দৈন্য মনে করিতে হইবে। পাত্র-পাত্রীর কথা শুনিয়া ব্যক্তিগ্রহ—নাটকের একটি প্রধান অঙ্গ।"

একখানি নাটকের পক্ষে চরিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষণের যেমন প্রয়োজন, আবার অতিভাষণও তেমনি ভাল নয়। এককালে ছিল যখন রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া বড় বড় বক্তৃতা দেওয়া অভিনেতার পক্ষে নিন্দার কথা ছিল না, কিন্তু আজকের দিনে তাহা অবশ্য নিন্দনীয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিও বদলাইয়া গিয়াছে। পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যে সাধারণ কথাবার্তা হয় তাহাতে প্রত্যেক চরিত্র আপন-আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। পাত্র-পাত্রীর সংযত কথাবার্তা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নাটককে একটি চরম পরি-ণতির দিকে লইয়া যায়। সেইজন্য নাটকের মধ্যে পাত্র-পাত্রীর বাজে কথা কহিবার অবসর নাই।

নাট্যকারের নিজ মন্তব্য প্রকাশের বাহনই হইতেছে নাটকীয় সংলাপ। ইংরেজিতে সংলাপের প্রকার ভেদ আছে; ইংরেজির ন্যায় সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রেও এই প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। পাত্রান্তরের শ্রবণের অযোগ্যরূপে যে নাটকীয় বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহাকে 'স্বগতোক্তি' (Soliloquy) বলে।

উপস্থিত সকল পাত্রের শ্রবণযোগ্য বাক্যের নাম 'প্রকাশ' (Expression)। অপর পাত্রের নিকট হইতে ফিরিয়া যে রহস্য বস্তু প্রকাশ করা হয়, তাহা 'অববারিত' (Disclosure)। অন্য পাত্রকে প্রচ্ছাদনপূর্বক একজনের নিকট অপরের বাক্য প্রয়োগের নাম 'জনান্তিক' (Aside)। রঙ্গমঞ্চের ভিতর হইতে চীৎকার করিয়া যে কথা উপস্থিত নাটকীয় চরিত্রগুলিকে শুনান হয়, তাহাকে 'নেপথ্যভাষণ' (Voice from within) বলে।

বর্তমানে সংক্ষিপ্ত এবং বাস্তব কথাবার্তাকেই নাটকের বিচারকালে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়। কিছুদিন পূর্বে রচিত নাটকে আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষা প্রয়োগের রীতি ছিল। স্বামী-স্ত্রীর সম্বোধনের মধ্যে 'নাথ' 'প্রভু' 'আর্যপুত্র' 'জীবনস্বামী' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতের রাজ-পরিবেশ নাটকীয় বিষয়বস্তু ছিল বলিয়া, এইরূপ সম্বোধন সম্ভব হইত। এখন আর এরূপ সম্বোধন বা ভাষা কোন নাটকেই চলে না। নাটকের ভাষা সুন্দর হইলে, নাটকীয় রসবস্তুও উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

বর্তমানে নাটকে স্বগতোক্তির স্থান নাই। একলা দাঁড়াইয়া দীর্ঘ ভাষণের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিলে চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়। নাটকের কথাবার্তার মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ না থাকিলে, সে কথাবার্তা নাটকের যোগ্য হয় না।

নাটকের সুন্দর ভাষা মানুষের হৃদয়ের ব্যথা, মান, অভিমান, আনন্দ প্রভৃতি বিচিত্র সংঘাতের বহির্মুখী প্রকাশ (Expression)। নাট্যকার এই ভাষার সাহায্যেই মানুষের জীবনের একটা বিশেষ মুহূর্তের কাহিনী রচনা করেন। আবার এই নাটকীয় ভাষা সুনিপুণ নাট্যকারের হাতে পড়িলে ছন্দে-গানে, চিত্রে-বৈচিত্র্যে অভিনব হইয়া ওঠে। সেইজন্য নাটকের হৃদয়-গ্রাহী ভাষাকে সৃষ্টি (Creation) বলা হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর নাটকের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভাষা প্রয়োগের রীতি দেখা দেখা যায়। 'কমেডি'-জাতীয় নাটকের ভাষা গদ্য বা গদ্যাত্মক। 'ট্রাজিডি'র সঙ্গে হৃদয়াবেগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া 'ট্রাজিডি'র ভাষা পদ্য, পদ্যাত্মক বা গদ্য-পদ্য মিশ্রিত। পদ্যে রচিত বাঙলা নাটকে সাধারণতঃ হাস্য-রসাত্মক দৃশ্যে গদ্য বসানর নিয়ম আছে। শেকস্‌পীয়র, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র-লাল প্রভৃতির রচিত অনেক নাটকে এই মিশ্র-রীতির সন্ধান মেলে। আধুনিককালে অমিত্রাক্ষর ছন্দের আশ্রয়ে নাটক রচনার আদর্শ আর নাই। আধুনিক অধিকাংশ নাটকই গদ্যে লেখা হইয়া থাকে।

মাইকেল মধুসূদন গদ্যে নাটক লেখার পক্ষপাতী ছিলেন।[৪] তিনি

৪। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত সংলাপকেই নাটকের যথার্থ সংলাপ বলিয়া মনে করিতেন। তবে অমিত্রাক্ষার ছন্দের প্রচলন না হওয়া পর্যন্ত তিনি গদ্যসংলাপ ব্যবহার করাই যুক্তি যুক্ত ভাবিয়াছিলেন।

'কৃষ্ণকুমারী নাটক' লিখিবার সময় একখানি পত্রে সে কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার নাট্যরচনার প্রথমযুগে বলিয়াছিলেন—"ছন্দে কথা নাটকের উপযোগী" এবং সেই নিমিত্ত তিনি 'গৈরিশী ছন্দে'র প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে গদ্যভাষা পরিপুষ্টি লাভ করিলে, তিনি পদ্য ছাড়িয়া গদ্যেই নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিয়াছিলেন, পদ্যের ঝংকার গদ্যে দেওয়া যায়, কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই। নাটক অভিনীত হয় বলিয়া উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় ততই ভাল। সেজন্যই প্রথমদিকে তিনি পদ্যে কয়েকখানি নাটক লিখিলেও পরে অধিকাংশ নাটক গদ্যে রচনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এখনও কোন কোন সমালোচক মনে করিয়া থাকেন যে, ভবিষ্যতে পদ্য আবার নাটকের ভাষারূপে ফিরিয়া আসিবে। বর্তমানের পদ্যাত্মক ভাষা বড়ই সাহিত্যঘেঁষা হইয়া পড়িয়াছে, তাই নাটকীয় ভাষণের পক্ষে তাহা একেবারেই উপযুক্ত নয়। এই ভাষা আবার নবরূপে ফিরিয়া আসিয়া নাটক ও নাট্যালয়কে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।

(খ) গঠনকৌশল

কাহিনী, চরিত্র, ঘটনা-সমাবেশ এবং সংলাপ—এগুলি নাটকের প্রধান উপাদান। কিন্তু এই উপাদানগুলি থাকিলেই যে, যে-কোন কথোপকথনমূলক রচনা নাটক হইয়া উঠিবে, এমন কোন কথা নাই। এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলি একত্র গ্রথিত হইয়া নাট্যাভিনয়কালে যদি তাহা দর্শকদের মনে এক ভাবরসের সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তবেই তাহাকে নাটক বলা যাইতে পারে। এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে সমষ্টিগতভাবে রসস্থ করিয়া তুলিবার নাট্যশাস্ত্রসম্মত কয়েকটি নিয়ম আছে। তাহাকেই নাটকের গঠন কৌশল বলে।

১। সংঘাত, গতি ও চমৎকারিত্ব

নাটকীয় রস-সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ তিনটি—সংঘাত, গতি ও চমৎকারিত্ব। নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যে মানসিক দ্বন্দ্ব থাকে, তাহাই নাটকে ঘটনার সংঘাতে আত্মপ্রকাশ করে। নাটকীয় ক্রিয়া ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে এই যে সংঘাত (Conflict) সৃষ্টি হয়, ইহাই ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতের গতিবেগ (Action-এ) নাটকীয় অবশ্যম্ভাবী পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়া দর্শকের মনে এক অভূতপূর্ব চমৎকারিত্ব বা আনন্দ রসের (Dramatic surprise বা Excellence) সৃষ্টি করিয়া থাকে। নাটকে সংঘাত না থাকিলে গতি থাকে না, আবার গতি না থাকিলে কোন চমৎকারিত্ব থাকে না; সুতরাং এই তিনের সমন্বয়েই নাটকের সার্থকতা।

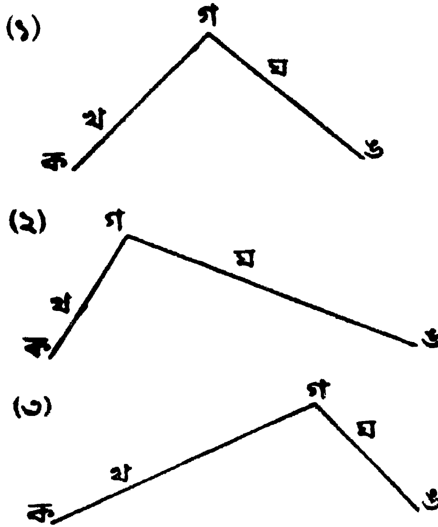
সংঘাতের প্রকারভেদ দুইটি—অন্তর্মুখী (Inner) এবং বহির্মুখী (Outer)। চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের, মনের সঙ্গে মনের এবং ব্যক্তির সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বা কোন অদৃশ্যশক্তির দ্বন্দ্বের যে ফল বাহ্যিক ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকেই বহির্মুখী সংঘর্ষ বলে। প্রাচীন গ্রীকনাটকে ইহা খুব বেশি দেখা যাইত। এলিজাবেথীয় যুগ হইতে অন্তর্মুখী সংঘর্ষের সূত্রপাত। অন্তর্মুখী সংঘর্ষে অন্তরের আলোড়ন যতখানি থাকে, বাহ্যিক ক্রিয়ার সাহায্যে তাহার প্রকাশ ততখানি থাকে না। এই অন্তর্মুখী সংঘর্ষ বহির্মুখী সংঘর্ষের সহিত তাল রাখিয়া চলে, কখনো উভয়ে একসঙ্গে মিশিয়া গিয়া ট্রাজিডির রস ও মাধুর্য সৃষ্টি করে। কিন্তু শেষে অন্তর্মুখী সংঘর্ষই প্রাধান্য লাভ করে। নানা বিরুদ্ধ শক্তির আবর্তনে ট্রাজিডিতে সহানুভূতি এবং ভয় (pity and terror) এবং কমেডিতে হাসির সন্ধান পাওয়া যায়।

২। নাটকের স্তর-বিভাগ

নাটক যখন নাট্যকলার অন্তর্গত, তখন ইহা যে কোন প্রকারে গ্রথিত হইলেই চলে না। ইহার রচনা করিবার একটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। নাট্যকারকে সকল সময়েই রচনা-পদ্ধতির শাসন মানিয়া চলিতে হয়। এদেশে ও বিদেশে যে সকল উৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইয়াছে, সে-গুলির মধ্যে নাটক রচনার একই পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে। নাটকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি বা স্বার্থের যে সংঘর্ষ দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে তাহার এক পক্ষ সৎ ও অপর পক্ষ অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সতের জয় দেখান অনেক নাটকের উদ্দেশ্য থাকে। নাটকে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত নাটকীয় কাহিনী-বিন্যাসের বিশিষ্ট পদ্ধতিটি পালন করিতে হয়। দুইটি বিপরীত শক্তির একটির উত্থান ও অপরটির পতন, নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও বাধার মধ্য দিয়া সূচিত হয়। শেষে যখন একটি শক্তি প্রবল হয়, তখন নাটকীয় কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে। সকল নাটকেরই একটি সংঘর্ষ হইতে সূত্রপাত হয়, এবং সেই সংঘর্ষ একটি পরিণতিতে পৌঁছিলে নাটকমাত্রেই সম্পূর্ণতা লাভ করে।

ইংরেজি অলংকার শাস্ত্রের মতে এই ক্রম-পরিণতির যে পাঁচটি স্তর আছে তাহা এইরূপ—(১) Introduction, initial incident or incidents—অর্থাৎ সংঘর্ষের সূত্রপাত; (২) Rising action or growth of action or complication—অর্থাৎ সংঘর্ষ তীব্র, ফলাফল অনিশ্চিত; (৩) Climax, crisis or turning point—অর্থাৎ একটি শক্তি প্রবল; (৪) Falling action or resolution or denouement—অর্থাৎ প্রবল শক্তির জয় ঘোষণা; (৫) Catastrophe or conclusion—অর্থাৎ সংঘর্ষের অবসান।

নাটকের ক্রম-পরিণতিকে একটি Pyramid-এর সহিত তুলনা করিয়া বিচার করিবার রীতি আছে। Freytag এই পদ্ধতির প্রবর্তক। কিন্তু বর্তমানে ইহার নানা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি বিশেষ ধারা নিম্নের নক্সাগুলিতে প্রদর্শিত হইল।



[১নং নক্সা—ক=Introduction, খ=Rising action, গ=Climax, ঘ=Falling action, ঙ=Catastrophe. এই Rising action কখনও অতি দ্রুত উঠিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া যায়, আবার কখনও অতি ধীরে উঠিয়া দ্রুত নামিয়া যায়। ২নং ও ৩নং নক্সায় তাহাই দেখান হইয়াছে।]

শেকস্‌পীয়রের সকল নাটকই পঞ্চাঙ্ক পরিমিত এবং তাহাতে এই পাঁচটি বিভাগের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক নাট্যকারদের রচনা তিন অঙ্ক বা চার অঙ্কের হইলেও সংঘর্ষের এই পাঁচটি স্তর তিন বা চার অঙ্কের মধ্যে সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে দেখা যায়। এমন কি একাঙ্ক নাটকের মধ্যেও নাটকীয় রস-সৃষ্টির এই উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়।

ইংরেজির ন্যায় সংস্কৃতেও নাটকীয় রস-বিকাশের পাঁচটি স্তর আছে। এই পাঁচটি স্তরের নাম পঞ্চসন্ধি। সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের মতে—"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি-সমন্বিতম্" অর্থাৎ নাটকে একটি প্রখ্যাতবংশের কীর্তি-

কাহিনী বর্ণিত হইবে এবং নাটক (১) মুখ (২) প্রতিমুখ (৩) গর্ভ (৪) বিমর্ষ (৫) উপসংহৃতি—এই পঞ্চসন্ধি সমন্বিত হইবে। প্রথম স্তরে বীজ বপন ও ঘটনার উৎপত্তি; দ্বিতীয়ে বিষয়ান্তর-সূচনা ও প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা; তৃতীয়ে অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সংঘর্ষ; চতুর্থে বিঘ্নসমাগম ও অতিক্রম; পঞ্চমে পরিণাম ফল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পঞ্চসন্ধি সন্নিবেশের রীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে প্রায় একই প্রকারের। সংস্কৃত নাটক পাঁচ হইতে দশ অঙ্ক পর্যন্ত হয়। তাহাতে পঞ্চসন্ধি স্বেচ্ছামত সন্নিবেশিত থাকে।

৩। অঙ্ক ও দৃশ্য-বিভাগ

নাটককে নানা অঙ্কে ও দৃশ্যে খণ্ডিত করিয়া সাজানোর নিয়ম আছে। প্রত্যেক অঙ্ক সম্পূর্ণ নাট্যাংশের এক একটি বিচ্ছিন্ন অংশ, কিন্তু প্রত্যেক অঙ্ক স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ। যে-বিষয়টি অঙ্কের গোড়াতে উপস্থাপিত হয়, তাহার সমাপ্তি অঙ্কের শেষে লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি গর্ভাঙ্কে বা দৃশ্যে আবার অঙ্কের এই পরিণতি সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেক অঙ্ক আবার মূল নাটকীয় গতি ও পরিণতি হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। নাট্যকার এই খণ্ডিত অঙ্কগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন। প্রায়ই অঙ্কের শেষে পাত্র-পাত্রীদের ভাষণের মধ্যে এমন একটি ইঙ্গিত থাকে, যে ইঙ্গিতের পুনরুত্থাপনেই নূতন অঙ্কের সূত্রপাত হয়। নাটককে এইরূপে খণ্ডিত করিবার প্রথা কেবল-মাত্র নাট্যরস-বিকাশের জন্যই আসে নাই, অভিনয়ের নানাপ্রকার প্রচেষ্টা হইতেও আসিয়াছে। অভিনয়কালে নানা বাস্তব ও বিচিত্র দৃশ্যের সংস্থাপনের নিমিত্তও সম্পূর্ণ নাটককে অঙ্ক ও দৃশ্যে ভাগ করিয়া লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে। তাই দেখা যায় যে, গ্রীকদের সময়ের তিন অঙ্ক নাটক রোমীয় নাট্যকার সেনেকের হাতে গিয়া পাঁচ অঙ্কে পরিণত হইয়াছে। হোরেস তাঁহার নাট্যসূত্রে স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, "নাটককে পাঁচ অঙ্কের করিতেই হইবে—ইহার কম বা বেশি হইলে চলিবে না।" এই আদর্শ এলিজাবেথীয় যুগ হইতে সুরু হইয়া অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইংলণ্ডে অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু ক্লাসিক নাট্যকারদের মত এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকাররা স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য মানেন নাই। তাঁহারা নাটকের ঐশ্বর্য বিস্তারের নিমিত্ত নাটকের ঐক্যনীতি লঙ্ঘন করিয়াছেন। নাটকীয় ঘটনার এই প্রাচুর্য নাটককে নানা অঙ্কে ও দৃশ্যে বিভক্ত করিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে।[৫]

বাঙ্‌লা নাটকেও অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ দেখা যায়, এবং ইহাতে দৃশ্য ও গর্ভাঙ্ক একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রে গর্ভাঙ্কের

৫। এজন্য ঐ জাতীয় নাটককে রোমাণ্টিক নাটক বলা হইয়া থাকে।

অন্য অর্থ আছে। রামনারায়ণ তর্করত্ন তাঁহার 'নব নাটক' ও 'রুক্মিণীহরণ নাটক'-এ ইংরেজি নাটক-রচয়িতাদের অনুকরণে গর্ভাঙ্ক প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিয়া, রামগতি ন্যায়রত্ন রামনারায়ণের নাট্য সমালোচনার কালে তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন। মাইকেলের নাটক-সমালোচনার উপলক্ষেও রামগতি ঐ একই কথার পুনরুল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

> "এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই নাটকীয় অঙ্ক সকলের প্রথমে 'প্রথম গর্ভাঙ্ক' 'দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক' ইত্যাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়া দেখিলাম যে সেইগুলি সেই সেই অঙ্কের অবান্তর ভাগ। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ঐ সকল, 'গর্ভাঙ্ক' শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট হওয়া উচিত নহে। কারণ সংস্কৃত আলংকারিকরা 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের অন্যরূপ অর্থের বোধনার্থ লক্ষণ করিয়াছেন—সাহিত্য-দর্পণকার লেখেন যে, অঙ্কের মধ্যেই রঙ্গদ্বার, প্রস্তাবনা, বীজ ও ফলোৎপত্তি সমেত যে, অপর এক অঙ্ক প্রবিষ্ট হয়, তাহাকেই গর্ভাঙ্ক বলা যায়। এতদুক্তলক্ষণ গর্ভাঙ্কের সহিত এক্ষণকার নাটক রচয়িতাদিগের গর্ভাঙ্কের একতা হয় না।"—(বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন)

৪। নাটকের ঐক্যনীতি

প্রাচীনপন্থী নাট্যকারগণ নাটকের সংগঠনে তিনটি ঐক্যনীতির অনুসরণ করিতেন। এই তিনটি ঐক্যনীতি—স্থানের ঐক্য (Unity of place) কালের ঐক্য (Unity of Time) এবং ঘটনার ঐক্য (Unity of Action)।[৬]

৬। স্থান ঐক্য বলিতে বোঝায় যে নাটকের ঘটনা একটিমাত্র স্থানে সংঘটিত হইবে। যেমন 'টেমপেস্ট' নাটকে সমগ্র ঘটনা নির্জন দ্বীপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 'রক্তকরবী' নাটকে সমগ্র ঘটনা 'যক্ষপুরীতে' ঘটিয়াছে।

সময় ঐক্য সম্বন্ধে আরিস্টটল বলিয়াছেন যে ট্র্যাজেডি যেহেতু দৃশ্যকাব্য সেই হেতু তার কাল সীমা যতদূর সম্ভব সূর্যের একটিমাত্র আবর্তন অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

ঘটনা ঐক্য সম্বন্ধে আরিস্টটল বলিয়াছেন, "So the plot being an imitation of action, must imitate one action and that a whole." অর্থাৎ নাটকে একটিমাত্র ঘটনাকে উপস্থাপিত করিতে হইবে। উপকাহিনী বা শাখাকাহিনী ঘটনা ঐক্যের পরিপন্থী; অবশ্য আরিস্টটল কথিত একক ঘটনা বলিতে একটি ঘটনা না বুঝিয়া একধর্মী বিভিন্ন ঘটনাকেও বুঝিতে হইবে। এই দিক হইতে ঘটনা ঐক্য বলিতে ভাব ঐক্যকেও বুঝিতে হইবে।

ত্রয়ী ঐক্য বাধলে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে আলোচক বইলু সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন, "Let the stage be occupied to the end by a single completed action, which takes place in one spot, in one day."

নাটকের ত্রয়ী ঐক্য একটি কৃত্রিম বিধান। এই বিধান প্রাচীনকালেও নাট্যকারেরা আক্ষরিক ভাবে মানেননাই।

Aristotle) কেবলমাত্র সময়ের ঐক্যের কথা বলিয়াছেন, অন্য দুইটি সম্বন্ধে নীরব। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেও স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য নাই। সংস্কৃত নাটকের ঘটনাবলী বহুকালব্যাপী ও বহু স্থানে সংঘটিত হইত। দ্বাদশবর্ষব্যাপী ঘটনাবলী ভবভূতির 'মহাবীর চরিতে' সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইংরেজি সাহিত্যে 'মধ্যযুগের' Neo-classic নাটকে এই স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য দেখা যায়। Neo-classic নাটক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"Let the stage be occupied to the end by a single completed action, which takes place in one spot, in one day." এই ঐক্যনীতি Ben Jonson-এ দেখা যায়; কিন্তু Shakespeare—The Tempest এবং The Comedy of Errors ভিন্ন সর্বত্রই কেবলমাত্র আখ্যানবস্তুর ঐক্যকেই মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট দৃশ্যাবলী এক দেশ হইতে অপর এক দেশে, এক কাল হইতে অপর এক কালে চলিয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি ঐক্যনীতির বিষয়ে Shakespeare-এর পদানুসরণ করিয়াছেন। Arnold Bennett ও Knoblock-এর লেখা আধুনিক নাটক Milestones বাহান্ন বৎসরের ঘটনা লইয়া গঠিত। ইহাতে কালের ঐক্য না থাকিলেও ঘটনার সাদৃশ্যমানতা ও স্থানের ঐক্য আছে। একটি পরিবারের তিন পুরুষের কাহিনী তিনটি অঙ্কে একই স্থানে সুন্দরভাবে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। বার্নার্ড শ' তাঁহার Back to Methuselah নাটকে পাঁচটি খণ্ডে পাঁচখানি নাটক গ্রথিত করিয়াছেন। প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যতে মানব কি রূপ গ্রহণ করিবে তাহারই একটি ধারাবাহিক ইতিহাস তিনি ইহাতে রচনা করিয়াছেন। ১ম খণ্ডের সময় বলা হইয়াছে খ্রীঃ পূঃ ৪০০৪; ২য় খণ্ড ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ; ৩য় খণ্ড ২১৭০ খ্রীষ্টাব্দ; ৪র্থ খণ্ড ৩০০০ খ্রীষ্টাব্দ; ৫ম খণ্ড ৩১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ। এত দীর্ঘ সময় লইয়া নাটক রচনার প্রয়াস আর কেহ করেন নাই। ইহাকে নাটক না বলিয়া নাটকাকারে ইতিহাস বলিলে বোধহয় অন্যায় হয় না। আধুনিক নাট্যকারগণ ঘটনার ঐক্যকেই নাটকের পক্ষে অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। Ibsen-এর The Doll's House এবং Sherrif-এর Journey's End ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(গ) একাঙ্কিকা

নাটকের আঙ্গিকের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, পূর্বে পঞ্চাঙ্কের মধ্যে যে নাটকীয় ঘটনার স্থান সংকুলান হইত, এখন তাহা তিন অঙ্ক বা একাঙ্কের মধ্যে হইতেছে। ইহার কারণ বোধহয় এই যে, পূর্বে মানুষের যে জীবন-সমস্যা ছিল, আজ তাহা ক্রমেই বদলাইয়া যাইতেছে। তাই আধুনিক নাটকের

আকৃতি ও প্রকৃতিও পরিবর্তন লাভ করিতেছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—

"ভাষার কবিত্বময় উচ্ছ্বাস ও অলংকার-স্ফীতি সাধারণ জীবনের সম্পর্কে আপনার আতিশয্যে আপনি লজ্জিত হইয়া প্রতিদিনের গদ্যে সংকুচিত হইতেছে। আবার এই আকৃতি-পরিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক নাটকের প্রকৃতি-পরিবর্তনও ঘটিতেছে। এই অন্তর্দৃষ্টির যুগে মানুষ বাহিরের বিস্ময় হইতে দৃষ্টি সংহৃত করিয়া অন্তরের গভীরতর রহস্যের দিকে প্রেরণ করিতেছে। যাহা তুচ্ছ ও সামান্য, তাহার মধ্যেও অনন্ত রহস্যের সংকেত ও ইঙ্গিত স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে।"- -(রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য)

বর্তমানে পঞ্চাঙ্ক নাটক তিন অঙ্ক বা একাঙ্কের আধারে লিখিত হইলেও, পূর্বে যে একাঙ্ক নাটিকা ছিল না, তাহা নহে। অনেকের ধারণা একাঙ্ক নাটিকা বিংশ-শতাব্দীর সৃষ্টি। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসদেশে একাঙ্কিকার প্রচলন ছিল। মধ্যযুগের ইংরেজি সাহিত্যে যে Mystery, Miracle, Morality, ও Interlude Plays-এর কথা শোনা যায়, সে-গুলি সবই একাঙ্কে সমাপ্ত। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে যখন নীতিবাগিশদের দ্বারা ইংলণ্ডে নাট্যাভিনয় বন্ধ হইয়া যায়, তখন ভ্রাম্যমান অভিনেতারা Drolls নামে এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকার অভিনয় করিত। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে সখের দলের অভিনয়ার্থ অনেকগুলি একাঙ্ক নাটিকা লেখা হয়। সেগুলি প্রধানতঃ হাস্যরসাত্মক কাহিনী লইয়া রচিত। বিংশ-শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় একাঙ্ক নাটিকা নূতন পদ্ধতিতে লেখা সুরু হইয়াছে এবং ইহা মূল্যবান সাহিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বর্তমানে দেশের সুবিখ্যাত রঙ্গালয়ে এবং অভিজাতদিগের সামাজিক বৈঠকে ইহা সাদরে অভিনীত হইতেছে। ইহা ট্রাজিডি বা কমেডি যে-কোন শ্রেণীর হইতে পারে। এখন বহু বিখ্যাত লেখক একাঙ্কিকা লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিতেছেন। একটি বিশেষ ভাব, সমাজের কোন বিশেষ সমস্যা, কিংবা কোন বিশেষ চরিত্রের যে গভীরতর দিক আছে, তাহাই প্রতিফলিত করিয়া একাঙ্কিকা লিখিত হইতেছে। একাঙ্কিকা স্বল্প-পরিধিবিশিষ্ট একটি ঘটনা-সংস্থানের মধ্যে পরিকল্পিত হয় এবং এই ক্ষুদ্র পরিবেশের মধ্যে ইহার চরম পরিণতি দেখান হয়।

ইংরেজিতে John Galsworthy, Clifford Bax, J. M. Synge, Alfred Noyes, A. A. Milne প্রভৃতি একাঙ্কিকা লিখিয়া যশ অর্জন করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনের কোন উজ্জ্বল ঘটনা লইয়াও ইংরেজিতে কয়েকখানি একাঙ্কিকা লিখিত হইয়াছে—যেমন, Rubinstein-এর Johnson was no gentleman, Ivor Brown-এর William's other Anne, Morris-এর Mirror to Elizabeth প্রভৃতি।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে একাঙ্কিকার উল্লেখ দেখা যায়। বাঙলায়ও ইহা কিছু কিছু লেখার চেষ্টা হইয়াছে। শুধু এক অঙ্কের নাটক হইলেই একাঙ্কিকা হয় না, অথবা একাঙ্কিকা ঠিক পঞ্চমাঙ্ক নাটকের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। একটি বিশেষ মুহূর্তে গভীর ভাবোদ্দীপক একটি ক্ষুদ্র ঘটনার বিদ্যুৎ-গতিতে নাটকীয় চরম পরিণতি দেখান একাঙ্কিকার উদ্দেশ্য। সুতরাং বাঙলায় যে-সব নাটক একাঙ্কিকা বলিয়া চলিতেছে, তন্মধ্যে কয়খানি প্রকৃত একাঙ্কিকা তাহা ভাবিবার বিষয়। বাঙলাদেশে একাঙ্কে রচিত হাস্যরসাত্মক প্রহসন অনেকগুলি আছে, কিন্তু সেগুলি ঠিক একাঙ্কিকা নয়। একাঙ্কিকার বাঁধন, সৌন্দর্য ও কৌতূহল সেগুলির মধ্যে নাই। গিরিশ চন্দ্র ঘোষের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' 'বৃষকেতু' পৌরাণিক একাঙ্ক নাটক। কিন্তু এ দুইখানির কলা-কৌশলও প্রশংসনীয় নয়। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ঘটক ও স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরীর একাঙ্কিকা নাটকগুলি গভীর না হইলেও হাস্যোজ্জ্বল। শ্রীমন্মথ রায়ের একাঙ্কিগুলি মন্দ নয়। আধুনিক লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ একাঙ্কিকা লিখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। শ্রীপরিমল গোস্বামী, শ্রীযামিনী মোহন কর, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, শ্রীপ্রবোধ মজুমদার এবং আরও অনেকেই একাঙ্কিকা লিখিযাছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রবোধবাবুর 'শুভযাত্রা' এবং শিবরামবাবুর 'চাকার তলায়, ও 'ওরা যখন জাগবে' উল্লেখযোগ্য রচনা। শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'নতুন তারা' নামক গ্রন্থের একাঙ্ক পরিমিত নাটিকাগুলি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

অনেকে বলেন, আমাদের দেশে নাটক লিখিবার উপকরণ নাই। কিন্তু সে-কথা সত্য নয়। বর্তমানে দুর্ভিক্ষের আওতায় পড়িয়া নিরন্ন, বুভুক্ষু, উৎপীড়িত মানুষ যে-সব পথে-ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়, তাহারা কি নাটকের উপকরণ নয়? তাহা ছাড়া মধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখও কি কম? দরিদ্র কেরাণী, নিঃসহায় বিধবা, কর্মহীন শিক্ষিত যুবক, সহায়-সম্বলহীন অবিবাহিতা কুমারী ইহারা কি নাটকের বিষয় নয়? অভাব উপকরণের নয়, অভাব যাহা তাহা লেখকের। দেশে শক্তিশালী লেখক থাকিলে ইহাদের মধ্যে কেহই উপেক্ষিত হইতে পারিত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নাটকের বিষয়বস্তু

নাটকের বিষয়বস্তু নানাপ্রকারের হইয়া থাকে—যথা পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও কল্পনাশ্রয়ী। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া যে সকল নাটক লিখিত হয়, তাহাই পৌরাণিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটকের উপাদান ইতিহাস হইতে, সামাজিক নাটকের উপাদান সমাজ হইতে এবং কল্পনাশ্রয়ী নাটকের উপাদান দেশপ্রচলিত গল্প বা লেখকের সম্পূর্ণ কল্পিত কাহিনী হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। বিষয়বস্তুর এই বিভাগ মোটামুটিভাবে ধরা যাইতে পারে, কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে, ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে সমাজচিত্র বা সামাজিক কাহিনীর মধ্যেও কাল্পনিক ঘটনা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সুতরাং নিছক এবং সুস্পষ্ট বিভাগ কোন কিছুরই হইতে পারে না, একের সঙ্গে অন্যের যোগ থাকিবেই।

১। পৌরাণিক নাটক

ঊনবিংশ শতকের মাঝখান থেকেই বাঙলা ভাষায় পৌরাণিক নাটক লেখার সূত্রপাত হয়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তারাচাঁদ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকই বোধহয় বাঙলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য পৌরাণিক নাটক। ইহার পরে আরও অনেকেই লিখিয়াছেন, যেমন নাম করা যাইতে পারে—মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা', কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী-সত্যবান', মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক নাটক', 'সতীনাটক' ও 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' এবং হরলাল রায়ের 'শত্রুসংহার' প্রভৃতি। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষই পৌরাণিক নাটক লিখিয়া সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণবধ' রচিত হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে, এবং সর্বশেষ নাটক 'তপোবল' রচনা করেন ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। সুপণ্ডিত হরিনাথ দে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষমতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"Many of us thought it was no loger possible to revive Pouranik plots in modern dramas. Girish proved it false." সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক নাট্য-সমালোচকেরা, যে নাটকের প্রচলন সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন, গিরিশচন্দ্র সেই সন্দেহকে অমূলক প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আধুনিক ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যের বিচারে পৌরাণিক নাটকের তেমন সমাদর নাই। ধর্ম-প্রচারের সহায়করূপে একদিন ইংলণ্ডে নাটকের জন্ম হইয়াছিল সত্য, কিন্তু Mystery, Miracle, Morality এবং Interlude শ্রেণীর নাটকের প্রয়োজনীয়তা এলিজাবেথীয় যুগের পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে নানা বাস্তব সমস্যা ও সমাজ-মানসের বিক্ষোভ দেখা যাইতেছে। সেইজন্য সেখানকার আধুনিক সমালোচকেরা ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ গীতিসম্বলিত পৌরাণিক নাটককে নাটক বলিতে কুণ্ঠিত হন।

কিন্তু বাঙলা-নাটক বিচারকালে পৌরাণিক নাটকের গৌরব হ্রাস করিলে চলিবে না। কারণ বাঙলা-নাটক এখনও তাহার কাব্য-সীমা অতিক্রম করিয়া নাটকের রাজ্যে পৌছাইতে পারে নাই। মধুস্দন একদিন বাঙলা নাটক সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও মোটামুটিভাবে আজিও সত্য রহিয়া গিয়াছে। মধুস্দন বলিয়াছিলেন—

"In the Great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality, and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country ; Ours are dramatic poems."

(মাইকেল মধুস্দন দত্তের জীবন-চরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু)

সুতরাং বাঙলা নাটকের আদি যুগই যখন শেষ হইল না, তখন ইংরেজি নাটকের আদিযুগে ধর্মপ্রচার যেমন উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের নাটকেও সে কার্য এখনও কিছুদিন চলিবে বলিয়া মনে হয়। এ-বিষয়ে অযথা নাট্যকারদের দোষ দিলে চলিবে না, দেশের জনসাধারণও নূতন নাটকের জন্য প্রস্তুত নয়। এই বিংশ শতাব্দীতেও বাঙলার রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকাইলেই বোঝা যায় যে বাঙালী দর্শকেরা কি পরিমাণে ধর্ম-পিপাসু। অবশ্য এই ধর্ম-পিপাসার আমি নিন্দা করিতেছি না, আমি দুঃখ করিতেছি ভাল নাটক দেশে তেমন লেখা হইতেছে না বলিয়া।

গিরিশচন্দ্র এই পৌরাণিক নাটক লেখার পক্ষে একটি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"জাতীয় বৃত্তি-পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম—ধর্ম! দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্মিক। যাহারা চৈত্রের রৌদ্রে হল-সঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্বজনিক হওয়া

প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণনামেই হইবে। ইংরেজি ভানে, বিদেশীয় ভানে, যাঁহারা সেই ভান করেন, তাঁহারা ভারতের মর্ম বুঝেন না—সেই ভানে জাতীয় উন্নতি কখনই হইবে না ”—(পৌরাণিক নাটক)

রাষ্ট্রীয় ইতিহাস আমাদের দেশের লোক অতি অল্পই জানে, সেইজন্য ইতিহাস অপেক্ষা পুরাণকাহিনী শুনিতে তাহারা অধিক ভালবাসে। মধুসূদন, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অপরেশচন্দ্র প্রভৃতি রঙ্গালয়ের যাঁহারা যশস্বী নাট্যকার তাঁহারা সবাই তাই নাটক-সৃষ্টির ব্যাপারে পুরাণকে অবহেলা করিতে পারেন নাই। কেবল রবীন্দ্রনাথ যা একটু ভিন্নপথে চলিয়াছেন। সেইজন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের চিত্ত জয় করিতে পারেন নাই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের নাটক জনসাধারণের প্রীতিকর না হওয়ার আরও অনেক কারণ আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে মূলতঃ নাটক লিখিলেও, ‘পাষাণী’, ‘সীতা’ ও ‘ভীষ্ম’—এই তিনখানি নাটক ও নাট্যকাব্যের উপাদান তিনি পুরাণ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তিকেও এই ধর্মাশ্রয়ের মধ্য দিয়া চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ‘বুদ্ধদেব-চরিত’ হিন্দু-ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে রচিত একখানি পৌরাণিক ধর্মমূলক নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়।

পৌরাণিক নাটকের মূল সুর হইতেছে, ভগবানের প্রতি অগাধ ভক্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস।[১] ভগবানের মহিমা প্রচারের জন্যই এগুলি বিশেষ করিয়া লিখিত। সুতরাং সাধারণ নাটকের নিয়মে এগুলির বিচার করা চলে না। এই শ্রেণীর নাটকে নাটকীয় সংঘর্ষ অপেক্ষা বিরোধহীন ভাবাবেগ সর্বত্র লক্ষিত হয়। দেব-মাহাত্ম্যে সাধারণ মানুষের জীবন ও পৌরুষ এই সব নাটকে নষ্ট হইয়া যায়। নাটকের রচনা-শৈলীও দুর্বল হইয়া পড়ে। গিরিশচন্দ্রের ‘জনা’ ‘পাণ্ডব-গৌরব’ ‘চৈতন্যলীলা’ ‘বিল্বমঙ্গল’ প্রভৃতিতে ভগবান ও ভগবানের অবতারের প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি, প্রেম ও বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে। ‘জনা’-নাটকে মহাবীর প্রবীর নাট্যকারের দেবভক্তির পদতলে আত্মবলি দিয়াছে। ইহাতে প্রবীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর নাটকখানিও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আবার এক শ্রেণীর নাটক আছে যাহাতে দৈবের বিরুদ্ধে পুরুষকারের প্রতিযোগিতা সংঘটিত হইয়াছে, দেখা যায়। দৈবের নিকট পুরুষকারের পরাজয় যেমন করুণ তেমনি হৃদয়বিদারক। ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘নর-নারায়ণে’ কর্ণের অপূর্ব পুরুষত্ব দৈবের কৌশলে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। সমগ্র নাটকটিতে দেবতারই জয় ঘোষিত হইয়াছে।

১। পৌরাণিক নাটকের এইটিই প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিষয়বস্তু পুরাণ হইতে গৃহীত হইলেই তাহাকে পৌরাণিক নাটক বলা যায় না। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা, দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা, রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক নহে।

২। ঐতিহাসিক নাটক

ইতিহাস অবলম্বনে অনেকেই নাটক লিখিয়াছেন। বাঙলায় প্রথম ঐতিহাসিক নাটক বোধহয় মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'। ইহা ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। তৎপূর্বে যে নাটকগুলির নাম পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই হয় পৌরাণিক, নয় সামাজিক অথবা কাল্পনিক বিষয় লইয়া লিখিত। মধুসূদনের পরেই উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' এবং 'অশ্রুমতী' তৎকালে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সুরেন্দ্র মজুমদারের 'হামির'-ও সেকালের একখানি বহু প্রশংসিত ঐতিহাসিক নাটক। তারপরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন। 'আনন্দরহো' তাঁহার সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক নাটক। ইহার পর রাজকৃষ্ণ রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ এবং অপরেশচন্দ্র প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে কয়েকখানি ঐতিহাসিক নাটক বেশ মঞ্চ-সাফল্য লাভ করিয়াছিল। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে —রিজিয়া (মনোমোহন রায়), মিশরকুমারী (বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত), পৃথ্বিরাজ (মনোমোহন গোস্বামী), মোগল-পাঠান (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), ক্ষত্রবীর (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং দেবলাদেবী, বঙ্গেবর্গী (নিশিকান্ত বসু)।

কিন্তু এই সকল নাট্যকারদের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধে ইতিহাসের ব্যতিক্রম করার অপরাধে নালিশ উত্থিত হইয়াছে। যে ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, এমন সত্য ঐতিহাসিক বিবৃত করেন; কিন্তু নাট্যকার বা কবি সেই ঘটনা বর্ণনা করেন যাহা হয়তো সত্যই পৃথিবীতে ঘটে নাই, অথচ যাহা মানুষের চরিত্র এবং স্বভাব দেখিয়া সম্ভাব্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে বিশেষ সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া ইতিহাস রচিত হয়, সে সত্য চিরকালের নয়। নূতন আবিষ্কারের ফলে তাহার পরিবর্তন ঘটে। অথচ ইতিহাসের পটভূমিকায় নাট্যকার যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তাহা নিত্যকালের। সুতরাং ঐতিহাসিক সত্য ও নাটকীয় সত্য ঠিক এক জিনিস নয়। ঐতিহাসিক নাট্যকার তাঁহার রচনায় ঐতিহাসিক রসকেই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই রসের সৃজনটাই প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ঐতিহাসিক নাট্যকার তাঁহার নাটক-সৃষ্টিতে যে পরিমাণ ঐতিহাসিক তথ্যের প্রয়োজন তাহার অধিক গ্রহণ করেন না। নর-নারীর সুখ-দুঃখের সুপ্রত্যক্ষ কাহিনীকে ঐতিহাসিক নাট্যকার একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহাকে বিরাট করিয়া তোলেন।

ঐতিহাসিক নাটক সম্বন্ধে যাহা সত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধেও তাহা সত্য। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে একটা মন্তব্য এখানে উল্লেখ করিলে বোধহয় অন্যায় হইবে না। তিনি বলিয়াছেন—

"ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রসসঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাহার কোন খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন, তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে ধনে হলুদ শর্ষের সন্ধান করেন। মশলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন, তিনি দিন, যিনি বাঁটিয়া-ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন, তাঁহার সঙ্গেও আমার কোন বিবাদ নাই, কারণ, স্বাদই এখানে লক্ষ্য, মশলা উপলক্ষ মাত্র।"—

(সাহিত্য)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এখানে এই কথাটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ইতিহাসকে সম্পূর্ণ রাখিয়াই হোক, অথবা খণ্ডিত করিয়াই হোক, ঐতিহাসিক রসের অবতারণা করিতে পারিলেই ঐতিহাসিক সাহিত্যকারের সার্থকতা। তাই বলিয়া সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্যকে একেবারে উল্টাইয়া দিলেও আবার চলে না। মধুসূদনের মত রাবণকে মহৎ এবং রামচন্দ্রকে কাপুরুষ করিলে, ইতিহাস না হোক, কাব্য ক্ষুণ্ণ হয়। ইতিহাসের পক্ষে তথ্য সত্য হইলেও, কাব্যের পক্ষে তাহা সত্য নয়। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় বস্তুগত সত্য অপেক্ষা কাব্যগত সত্যকে অনেক ব্যাপক ও গভীর বলিয়াছেন। তবুও কাব্য পড়িতে গিয়া ইতিহাসকে একেবারে বাদ দিলে চলে না। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়িতে হইবে এবং আনন্দের জন্য কাব্য পড়িতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি—"যে-ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে, সে হতভাগ্য। কিন্তু যে-ব্যক্তি কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরও মন্দ।" এখানে একজন বিদেশী সমালোচকের নিম্নের উক্তিটি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

"For, to be truly an historical drama, a work should not adhere to the literal truth of history in such sort as to hinder proper dramatic life; that is, the laws of the drama are here paramount to the facts of history; which infers that, where two cannot stand together the latter is to give way. Yet, when and so far as they are fairly compatible, neither ought to be sacrificed; at least historical fidelity is so far essential to the perfection of the work" —(An introduction to the Study of Literature—Hudson).

গিরিশচন্দ্র ইতিহাসকে বজায় রাখিয়া উচ্চশ্রেণীর ঐতিহাসিক নাটক রচনা

করিয়াছেন ; কিন্তু কোন কোন সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালের সৃষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রগুলির অনৈতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহার জবাবে বলিয়াছেন,—

"সমালোচকদিগকে বুঝাইতে কিছুদিন লাগিয়াছে যে নাটক কাব্য—নাটক ইতিহাস নহে। এখন বোধহয় কিছুদিন বুঝাইতে লাগিবে যে, নাটক রাজনৈতিক প্রবন্ধ নহে। "মেবার পতন"—এর ভূমিকায় বলিয়াছি, আবার বলি, সমাজনীতির সঙ্গে নাটকের কোন সম্বন্ধ নাই। যে সময়ের ঘটনা লইয়া যে নাটক রচিত, সেই সময়ের চারিত্রগত অভিব্যক্তি লইয়াই সেই নাটক ব্যাপৃত। বর্তমানের দিক দিয়া তাহার লক্ষ্য নাই। এ নাটক (সাজাহান) যে সময়ের ঘটনা লইয়া লিখিত তখন যাহার মুখে যে উক্তি তাহার মুখে সেই উক্তিই দেওয়া হইয়াছে। যদি নাটকের কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা অতি মহৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনা—যেমন, স্নেহ, সাহস, ভক্তি, অনুকম্পা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি। জাতির প্রতি জাতির সম্প্রীতি বা বিদ্বেষবর্ধন প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতে পারে—নাটকের উদ্দেশ্য নহে। নাটক চিরন্তন ও জগৎব্যাপী সত্য প্রচার করে। অর্থাৎ যাহা দেশকাল নির্বিশেষে সত্য। সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপার তাহার গণনার মধ্যে নাই।"—(সাজাহান নাটকের ভূমিকা—১ম সংস্করণ)

দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন—"নাটক কাব্য—নাটক ইতিহাস নয়।" সে বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল হয়তো অনেকটা সত্য কথা বলিয়াছেন। কারণ ইতিহাসে কর্মের পরিচয়ই মুখ্য, কিন্তু নাটকে হৃদয়ের পরিচয়ও কিছুটা থাকে। মূল ঘটনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নাট্যকারগণ ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে এই হৃদয়ের দিক দিয়া সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাই বলিয়া সামাজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপার নাটকের বিচারে গৌণ, এ-কথা স্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের নিজের নাটকগুলিতেই যে জাতিবৈরিতা, যে পরাধীনতার বেদনা রূপকের আকারে দেখা দিয়াছে, তাহা কি রাজনৈতিক ব্যাপার নয়? বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনামূলক সমালোচনায় অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর একটি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলেন—

"D. L. Roy offered an interesting contrast to Bankim. A change of temper is noticed in D. L. Roy, although the elements of romance, so common in Bankim still persist. In Bankim we find, no doubt, aggressive nationalism, but he is a genuine admirer of British connections with India, while D. L. Roy is not so. D. L. Roy treated history symbolically and not factually as Bankim did. Instead of taking British Lion D. L. Roy has depicted Mogul Tiger."

অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল যে কথা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার লেখার মধ্যেই স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনা গভীর স্বদেশপ্রেম, ঐকান্তিক দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত। এই দেশানুরাগের নিমিত্ত গিরিশচন্দ্রের সুবিখ্যাত 'সিরাজদ্দৌলা,' 'মিরকাশিম' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মধুসূদন, দীনবন্ধু, ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নাটকের মধ্য দিয়া জাতীয়তা প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং জাতীয়ভাব প্রচার করা যে নাটকের অন্যতম উদ্দেশ্য, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।[২]

৩। সামাজিক নাটক

সাহিত্যমাত্রেরই সমাজনিরপেক্ষ কোন ভিন্ন সত্তা নাই। সেইজন্য দেখা যায় যে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, যে যুগের সাহিত্য সেই যুগের সমাজ-মানসের ছায়া তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইবেই হইবে। দীনবন্ধুর নাটক আমাদের ভাল লাগে কেন? না, দীনবন্ধুর সময়ের বাঙলার সামাজিক জীবন কিরূপ বিব্রত হইয়াছিল তাহারই সুন্দর ও সুসঙ্গত ছবি দীনবন্ধুর নাটকে পাওয়া যায়। 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' পড়িলে তৎকালীন বাঙলাদেশকে সহজে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। এমন কি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক বিষয়বস্তুর সমবায়ে গ্রথিত সাহিত্যেও এই সামাজিক ও রাজনৈতিক যুগধর্মের ছায়াপাত হয়। "As behind every book that is written lies the personality of the man who wrote it, and as behind every national literature lies the character of the race which produced it, so behind the literature of any period lie the combind forces—personal and impersonal—which made the life of the period, as a whole, what it was.—(Hudson)

দুধের স্বাদ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনি বর্তমানকালের সাহিত্যিকগণ কেবলমাত্র ছায়া সৃষ্টি করিয়া সমাজের কাব্যিক রূপটি চিনাইতে আর প্রস্তুত নন। তাই তাঁহারা সামাজিক সমস্যাকে বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিশ্লেষণ

২। ঐতিহাসিক নাটকে মূল ঐতিহাসিক চরিত্র, ঘটনা প্রভৃতিকে অবিকৃত রাখিতে হয়। কোনো প্রামাণ্য তথ্যকেই লঙ্ঘন করা চলে না। তবে ভাবের দিক থেকে ঐতিহাসিক নাটকে সমকালীন ভাবনা প্রকাশের সুযোগ আছে। অনেক সময়েই নাট্যকার সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তা করিতে গিয়াও তাঁকে ঐতিহাসিক তথ্যাদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। এ জন্যই নাটকে প্রতিফলিত বিশিষ্ট যুগের রাজনীতি, সমাজনীতি, পোষাক, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সম্বন্ধে নাট্যকারের সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বীরত্ব, ত্যাগ, দেশপ্রেম, প্রভৃতি মহৎভাব প্রায়ই ঐতিহাসিক নাটকে বর্তমান থাকে। ফলে ঐতিহাসিক নাটকে একপ্রকার গাম্ভীর্য অনুভূত হয়। সংলাপ, সঙ্গীত, আবেগ প্রভৃতির বিচারে ঐতিহাসিক নাটক উঁচু সুরে বাঁধা।

করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। ইহারই ফলে নূতন ধরনের সামাজিক উপন্যাস ও সামাজিক নাটকের জন্ম হইতেছে। আধুনিক সমাজে রাষ্ট্র-সমস্যা, ধর্ম-সমস্যা, যৌন-সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা প্রভৃতি বহু সমস্যা মানুষের জীবনকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছে। এ যুগের নাট্যকারগণ সে সকল সমস্যাকে কয়েকটি চরিত্রের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে সজীব করিয়া তুলিতেছেন।

রামনারায়ণের 'কুলীনকুল সর্বস্ব'ই (১৮৫৪) সম্ভবতঃ প্রথম উল্লেখযোগ্য বাঙলা সামাজিক নাটক। তৎপূর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বাবু নাটক' (১৮৫৩) নামে একখানি সামাজিক নক্সা লিখিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' (১৮৫৬) ও রামনারায়ণের 'নব-নাটক' (১৮৬৬) ঐ যুগের আরও দুইখানি বহু প্রশংসিত সামাজিক নাটক। মাইকেল মধুসূদন কোন সামাজিক নাটক না লিখিলেও, 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) নামে দুইখানি সামাজিক প্রহসন লিখিয়াছেন। কিন্তু সে যুগে সামাজিক নাটক লিখিয়া সবিশেষ নাম করিয়াছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। তাঁহার 'নীল-দর্পণ' (১৮৬০) 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) 'জামাই বারিক' (১৮৭২) সর্বজন প্রশংসিত নাটক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জীবনী আলোচনার কালে বলিয়াছেন,— "তাঁহার প্রণীত নাটক-সকলে যেরূপ চরিত্র-বৈচিত্র্য আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।" গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'মায়াবসান', 'গৃহলক্ষ্মী,' 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভৃতি কয়েকখানি নামকরা সামাজিক নাটক আছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের ভিত্তি ধর্মে—আবেগ-উচ্ছ্বাসে তাহার প্রকাশ। সনাতন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা গিরিশচন্দ্রের নাটকে খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

রামনারায়ণের পূর্বে সামাজিক নাটক লেখার চল এদেশে ছিল না। দেব-দেবীর মহিমাত্মক পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত মঙ্গলগান, পাঁচালী, কীর্তন, কথকতা, যাত্রা শুনিয়া জনগনের নাট্যক্ষুধা পরিতৃপ্ত হইত। এই সকল পালা হইতে তাহারা যেমন ধর্মশিক্ষা করিত, অপরদিকে তেমনি আনন্দলাভও করিত। ক্রমে ইংরেজি নাটকের অনুকরণে যখন বাঙলা নাটক গড়িয়া উঠিল, তখনই বাঙলাদেশে সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে নাটক লেখার প্রচলন হইল। তখনকার দিনের সকল সমস্যাই সামাজিক নাটকে স্থান লাভ করিল,—যেমন, কুলীন ব্রাহ্মণের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বরপণ, শিক্ষিত তরুণদের অতি মাত্রায় মদ্যপান ও অসামাজিক আচরণ, ঘরজামাই রাখিবার প্রথা, বৃদ্ধের তরুণী ভার্যাগ্রহণ, নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার প্রভৃতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের এই সকল সমস্যা এখন আপনা-আপনি পরিবর্তন লাভ করিতেছে। নারীর স্থান এখন কেবলমাত্র অন্তঃপুরের মধ্যেই নির্দিষ্ট নয়,

বাহিরের বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিচরণ করিবার অধিকার এখন তাঁহাদের বর্তাইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ভোটাধিকারের সাহায্যে এখন তাঁহারা রাষ্ট্রীয় পরিচালন সভায় আসন পাইতেছেন, এবং সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতেছেন। বিবাহ এবং পারিবারিক জীবনের আদর্শও বর্তমানে অনেক বদ্‌লাইয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে।

আজ সমাজে যে পরিবর্তন দেখা দিতেছে, তাহার মধ্যে রহিয়াছে সামন্ততন্ত্র এবং বণিকতন্ত্রের জীবনাদর্শের সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থার সংঘর্ষের সমস্যা। এই ছবি বাঙলার কোন কোন নাটকে যে দেখা দিতেছে না, তাহা নয়। তবে বাঙলার রাষ্ট্রীয় জীবনে ইহা কখনও তেমনভাবে স্থায়িত্ব লাভ করে নাই বলিয়া, সাহিত্যেও ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ নাই। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুইপুরুষ' নাটকে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু মূর্তিটি অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের ভগ্ন অবস্থার চিত্রটি কিছু ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাঁহার 'পথের ডাক' নাটকে সমাজ-ব্যবস্থার নূতন দর্শন মার্কসীয় Economic determinism-এর আভাস থাকিলেও, তাহা মূলতঃ বিবেকানন্দের মানব-প্রীতি ও দেশ-হিতৈষণার দৃষ্টি লইয়া লেখা।

৪। কল্পনাশ্রয়ী নাটক

কয়েকখানা নাটক দেখা যায়, যেগুলি সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটক নয়, অথচ সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটকের আধারে রচিত। এইগুলি সাধারণতঃ প্রচলিত গল্প, নীতিমূলক স্বচ্ছন্দ-কল্পিত কাহিনী বা বিদেশী উপাখ্যানের ছায়া অবলম্বনে সংগঠিত। নাটক-হিসাবে ইহারা ব্যর্থতাই প্রকাশ করে। এ-ধরনের নাটক এখন আর বড় রচিত হয় না এবং রচিত হইলেও অভিনয়কালে তেমন সাফল্য লাভ করে না। যেমন, নাম করা যাইতে পারে শিশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনীত 'দেশবন্ধু'। ইহা একটি বিদেশী গ্রন্থের ছায়া-বলম্বনে চিন্তিত এবং গুপ্তযুগের আবহাওয়ায় চিত্রিত। ইহা না হইয়াছে সাহিত্য, না হইয়াছে ঐতিহাসিক আলোকে উজ্জ্বল। কল্পনাশ্রয়ী নাটকের মধ্যে সার্থকনামা হইয়াছে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর'। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী-নাটক' গ্রীকপুরাণের আদর্শে রচিত হইলেও, উহাকে কল্পনাশ্রয়ী-নাটক বলাই ঠিক। কারণ পদ্মাবতী গ্রীক ও নয়, হিন্দুও নয়। গিরিশচন্দ্রের এই শ্রেণীর কয়েকখানা নাটক আছে, যেমন 'আবুহোসেন' 'মুকুলমুঞ্জরা' 'বড়দিনের বখশিস' প্রভৃতি। কেবলমাত্র দর্শকদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য এই সব নৃত্য-গীত-বহুল বা রোমান্টিক স্বচ্ছন্দ-কল্পিত নাটকের জন্ম। ইহাদের পশ্চাতে কোন মহৎ প্রেরণা থাকে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাটকের শ্রেণীবিভাগ

নাটকের শ্রেণীবিভাগ করা খুব সহজ নয়। যেখানে একটি বিভাগ আর একটি বিভাগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, সেখানে শ্রেণীবিভাগ করিলে তাহা সর্বজনগ্রাহ্য হয় না। নাটকের শ্রেণীবিভাগের মধ্যেও এমনি একটা গোলযোগ থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। ধরা যাক্, রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' নাটকখানি—ইহাকে ট্র্যাজিডিও যেমন বলা যায়, আবার সমস্যামূলক-নাটকও তেমন বলা চলে। কেহ কেহ 'তপতী'কে রূপক-নাটকও বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে—বিক্রম দম্ভোন্মত্ত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ বা পাশ্চাত্যের ঐহিকবাদ; আর তপতী ভারতের সনাতন আত্মা বা প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদ। সুতরাং একই নাটক যে বহু শ্রেণীগত হইতে পারে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুপ্রসিদ্ধ ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচের মতে সাহিত্য ও শিল্পের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়। তিনি বলেন যে, শ্রেণী-বিভাগ করিতে গেলে কয়েকটি মূলগত নীতি মানিয়া লইতে হয়। মূলগত নীতি মানিতে গেলে সাহিত্যিক ও শিল্পীর সৃজনী-শক্তিকে অস্বীকার করা হয়। ক্রোচে পৃথক্‌ভাবে প্রত্যেক সৃষ্টির রস-মাধুর্য স্বীকার করেন। তবে এ-কথা ও তিনি বলিয়াছেন যে, ট্র্যাজিডি, কমেডি, রোমান্স, গীতিকবিতা প্রভৃতি পরিচয়াত্মক শব্দ বা নামের দ্বারা ঐ ঐ বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ সমালোচকেরা করিতে পারেন, কিন্তু ঐ সকল বিষয়ের নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা চলিবে না।

> "It is necessary, therefore, to leave writers and speakers free to define the sublime or the comic, the tragic or the humouristic on every occasion, as they please and as may seem suitable to their purpose."
>
> —(Theory of Æsthetic—Benedetto Croce.)

ইংরেজ সমালোচক মৌলটন ট্র্যাজিডি ও কমেডির বিভাগকে ভ্রমাত্মক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে, গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের বিচারে ঐরূপ বিভাগ সম্ভব হইয়াছিল। কারণ, গ্রীক নাট্য-সাহিত্যে দুঃখাত্মক ও সুখাত্মক, কেবলমাত্র এই দুই শ্রেণীর নাটকই ছিল। রোমান্টিক নাটকে আনন্দ ও বেদনার সংমিশ্রণ অথবা খানিকটা বেদনা থাকে বলিয়া গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের আদর্শে ট্র্যাজিডি ও কমেডির সুস্পষ্ট বিভাগ করা সম্ভব নয়। তাঁহার মতে Measure for Measure অথবা Merchant of Venice-কে

কমেডি এবং King Lear অথবা Othello-কে ট্র্যাজিডি বলা চলে না; কারণ ঐ সকল নাটকে আনন্দ ও বেদনা সমানভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মৌলটন শেকসপীয়রের নাট্য-বিচারের কালে শেকস্‌পীয়রের নাটকগুলির 'Passion Drama' ও 'Action Drama'—এই পরিচয়াত্মক নামকরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—

"In action-dramas (Comedies) like Merchant of Venice the unity of the whole play lies in entanglement and solution. In passion-dramas (Tragedies) there is no restoration of happiness after the distraction of the plot, but the emoti n of agitation is relieved only by the emotion of pathos or despair."

(The Ancient Classical Drama—Moulton.)

বর্তমান আলোচনার সুবিধার জন্য নাটককে মোটামুটিভাবে চারভাগে ভাগ করা হইল - (ক) রস-প্রধান (ট্র্যাজিডি, কমেডি, মেলোড্রামা ও ফার্স); (খ) ভাব-প্রধান (ক্লাসিক্যাল, রোমান্টিক ও বাস্তব); (গ) রূপ-প্রধান (গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য); (ঘ) উদ্দেশ্য-প্রধান (সমস্যামূলক-নাটক, রূপক-নাটক ও চরিত-নাটক)।

(ক) রসপ্রধান নাটক

মানুষের হৃদয়রহস্য উদ্ঘাটন করা রস-সাহিত্যের প্রধান কার্য। নর-নারীর বিচিত্র জীবনকে অবলম্বন করিয়া সংসারে যে আনন্দ বা বেদনা ক্ষরিত হয়, সাহিত্য তাহাকেই প্রকাশ করিয়া থাকে। নাট্যসাহিত্যের মধ্যে যে-নাটকের কাহিনী আনন্দময়, উজ্জ্বল এবং প্রদীপ্ত তাহাকে কমেডি বা সুখময় নাটক বলা হয়। যে-নাটকের কাহিনী অত্যন্ত গম্ভীর, করুণ এবং দুঃখপূর্ণ, তাহাকে ট্র্যাজিডি বা দুঃখময় নাটক বলা হয়। আবার ট্র্যাজি-কমেডি বা সুখ-দুঃখাত্মক নাটক বলা হয় তাহাকে, যাহার মধ্যে সুখ এবং দুঃখ একত্রভাবে বর্তমান থাকে। এই শ্রেণীর নাটকে লেখকের লিপি-কুশলতায় পাত্রপাত্রীর আসন্ন বিপদ সহসা মিলন-মাধুর্যে পরিণত হয়। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক নাটক' এই ট্র্যাজি-কমেডির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহাতে "একদিকে যেমন হাস্য-পরিহাস, আর একদিকে তেমনি কারুণ্য-বিলাপ, একদিকে যেমন নীচ ও ক্ষুদ্র চরিত্রের বর্ণনা, অপরদিকে তেমনি সদাশয় মহৎ চরিত্রের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; এক কথায়, উহা ঠিক কমেডিও নহে, ট্র্যাজিডিও নহে।"—(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

ট্র্যাজিডি ও কমেডিকে বাঙলায় বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত নাটক বলা

হয়। কিন্তু এ-নামকরণ ঠিক নয়; কারণ বিয়োগান্ত নাটকমাত্রই ট্র্যাজিডি নয় এবং মিলনান্ত নাটকমাত্রই কমেডি নয়। অবশ্য শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজিডি-গুলির স্বাভাবিক পরিণতি যদিও মৃত্যু, তথাপি আধুনিক যুগে মৃত্যুকে ট্র্যাজিডির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করা হয় না। এই ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব-দিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজিডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্ত-পাতের পর দেখিলেন, হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ। * * কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে, ইহাকেই বলে ট্র্যাজিডি।" আবার 'বিষবৃক্ষ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি 'বিষবৃক্ষ' ট্র্যাজিডি নহে! * * যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজিডি কি আছে! কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজিডি নহে—কুন্দনন্দিনী ত' এ ট্র্যাজিডির উপলক্ষ্য মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল—ইহাই ট্র্যাজিডি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ট্র্যাজিডি বা কমেডির বিচারে সমগ্র কাহিনীটির সুরের বা আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

"Clearly it lies in the effects which each type has upon the mind or, to put it in another way, tragedy and comedy are to be defined according to the impression which the dramatist wished each to have on the assembled audience in the theatre. In vague terms we may say that in tragedy we are deeply moved and our sympathies profoundly stirred, in comedy the impression, because lighter, is less penetrating and sympathies are not freely called into play,"—(The Theory of Drama—Nicoll)

১। ট্র্যাজিডি বা দুঃখময় নাটক

প্রাচীন গ্রীসদেশ ট্র্যাজিডির জন্মস্থান। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে Aristotle তাঁহার Poetics নামক অলংকার-গ্রন্থে এই ট্র্যাজিডির একটা সংজ্ঞা-নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। কালের পরিবর্তন ও ধর্মের প্রভাবে বর্তমানে সেই

সংজ্ঞার কিঞ্চিৎ নড়চড় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় এখনও সম্পূর্ণ ফুরাইয়া যায় নাই। কারণ সমালোচকেরা এখনও বলিয়া থাকেন যে—

"There are places where Aristotle's foundations have given way, places where he leads us wrong; but even where he leads us wrong, he leads us straight."—(Tragedy —Lucus)

Aristotle ট্র্যাজিডির সংজ্ঞা-নির্দেশ করিয়াছেন এইরূপভাবে :—

"Tragedy is a *representation* of an action, which is serious, *complete* in itself, and of a *certain limited length*; it is expressed in *speech made beautiful* in different ways in different parts of the play; it is *acted*, not merely *recited*; and by *exciting pity and fear* it gives a healthy *outlet* to such emotions".—(Poetics)

এই সংজ্ঞাটিতে Aristotle সুসংগতভাবে ট্র্যাজিডি কি, ট্র্যাজিডির স্বরূপ কিরূপ হইবে, ট্র্যাজিডিতে রস-পরিবেশনের রীতি কি প্রকারের, ট্র্যাজিডির উদ্দেশ্য কি—ইত্যাদি অনেক কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ট্র্যাজিডির সমাপ্তি যে দুঃখময় হইবে এমন কথা তিনি এই সংজ্ঞাটিতে বলেন নাই। ট্র্যাজিডির সমাপ্তি দুঃখময় হয়তো হোক, কিন্তু না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। Aristotle তাঁহার গ্রন্থের অন্যত্র ট্র্যাজিডির দুঃখময় সমাপ্তিও স্বীকার করিয়াছেন।

প্রথম পংক্তির representation কথাটির অনুবাদ কেহ কেহ করিয়াছেন imitation. Aristotle 'mimesis' কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই imitation কথাটির অর্থ ঠিক বাস্তবানুকৃতি নয়। Aristotle সংগীতকেও imitative art বলিয়াছেন। শিল্পী মাত্রেই জানেন যে, যে কোন সৃষ্টির মধ্যেই দেহ এবং প্রাণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। একটি গল্প আছে যে, একজন চিত্রকর একজন নাগরিককে তাহার নিজের আঁকা একখানি মাছের ছবি উপহার দিয়াছিল। নাগরিক চিত্রকরকে বলিয়াছিল—"তোমার ভয় হচ্ছে না যে, এই মাছ একদিন বিচারের দিনে জেগে উঠে, তোমার বিরুদ্ধে এই নালিশ জানাবে, তুমি আমার দেহ এঁকেছ, কিন্তু প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে ভুলে গিয়েছ।" সুতরাং Aristotle 'imitation' শব্দটি যে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

Aristotle ট্র্যাজিডিতে action বা গতির কথা বলিয়াছেন তাহা সকলে আজ মানিতে [illegible] প্রসঙ্গে ইতালীয় নাট্যকার Pirandello যদিও

বলিয়াছেন—"Drama is action, sir, action, not confounded philosophy," কিন্তু ইহার বিরুদ্ধবাদী দলও আছে। এই action-কে অস্বীকার করিয়া Maeterlink "Static Drama" এবং Bernard Shaw "Discussion Play" লিখিয়াছেন। Thompson সাহেব রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—"His dramatic work is the vehicle of ideas, rather than the expression of action."

কিন্তু গতি নাই এমন নাটক হইতে পারে না। নাটক যদি সাহিত্য হইয়া ওঠে, তবে তাহার মধ্যে গতি থাকিতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও গতি আছে, তবে সে গতি বস্তুধর্মী নয়, মনোধর্মী। বাহির হইতে তাহাকে তত সহজে চিনিয়া লওয়া যায় না। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের নাটকে গতি নাই বলিয়া প্রচার করেন এবং সেই নিমিত্ত রবীন্দ্রনাথকে নাট্যকার বলিতে সংকোচ বোধ করেন, তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি এক বিশেষ শ্রেণীর নাটক। বর্তমানকালে ইউরোপীয় সাহিত্যেও Naturalistic drama-র পাশেই এক শ্রেণীর Poetical drama-ও চলিতেছে। আধুনিককালে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ…যেমন Yeats, Synge, Masefield, Galsworthy, Drinkwater প্রভৃতি এই শ্রেণীর নাটকের স্রষ্টা! সে দেশের সমালোচকরা এই সব নাট্যকারদের একেবারে নাকচ করিয়া দেন নাই।

Aristotle-এর মতে action 'serious' বা গম্ভীর ভাবোদ্বোধক এবং complete বা সুসংগত হইবে। নাটকের ভাষা যে সুন্দর কাব্যময় হইবে এবং সেই ভাষা যে আবৃত্তি ছাড়াও অভিনয়ের জন্যও বটে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, অতীতের পদ্যাত্মক নাটকগুলি বাদ দিলেও গদ্যাত্মক নাটকের মধ্যে এমন নাটকও দেখা যায়, যাহাদের ভাষা কাব্যময় নয়। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ কোনদিনই কাব্যে কথাবার্তা বলে না। আর Aristotle নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা গ্রীক ট্র্যাজিডি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য নয়। তখনকার দিনে সকল জিনিসই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে দেওয়া হইত না। বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা বিবৃতি দিয়াই করা হইত। নাটকের মধ্যে কতখানি অভিনীত হইবে এবং কতখানি বিবৃত হইবে, তাহার বাঁধাধরা একটা নিয়ম ছিল। এ-ই নিয়মের ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। যে-ঘটনা তিনদিন পূর্বে ঘটিয়াছে বা ত্রিশ ক্রোশ দূরে ঘটিয়াছে, তাহাকেও নাট্যাভিনয়ে স্থান দেওয়া হইত না। এখানে নাটকের ঐক্যনীতি তলে তলে কাজ করিত।

Aristotle-এর সংজ্ঞাটির শেষের দিকে যে কথাটি উখিত হইয়াছে, সেইটি ট্র্যাজিডির পক্ষে আসল কথা। ইহাকেই Aristotle-এর ভাষায় Catharsis

বা Purgation of the emotions বলে। এই কথাটির দ্বারা Aristotle বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ট্র্যাজিডি, দর্শকদের মন হইতে ভাবাবেগের আতিশয্য দূর করিয়া মনকে প্রশমিত করে (its function is to purge away our excess emotions)। ট্র্যাজিডি দেখিয়া হয়তো কাহারও মনে এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, মানুষ পার্থিব দুঃখ দৈন্যের জন্য যে হা-হুতাশ করে, তাহার ন্যায্য কারণ আছে। কিন্তু যখন বাহিরের কোন আঘাতজনিত দুঃখ নাই, তখন মানুষ অভিনয় দেখিয়া স্বেচ্ছায় কেন মনের মধ্যে দুঃখ টানিয়া আনিবে। ইহার উত্তরে Aristotle হয়তো বলিবেন যে, শরীরে কাঁটা ফুটিলে যেমন সূচ দিয়া তাহাকে বাহির করিতে হয়, নচেৎ স্বাস্থ্য নষ্ট হয় ; তেমনি অভিনয় দর্শনজনিত বেদনা, ট্র্যাজিডি মন হইতে দূর করিয়া দিয়া মনের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনে। Aristotle-এর ব্যবহৃত Catharsis বা Purgation শব্দটি চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত। দেহে রক্তাধিক্য হইলে চিকিৎসকগণ যেমন কিছুটা রক্ত বাহির করিয়া দেহকে নিরাময় করেন ট্র্যাজিডিও তেমনি দর্শকদের মন হইতে কৃত্রিম বাসনা কামনার প্রবলতা দূর করিয়া মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনে। ইহা বাসনা-কামনার ময়লা দূর করে না, ইহা মনের বাসনা-কামনাগুলির প্রাচুর্য দূর করিয়া মনকে প্রশমিত করে। সেইজন্য Catharsis-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ ঠিক Purification নয়। বাসনা-কামনাকে একেবারে নষ্ট করাও যেমন চলে না, আবার তাহাদিগকে পুরামাত্রায় ভোগ করাও তেমনি চলে না। সুতরাং ট্র্যাজিডি মনের রুদ্ধ অতিপ্রবল ভাবকে দূর করিয়া দেয়। এই রুদ্ধ ভাবের সহজ নিষ্ক্রমণ না হইলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়াও থাকে। একটি শোকার্তা নারী সম্বন্ধে Tennyson-ও ঠিক এমনি মন্তব্য করিয়াছেন—

"All her maidens watching said,
She must weep or she will die."

মানুষ নিজের গভীর দুঃখের কথা অপরকে না জানাইয়া কিছুতেই স্বস্তি পায় না। সেই নিমিত্তই বোধহয় মাইকেলের "মেঘনাদ-বধে"র সীতা সরমাকে বলিতেছেন—

"বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুনলো সরমে।"

Aristotle ট্র্যাজিডির যে সংজ্ঞা-নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি ট্র্যাজিডির নীতিগত আদর্শের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ট্র্যাজিডি হইতে যে আনন্দ পাওয়াও যাইতে পারে, তাহা তিনি বলেন নাই। এখন প্রশ্ন হইতে

পারে,—যে-নাটকের মধ্যে কেবল বেদনা, কেবল ব্যর্থতা, সে-নাটক লোকে পড়ে কেন, অভিনয় করে কেন বা অভিনয় দেখে কেন? অথবা যে দুঃখ জীবনে সত্য হইয়া দেখা দিলে জীবন দুর্বিষহ হইয়া ওঠে, তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে পাইবার জন্য মানুষের এ প্রয়াস কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পাত্র-পাত্রীর দুঃখে বিগলিত চিত্ত হইয়া যখন দর্শকদের আত্মবিলুপ্তি ঘটে, তখনকার সেই পরম মুহূর্তে দর্শকের মন আত্মদর্শনের গভীর চেতনায় যে রূপের সাক্ষাৎ পায়, তাহাতে সে আনন্দিত হয়। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"দুঃখ অপ্রিয় নয়; সাহিত্যই তার প্রমাণ। যা কিছু আমরা বিশেষ ক'রে অনুভব করি তাতে আমরা বিশেষ ক'রে আপনাকেই পাই। সেই পাওয়াতেই আনন্দ। চারিদিকে আমাদের অনুভবের বিষয়ে যদি কিছু না থাকে, তাহলে সে আমাদের পক্ষে মৃত্যু, কিংবা যদি কেবলমাত্র তাই থাকে যাতে স্বভাবত আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব বা ক্ষীণতা তাহলে মনে অবসাদ আসে, কেননা তাতে ক'রে আমাদের আপনাকে অনুভব করাটা সচেতন হয়ে ওঠে না। দুঃখের অনুভূতি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি চেতিয়ে রাখে, কিন্তু সংসারে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি এবং আঘাত জড়িয়ে থাকে, সেইজন্য আমাদের প্রাণপুরুষ দুঃখের সম্ভাবনায় কুণ্ঠিত হয়। জীবন-যাত্রার আঘাত বা ক্ষতি সাহিত্যে নেই বলেই বিশুদ্ধ অনুভবটুকু ভোগ করতে পারি।"

সুতরাং এ কথা বলা চলে যে "Tragedy is a luxury of sorrow." "প্রবল অনুভূতিমাত্রই আনন্দজনক, কেননা সেই অনুভূতিদ্বারা প্রবলরূপে আমরা আপনাকে জানি।" ট্র্যাজিডির দুঃখানুভূতি আমাদের আপনাকে বিশেষ করিয়া জানার জগৎ, অথচ সে-জগতে কোন ক্ষতি নাই, অবসাদ নাই, দায়িত্ব নাই।

ট্র্যাজিডির বোধের মধ্যে তিনটি উপাদান থাকে—দুঃখবোধ (Suffering) সংঘষ (Struggle) এবং কার্যকারণত্ব (Causality). কেবলমাত্র দুঃখবোধ থাকিলে তাহাতে শোকের উৎপত্তি হয়; কেবলমাত্র সংঘর্ষে বীরত্ব প্রকাশ পায়; আবার কেবলমাত্র কার্যকারণত্বে যুক্তিসিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ট্র্যাজিডির সৃষ্টি হয় এই তিনের সমন্বয়ে। মোটামুটিভাবে ট্র্যাজিডি বলিতে বোঝা যায় "the kind of effect produced by the sight of a losing struggle carried on between a strong but imperfect individuality and the overpowering forces of life." (Woodbridge). ট্র্যাজিডির নায়ক সম্বন্ধে Aristotle বলিয়াছেন,—"He (a tragic hero) falls from a position of lofty eminence ; and the

disaster that wrecks his life may be traced not to deliberate wickedness but to some great error of frailty."

ট্র্যাজিডি দেখিয়া আমাদের মন যে সহানুভূতি ও ভীতিতে (pity and fear) পূর্ণ হয়, তাহার কারণ, দৈবচক্রের নিষ্পেষণে পড়িয়া যখন একটি লোক দুর্দশাগ্রস্ত হইতেছে দেখি, তখন আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। আবার সেই দুর্দশাগ্রস্ত লোকটির সঙ্গে একাত্ম হইয়া যখন তাহার দুঃখ অনুভব করি, তখন আমাদের মনে সহানুভূতির উৎপত্তি হয়। মনে হয়, হয়তো আমাদের এইরূপ অবস্থা একদিন হইতে পারে। নায়ক-নায়িকার ভাগ্য-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ভাগ্য পরিবর্তিত হইতেছে ভাবিয়া তাহার দুঃখকে নিজেদের দুঃখ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। সেই সময় নাট্যকার পাত্র-পাত্রীর দুঃখ, নৈরাশ্য, বেদনা, প্রেম, প্রভৃতি ভাবগুলি কৃত্রিম উপায়ে আমাদের মধ্যে প্রবল করিয়া তুলিয়া আবার প্রশমিত করিয়া আমাদের মনের স্বাভাবিক ভাব আনয়ন করেন। তখন আর কোন গ্লানি, কোন বেদনা মনকে পীড়া দেয় না। একটা প্রবল ঝড়ের পর যেমন পৃথিবী শান্ত হইয়া প্রসন্নভাব ধারণ করে, আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়। কোন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডিতেই জীবনের প্রতি অবহেলা বা বিদ্বেষ নাই। শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডি জীবনের পরাজয় প্রচার করে না, জীবনের পূর্ণতা আনিয়া দেয়।

Aristotle-এর সময় হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ট্র্যাজিডির বিষয়বস্তু-বিন্যাসের ধারা কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল বৈশিষ্ট্যটুকুর বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। একটি মহৎ ব্যক্তির উত্থান এবং পতন শেকসপীয়রের নাটাগুলিতে প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু শেকসপীয়র কালের ঐক্য ও স্থানের ঐক্য মানেন নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাস্যরসাত্মক দৃশ্য-সংযোজন করিয়া শেকসপীয়র দর্শকের মনের গভীর ভাবকে সরল করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। নানাপ্রকার বৈচিত্র্যময় চরিত্রের সংস্থাপন করিয়া শেকসপীয়র নাটকীয় পরিবেশকে বিস্তৃত করিয়াছেন। ইহাতেই ক্লাসিক্যাল নাটকের আদর্শ হইতে তাঁহার নাটক ভিন্ন পথে গিয়াছে। এই সময়ের ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে বলা চলে—"In tragedy which is the noblest form of drama, the poet imitates the action of the great."

অষ্টাদশ শতক হইতে গার্হস্থ্যবর্গী Domestic tragedy-র সূত্রপাত হয়। মানুষের জীবনের শান্ত অথচ তীব্র ব্যথাবিধুর শুদ্ধ মাধুর্য যে, ধনী-দরিদ্র উভয়ের হৃদয়-রাজ্যের সামগ্রী হইতে পারে, তাহাই এ যুগের নাট্যকারেরা প্রদর্শন করেন। তাই ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে Beaumarchais-এর ভাষায় পাই—

"The genuine heart-interest, the true relationship, is always between man and man, and not between man and

king. And thus, instead of exalted rank of the tragic characters adding to my interest on the contrary it diminishes it."

ইহা শুধু ট্র্যাজিডি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহা নহে, কমেডি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এখন আর 'ধীরোদাত্ত, সুদর্শন, প্রতাপশালী' ব্যক্তির জীবনের তীব্র-মধুর পরিণতিতে নাটক রচনা করিলে চলে না। যে সকল চরিত্র তাহাদিগের কর্মাবলীর দ্বারা সহসা দর্শকের মনকে প্রদীপ্ত ও আনন্দমুখর করিয়া তোলে, সেই সকল চরিত্রই ট্র্যাজিডি বা কমেডির প্রধান পাত্র-পাত্রী হয়।

ট্র্যাজিডি ও কমেডির মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্বের লীলা সর্বদা লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন গ্রীক-নাটকের সঙ্গে এলিজাবেথীয় যুগের নাটকাবলী তুলনা করিলেই এই অন্তর্দ্বন্দ্বের বিকাশ সহজেই ধরা পড়ে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের লীলা আধুনিক নাটকে আরও সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। মানব-জীবনের আকস্মিক আবর্তে অন্তঃপ্রকৃতির এই বৈচিত্র্য ইব্‌সেন ও মেটারলিঙ্কের নাটকে বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ইব্‌সেন ও মেটারলিঙ্কের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের ধারা একটু ভিন্ন রকমের। ইব্‌সেন অপেক্ষা মেটারলিঙ্ক আরও গভীর, আরও আধ্যাত্মিক। মেটারলিঙ্কের নিগূঢ় নাটকীয় রসসৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় রসতত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙলাতে অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক যে কয়েকখানি সুপরিচিত ট্র্যাজিডি আছে, সে-গুলি সবই ইংরেজি আদর্শে রচিত। 'কৃষ্ণকুমারী-নাটক', 'নীলদর্পণ', 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'জনা', 'সাজাহান', 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটকগুলি ট্র্যাজিডির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। কিন্তু এই সকল নাটকের মধ্যে অধিকাংশই Tragic না হইয়া হইয়াছে Pathetic. ট্র্যাজিডির সে আনন্দময় প্রোজ্জ্বলতা এই সব নাটকে নাই। তাহার পরিবর্তে আছে করুণ রসের প্রাচুর্য। 'কৃষ্ণকুমারী'ই বাঙলা ভাষায় সম্ভবতঃ প্রথম দুঃখময় নাটক। তৎপূর্বে 'কীর্তিবিলাস নাটক' (১৮৫২)—(যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত) ও 'বিধবা-বিবাহ-নাটক' (১৮৫৬)—(উমেশচন্দ্র মিত্র) এই দুইখানি নাটকের নাম পাওয়া গেলেও, নাটক হিসাবে সে-গুলির তেমন মূল্য নাই। সংস্কৃত আলংকারিকরা দুঃখময় নাটক লেখার বিধান দেন নাই, অথচ সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটকের সমালোচনা কালে দুঃখময় নাটক সম্বন্ধে কোন আপত্তিই তোলেন নাই; বরং সমর্থনই করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

"সকল সংস্কৃত নাটকেরই উপসংহার শুভান্ত হয়—অশুভান্ত বর্ণন সংস্কৃত আলংকারিকদের মতে নিষিদ্ধ। কিন্তু ইংরেজি-কাব্যে অশুভান্ত ঘটনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেগুলিই আবার তজ্জাতীয় কাব্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট। ওরূপ বর্ণনাপাঠ পূর্বে আমাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু

বোধহয় কালভেদে বা অবস্থাভেদে রুচিভেদ হইয়া থাকে—সুতরাং আমাদেরও রুচি কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে—এজন্য এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, করুণরসের উদ্দীপন করাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে অশুভান্ত ঘটনার বর্ণনা দ্বারা সে রস যেরূপ উদ্দীপ্ত হয়—অন্য কোনরূপে সেইরূপ হইতে পারে না। আরও আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের আদিকাব্য রামায়ণ, সীতার পাতাল প্রবেশরূপ অশুভান্ত ঘটনাতেই পর্যবসিত। অথচ তাহা কোন আলংকারিকেই অযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং 'কৃষ্ণকুমারী-নাটক' অশুভান্ত বলিয়া আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি বোধ হইল না।"

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ দুঃখময় নাটক রচনার বিধান দেন নাই বটে, তবে করুণরসাত্মক রচনা যে মানবচিত্তে সুখানুভূতির উদ্রেক করিতে পারে, সে কথা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণে আছে—

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎপরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥'

অর্থাৎ করুণা প্রভৃতি রসে যে মনে অপূর্ব সুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার একমাত্র প্রমাণ হৃদয়বান্ লোকের নিজের চিত্তের অনুভূতি। সংস্কৃত সাহিত্যে করুণরসপ্রধান কাব্যও যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার উদাহরণ হইতেছে 'উত্তররাম চরিত' ও 'রঘুবংশ'। করুণ রসের ব্যাখ্যায় শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন,—

"কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনি পাঠকের মনে রসের উদয় হয়, যার নাম 'করুণ রস'। এই করুণ রস শোকের 'ইমোশন' নয়। শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্যে মনে যে করুণ রসের সঞ্চার হয়, চোখে জল আনলেও, মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করে। এ কথা কাব্যের আস্বাদ যার আছে, সেই জানে। যদিও একে প্রমাণ ক'রে দেখান কঠিন।"—(কাব্য-জিজ্ঞাসা)

অতএব করুণ রস যে কেবল দুঃখেরই কারণ নয়, তাহা সংস্কৃত আলংকারিকদের আলোচনা হইতেই জানা গেল। করুণ রস কেবলমাত্র দুঃখের কারণ হইলে, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতি দুঃখের কাব্য কেহই পড়িত না। ট্র্যাজিডির যে গূঢ় অর্থ তাহার সহিত এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের মতের কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না।

২। কমেডি বা সুখময় নাটক

যাহা সুখময় ও শুভান্ত তাহাই কমেডি। একটি প্রসন্ন অথচ প্রদীপ্ত বিষয় লইয়া কমেডির কাহিনী রচনা করা হয়। সমাজের অতি সাধারণ লোকেরা কমেডির মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। তাহাদিগের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব তরঙ্গ-প্রবাহের ন্যায় দ্রুততালে একটা পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। একদিকে বহির্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, অপরদিকে তাহাদিগের জীবনের সুখ, দুঃখ ও বেদনা—উভয়প্রকার আলোড়নে নাটকীয় ঘটনা জটিলতর হইয়া ওঠে। সে জটিলতা নাটকের সমাপ্তিতে মধুর ও আনন্দময় হইয়া দেখা দেয়। সুতরাং কমেডি সম্বন্ধে সহজেই এই কথা বলা চলে যে—"In Comedy the poet imitates the action of the people in middle or low condition. The ending of the Comedy is happy."

কিন্তু ক্লাসিক্যাল্ কমেডি রচনার আর একটি সর্ত ছিল। ক্লাসিক্যাল্ কমেডির আরম্ভ হইত দুঃখময় ঘটনা দিয়া এবং শেষ হইত সুখময় ঘটনায়। Terrence-এর নাটকে এইরূপ আদর্শ লক্ষ্য করা যায়। দান্তে তাঁহার মহাকাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন নরকের বীভৎস দৃশ্য দিয়া এবং সমাপ্ত করিয়াছিলেন একটি আনন্দময় পরিণতিতে। এইজন্যই বোধহয় তাঁহার কাব্যের নামও দিয়াছিলেন—Divine Comedy. কিন্তু এই নিয়ম এখনকার দিনে আর চলে না।

কমেডি জীবনের গভীরতম প্রশ্নের জবাব দেয় না, জীবনের সহজ ও লঘু দিকটি উজ্জ্বল করিয়া তোলে। ট্র্যাজিডিতে মানুষের জীবনের ব্যর্থতার মধ্যে একটা পরম শান্তি, একটা প্রকাণ্ড সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু ট্র্যাজিডির ন্যায় কমেডিতেও অসংগতির আঘাত লক্ষ্য করা যায়। এ অসংগতি বা বিরোধ ট্র্যাজিডিতে যেমন প্রবল, কমেডিতে অবশ্য ততটা নয়। কমেডির দুঃখ হাস্যরসে সমুজ্জ্বল, ট্র্যাজিডির দুঃখ অশ্রুতে রূপান্তরিত—"যেমন, বরফের উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিক্‌মিক করিতে থাকে এবং রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে।" সুতরাং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে যে,—

> "অসংগতি কমেডিরও বিষয়, অসংগতি ট্র্যাজিডিরও বিষয়। কমেডিতে ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পায়। ফলস্টাফ উইণ্ডসরবাসিনী রঙ্গিণীর প্রেম-লালসায় বিশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুর্গতির একশেষ লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন; রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করিয়া, বনবাস-প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্য সুখের চরম-শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিতে বাধ্য হইলেন।

উভয়স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে অসংগতি দুই শ্রেণীর আছে; একটা হাস্যজনক, আর একটা দুঃখজনক। অসংগতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময়ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইয়া থাকে।"—(পঞ্চভূত)

এখন বলা যাইতে পারে যে, ট্র্যাজিডি ও কমেডির পার্থক্য শ্রেণীগত নয়, মাত্রাগত। একই অসংগতির উঁচু ও নীচু সুরের উপর ট্র্যাজিডি ও কমেডি গড়িয়া ওঠে। ট্র্যাজিডির ন্যায় কমেডি কোন গভীর বিষয়ের সমাধান করে না বটে, কিন্তু দর্শকের মনকে সর্বপ্রকার তুচ্ছতা ও মলিনতার ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরে।

সমালোচকগণ কমেডিকে নানাভাবে ভাগ করিয়াছেন। (১) যে নাটকের মধ্যে কবিত্ব ও কল্পনার প্রাধান্য থাকে তাহাকে Romantic Comedy বলে। (২) সামাজিক রীতিনীতির বিদ্রূপাত্মক অবতারণাকে বলে Comedy of Manners (৩) Comedy of Intrigue-এর পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কেবল চক্রান্তই দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) যে নাটকে মানবজীবনের দোষ-গুণ বিচিত্র চরিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তাহাকে বলে Comedy of Characters. (৫) নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামির দ্বারা যে নাটকে হাস্যরস-সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় তাহাকে Low Comedy বলে।

বাঙলা ভাষায় অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক শুভান্ত কমেডির অভাব নাই। বাংলা সমাজের নানা দুঃখময় সমস্যা (যেমন, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, ঘরজামাই রাখার রীতি, বৃদ্ধের তরুণী ভার্যাগ্রহণ, মদ্যপানের আধিক্য, জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি, দলাদলি প্রভৃতি) নানা ঘটনা ও চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া কমেডির মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'নবীন-তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা', 'খাস-দখল', 'মানময়ী গার্লস স্কুল' 'মৌচাকে ঢিল' প্রভৃতি কমেডির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

৩। মেলোড্রামা বা আবেগময় নাটক

ট্র্যাজিডি হইতে মেলোড্রামা বা অতি হৃদয়াবেগপ্রধান নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসদেশে গীতিপ্রধান নাটককেই মেলোড্রামা বলিত। অষ্টাদশ শতক হইতে করুণরসাত্মক কাহিনীতে ভাবাতিশয্য বা অতি নাটকীয় ভাব প্রকাশিত হইতে থাকে। সেই অতি নাটকীয় নাট্য-সাহিত্যকে মেলোড্রামা নাম দেওয়া হয়। মেলোড্রামার মধ্যে অস্বাভাবিক ঘটনাবিন্যাসের দ্বারা একটা আকস্মিক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। হৃদয়াবেগের আতিশয্যবশতঃ কাহিনীটি হয় চাঞ্চল্যকর ও চিত্তহারী এবং চরিত্রগুলিও তেমন সুদৃঢ় হয় না। সংগীত, জাঁকজমক এবং বিচিত্রতায় ইহার বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যে অতিভাব-প্রধান নাটকেরই আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। ভাবপ্রবণ বাঙালী দর্শকদের মনে ইহার প্রভাব খুব কার্যকরী হয়। আর বাঙালী নাট্যকাররাও এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যটি এড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' 'প্রফুল্ল' মেলোড্রামার চূড়ান্ত উদাহরণ। দ্বিজেন্দ্রলাল মূলতঃ রোমান্টিক ভাবাপন্ন হইলেও, তাঁহার 'সাজাহান' নাটকের শেষে সাজাহান ও আওরংজেবের মিলনঘটিত ব্যাপারটি মেলোড্রামার উপাদান ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ভাবাতিশয্যের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। 'বিসর্জন' নাটকের শেষের দিকে কবির মতের কাছে নাটকীয় চরিত্রের আত্মসমর্পণ, মেলোড্রামারই সামিল। জয়সিংহের মৃত্যুর পর রঘুপতির আর্তনাদ বা প্রতিমা বিসর্জন মোটেই নাটকোচিত নয়।

৪। ফার্স বা প্রহসন

মেলোড্রামা ও ফার্স—ট্র্যাজিডি ও কমেডির সুলভ-সংস্করণ। ট্র্যাজিডি হইতে যেমন মেলোড্রামার জন্ম, তেমনি কমেডি হইতে ফার্সের উৎপত্তি। ট্র্যাজিডি ও কমেডির ন্যায় ইহাদের মূল্য তেমন নয়। ট্র্যাজিডি ও কমেডির গঠনের মধ্যে যে অন্তর্দৃষ্টি ও সংযম থাকে, ইহাদের মধ্যে তাহা থাকে না। সেইজন্য সাহিত্য-হিসাবে ইহাদের মূল্য ও মর্যাদা দুইই কম।

সপ্তদশ শতকের পর হইতে ইংরেজি কমেডিতে নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামি প্রবর্তিত হয় এবং তিন অঙ্কের নাটক লেখা শুরু হয়। এই তিন অঙ্কের নাটকগুলি পাঁচ অঙ্কের পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি হইতে মর্যাদায় হীন হইয়া পড়ে। এইগুলি সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করিয়া ফার্স আখ্যা পায়। এই ফার্সের কাহিনী ও চরিত্রগুলি পূর্ণ নয়। অসম্ভব ঘটনা ও অতিরঞ্জিত হাস্য-কৌতুকে ইহা আগাগোড়া গ্রথিত। অনেক সময় পাত্র-পাত্রীদের আলাপন শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়া যায়।

বর্তমানকালে প্রহসন বলিতে লঘুকল্পনাময় যে কোন হাস্য-রসাশ্রিত ক্ষুদ্র নাটিকাকে বুঝায়। এগুলির মধ্যে অতিরঞ্জিত হাস্যকৌতুক কিছুটা থাকিলেও এগুলি ঠিক নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামি নয়। এইসব নাটকে সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও প্রগতি সম্বন্ধে অনেক কিছু চিন্তা করিবার বিষয় থাকে। কিছু কিছু বক্রোক্তিও থাকে। ব্যক্তিগত বাস্তব চরিত্র অপেক্ষা প্রতীক্ চরিত্রের দিকে অধিক ঝোঁক দেওয়া হয় বলিয়া এইসব নাটকে বাড়াবাড়ির ভাব খানিকটা লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর 'সানিভিলা' নাটকের সমালোচনা করিলে বলিয়াছেন,—

"এই ধরনের নাটকে একটু বাস্তবের উপরে রঙ্ চড়ানো অপরিহার্য হইয়া ওঠে। কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হয় না, নীতিবাগীশের চোখে,

ধর্মধ্বজীর চোখে, মানুষের মিথ্যা, জাল জুয়াচুরিকে না দেখিলে, ব্যঙ্গ রসিকের চোখে দেখিলে, তাহাতে একটু অসামঞ্জস্যভাব, একটু আতিশয্য আসিবেই।" (আনন্দবাজার পত্রিকা)

কিন্তু এই আতিশয্য প্রদর্শন করিতে গিয়া নাট্যকারের বিপদ আসে কম নয়। দর্শকদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেদের স্বরূপ দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হন এবং তাহার জন্য নাট্যকারকে যথোচিত শাস্তি দিবারও চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার এমনও দেখা যায় যে, নাট্যকার হয়তো স্বাধীনভাবে চরিত্র-সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু সেই চরিত্রের সঙ্গে অমুক লোকের মিল আছে বলিয়া নাট্যকারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করা হয়। মধুসূদন যখন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' লেখেন তখন তরুণদল ও প্রবীনদলের উপর বিদ্রূপ করা হইয়াছে বলিয়া কয়েকজন লোক রাজাদের অনুরোধ করিয়া সেই দুইখানি নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আবার দীনবন্ধু যখন 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদের চরিত্র সৃষ্টি করেন, তখন তাহা মাইকেলের প্রতিরূপ বলিয়া একদল লোক সোরগোল সৃষ্টি করেন। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সানিভিলা'-র সমালোচনায় এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই নাটকের 'কমরেড্'টির চরিত্রের কথা বলিতে পারা যায়। এই চরিত্রটির দরুন এই নাটক দর্শনে কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন শুনিতেছি। নাট্যকার কৈফিয়তে আমাদের বলিয়াছেন যে পুলিস এবং সত্যকার 'কমরেড্'—এই উভয়ের সম্মিলিত কাটাকুটির ফলে নাটকের 'কমরেড্'-টিকে পলিটিক্স ছাড়িয়া কেবল প্রেমের আসরেই নামাইতে হইয়াছে। হয়ত 'কমরেড্'-টির মূল রূপ দেখিতে পাইলে আমরা অরও খুশী হইতাম—কিন্তু এটা যে সর্বত্রই Totalitarianism-এর যুগ তাহা আমরা ভুলিয়া যাই।"

হাস্যরসের বোধ সকল কালে একরূপ থাকে না। ইহা স্থান, কাল, পাত্র ও সমাজভেদে বিভিন্ন প্রকারের হয়। বিশেষ করিয়া গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই হাস্যরসের বোধ অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার মূলে কতকগুলি ধারণা আছে, যাহা সামাজিক বোধের সহিত সংযুক্ত। এক সময় এমন কতকগুলি হাবভাব বা কথাবার্তা প্রচলিত ছিল, যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া লোকে হাসিত; কিন্তু এখন ঐরূপ কথাবার্তা বা হাবভাব দেখিয়া শুনিয়া কেহ হাসাতো দূরের কথা বরং অনেকের কাছে উহা অসভ্যতার পরিচায়ক। গত যুগে রচিত যে হাস্যরসাত্মক রচনা সে-যুগের লোককে বিপুল আনন্দ দিত, এ-যুগে তাহা অচল হইয়া পড়িতেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সে-গুলি নিছক ভাঁড়ামি বলিয়া মনে হয়।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা হাস্যরসপ্রধান একাঙ্কিকা নাটককে 'প্রহসন'

বলিতেন। (বাঙলাতেও কয়েকখানা উৎকৃষ্ট প্রহসন আছে। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রূপেয়া' 'বাজারের লড়াই', গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার' 'সভ্যতার পাণ্ডা' 'সপ্তমীতে বিসর্জন' 'বড়দিনের বকশিস্', দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম', অমৃতলালের 'বিবাহ-বিভ্রাট' 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' 'হাস্য-কৌতুক' প্রভৃতি অসংখ্য প্রহসনের মধ্যে কয়েকটি উদাহরণমাত্র। আবার এই প্রহসনগুলির মধ্যে কয়েকখানা তীব্র বিদ্রূপাত্মক রচনা বা ব্যঙ্গনাট্য (Satire) দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন গিরিশচন্দ্রের 'ভোটমঙ্গল' অমৃতলালের 'বাবু', 'দ্বন্দ্বে মাতনম্' রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙ্গ কৌতুক' দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি অবতার' 'ত্র্যহস্পর্শ' 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি।

(খ) ভাব প্রধান নাটক

রসের দিক দিয়া যেমন নাটকের শ্রেণীবিভাগ করা চলে, তেমনি কয়েকটি লক্ষ্য বা আদর্শের দিক দিয়াও নাটকের বিভাগ করা যায়। এই ভাবাদর্শের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নাটককে তিন শ্রেণীতে ফেলা হয়—যথা, ক্লাসিক, রোমান্টিক ও বস্তুতান্ত্রিক। সাধারণতঃ আমাদের পৌরাণিক নাটকগুলি ক্লাসিক, ঐতিহাসিক নাটকগুলি রোমান্টিক এবং সামাজিক নাটকগুলি বস্তুতান্ত্রিক।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এরূপ বিভাগ সমীচীন নয়। কেবলমাত্র আলোচনার সুবিধার জন্য সমালোচকরা এরূপ বিভাগ করিয়া থাকেন। একই সৃষ্টির মধ্যে ক্লাসিক, রোমান্টিক ও বস্তুতান্ত্রিক—এই ত্রিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়; সুতরাং একটি বিশেষ নামে কোন সাহিত্য-সৃষ্টির নামকরণ করিলে অন্য দুইটি সম্বন্ধে অবিচার করা হয়। বস্তুকে অবলম্বন করিয়া মানব-মনের দুইটি চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গি—কল্পনা ও বুদ্ধি সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের মধ্যে প্রকটিত হয়। কল্পনা আমাদের জীবনকে উজ্জীবিত করিয়া তোলে, বুদ্ধি আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে সংহত ও সংযত করিয়া রাখে। একটির অভাবে অপরটি পঙ্গু হইয়া পড়ে। যাহা কিছু প্রাচীন তাহাকেই ক্লাসিক বলা ঠিক নয়। প্রত্যেক যুগেই সাহিত্যের একটা বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। কখনও 'রীতির বেড়া' ভাঙ্গিয়া 'ব্যক্তিগত খুসির দৌড়' বড় হইয়া ওঠে, আবার কখনও 'আচারভাঙ্গা' ব্যক্তিগত মর্জিকে দাবাইয়া রাখিয়া 'নিয়ম-সংযম' আধিপত্য বিস্তার করে। তখনকার কালে সেই প্রবলপক্ষের আনুগত্য সকলেই স্বীকার করিয়া লয়। তবে কোনটিকে অস্বীকার করিয়া নয়। এমনি করিয়া সাহিত্যে কখনও রোমান্টিক ভাব, কখনও ক্লাসিক ভাব প্রবলতা লাভ করিয়া থাকে। বর্তমানে আধুনিকতার নামে এই ক্লাসিক ভাবের সচেষ্ট প্রয়োগ চলিতেছে।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র ক্লাসিক কল্পনা সাহিত্যকে প্রাণহীন ও রসহীন করিয়া তোলে; আবার রোমান্টিক-কল্পনাকে অস্বীকার করিলে কোন সাহিত্যই আর্টের পর্যায়ভুক্ত হয় না।

১। ক্লাসিক নাটক

(ইংরাজিতে গ্রীক ও রোমীয় আদর্শে রচিত সাহিত্যকে ক্লাসিক সাহিত্য বলে। শুদ্ধতা, সামঞ্জস্য, মননশীলতা, সংযম প্রভৃতি গুণের প্রচার করা ক্লাসিক সাহিত্যের উদ্দেশ্য। ইংরেজি সাহিত্যে এলিজাবেথীয় যুগের প্রথম দিকে 'রেনেসাঁসের' প্রভাবে ক্লাসিক আদর্শের আংশিক পুনরুত্থান হয়। তখন ইহার নাম দেওয়া হয়—নব ক্লাসিক (Neo-classic)। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ড্রাইডেন প্রভৃতি নাট্যকারেরা যখন এই আদর্শে নাটক লিখিলেন, তখন সে যুগের নাম দেওয়া হইল—Age of Reason বা Pseudo-classical Age. প্রাচীনতার মোহে উদ্বুদ্ধ হইয়া তৎকালীন লেখকগণ যাহা কিছু রচনা করিলেন তাহাতে ঐ ক্লাসিক আদর্শ দেখা গেল।) অল্পদিন পরে ঐ আদর্শ ইংলণ্ডে প্রায় পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু জার্মানী ও ফ্রান্সে গিয়া আধিপত্য বিস্তার করিল। এলিজাবেথীয় যুগ হইতে ইংলণ্ডে রোমান্টিক আদর্শের সূত্রপাত হইল। এই আদর্শে নাটক রচনা করিয়া শেকস্‌পীয়র সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে খ্যাতি লাভ করিলেন।

(ক্লাসিক নাটকে মানবজীবনের সংহত ও সংযত রূপ প্রতিফলিত হইল। ইহাতে স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য যতদূর সম্ভব মানা হইত। ক্লাসিক নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, নিয়তির নিষ্ঠুর আদেশে পাত্র-পাত্রীদের ভাগ্য পরিবর্তিত হইত। বাঙলার পৌরাণিক নাটকগুলি বাদ দিলে মধুসূদনের দুইখানি নাটকে এই গ্রীক অদৃষ্টবাদের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার 'পদ্মাবতী নাটকে' পদ্মাবতীর অদৃষ্টবশে দেবতা এবং সংসার তাহার প্রতিকূল। পদ্মাবতীর এই অদৃষ্ট কবি আবার পৌরাণিক আদর্শে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অভিশপ্ত পদ্মাবতী নিজ কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্যই নাকি ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে কবি গ্রীক অদৃষ্টবাদের সহিত ভারতীয় অদৃষ্টবাদ মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।) গ্রীকদিকের একটা বৈশিষ্ট্য যেমন 'অদৃষ্ট' তেমনি খৃষ্টানদিগের একটি আদর্শ 'আত্মোৎসর্গ'। 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' মধুসূদন গ্রীক এবং খ্রীষ্টান আদর্শের অপূর্ব সংমিশ্রন দেখাইয়াছেন।

ক্লাসিক সাহিত্য-স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গি সীমাবদ্ধ। বংশপরম্পরায় যে অভিজ্ঞতা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহাকেই তিনি সম্মান দিয়া থাকেন। সাম্প্রতিক কোন অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি কোন স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করেন না। বাস্তব জগতের তথ্যই তাঁহার একমাত্র উপজীব্য বিষয়।

তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির পক্ষে তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ যতটুকু বিষয়বস্তু তাঁহার প্রয়োজন, ততটুকু তিনি বস্তুবাদী। সেইটুকুর মধ্যে তিনি কোন অংশ পরিত্যাগ করেন না বা সমতাবিধানের চেষ্টা করেন না। তাঁহার হাস্যরস সৃষ্টির মধ্যে আঘাত বা সহানুভূতির আবেগ (humour) নাই, কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্নতা (wit) আছে। ট্র্যাজিডি সৃষ্টিতে তিনি ঘটনাগত অংশটুকু বিশ্লেষণ করেন, হৃদয়গত মাহাত্ম্য স্বীকার করেন না। এই নিয়ম ও নিষ্ঠার প্রতি যে শ্রদ্ধা তাহা তিনি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে সঞ্চয় করিয়া থাকেন, সে অভিজ্ঞতা আসে বহুদিনকার সঞ্চিত জাতীয় চিন্তা হইতে। এই ঐতিহ্যকে স্বীকার করাতেই তাঁহার আনন্দ। কয়েকটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লওয়াতে এই ঐতিহ্যের বোধ তাঁহার মধ্যে আসে এবং তখন তাঁহার রচনা সাহিত্য পদবাচ্য হয়। যে দৃষ্টিভঙ্গিতে আনন্দের উৎপত্তি হয় তাহাই ক্লাসিক আদর্শের ভিত্তি। রোমান্টিক আদর্শ ক্লাসিক আদর্শকে অনুসন্ধান করিয়া থাকে। আবার একথাও ঠিক যে প্রত্যেক রোমান্টিক আদর্শ পূর্বের ক্লাসিক আদর্শের প্রতিক্রিয়া।

২। রোমান্টিক নাটক

রোমান্টিকদের ধর্ম হইতেছে চিত্তমুক্তি। কোন বন্ধন, কোন শাসন তাঁহারা মানেন না। রোমান্টিকদের মনে থাকে অফুরন্ত বিস্ময়বোধ। সেই বিস্ময়বোধের ফলে তাঁহারা এই বাস্তবভূমিকে রঙ্গিন চশমা দিয়া জানিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদিগের চোখে আকাশের বিস্তার ও পৃথিবীর সরসতা একত্র ধরা পড়ে। বাস্তবকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াই রোমান্টিকদের লক্ষ্য। নব ক্লাসিক নাটকে আদর্শবাদকে বড় স্থান দেওয়া হয়, কিন্তু রোমান্টিক নাটকে আদর্শের সহিত বাস্তব মিশ্রিত হয়। রোমান্টিক নাটকগুলির বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় ঐতিহাসিক রাজকাহিনী, রূপকথা অথবা অভিজাত সম্প্রদায়ের নর-নারীর জীবনযাত্রা হইতে। সম্পদশালী ধনিক এবং স্বার্থান্বেষী বণিকের জীবন-সংগ্রাম এবং দুঃখ-দুর্দশার করুণ কাহিনী রোমান্টিক নাটকে চিত্রিত হয়। কিন্তু উহাতে স্থান ও কালের ঐক্য সর্বত্র মানা হয় না। শেক্‌সপীয়রের নাটকগুলিতে ঐ স্থান-কালের সংগতি নাই।

রোমান্টিক-কল্পনার দিব্যানুভূতি হৃদয়প্রসূত, মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। সেইজন্য রোমান্টিকের চিন্তার মধ্যে একটা আতিশয্য থাকে। গতানুগতিক আচার ও বিশ্বাস যখন শিথিল হইয়া পড়ে, তখনই রোমান্টিক আদর্শের প্রয়োজন হয়। রোমান্টিক আদর্শ একান্ত ভাবে ব্যক্তিনিষ্ঠ।[১]

১। এই কারণে রোমান্টিক নাটক আকৃতি ও প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যধর্মী। ক্লাসিক রীতির বাঁধাধরা নিয়ম না মানিয়া ভাবে, রসে, ঘটনায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিবার প্রয়াসই রোমান্টিক নাটকের বিশেষত্ব। করুণরসের মধ্যে হাস্যরস, অসাধারণ চরিত্রের পাশে সাধারণ চরিত্র, বাগ্মীতার সঙ্গে সূক্ষ্ম কবিত্বের ব্যঞ্জনা রোমান্টিক নাটকে নূতন সৌন্দর্য সৃষ্টি করে

একদল জড়বাদী সমালোচক বর্তমানে রোমান্টিক আদর্শের কোন মূল্য নাই বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদিগের মতে, রোমান্টিক সাহিত্যে কল্পনা ও কবিত্বের প্রাচুর্য থাকায়, মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রতিফলিত হয় না; সুতরাং উহা মূল্যহীন। যাঁহারা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক জড়বাদকে সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে এই কথা বলা চলে যে, বৈজ্ঞানিক জড়বাদও মানুষের ইচ্ছার ক্রমোন্নতিকে বর্জন করিয়া চলে না। যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, যাহা কিছু নূতনভাবে মূর্তি পরিগ্রহ করে, তাহাই রোমান্টিক চিন্তাপ্রসূত বলিলে অন্যায় হয় না। এই রোমান্টিক চিন্তা শিল্পীর মনে সৃষ্টির আবেগে বিকম্পিত না হইলে কোন প্রকার রূপ-কল্পনাই সম্ভব নয়। আর্টের ভিতর দিয়া আত্মা মানুষের জীবনের মহাসত্যকে পাইয়া থাকে। শ্রেষ্ঠত্ব, সদাশয়তা প্রভৃতি অনেক গুণ আছে প্রকৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না, আত্মাই তাহার কামনা করে। রোমান্টিকরা এই মুক্ত আত্মার সাহায্যে প্রকৃতির বন্ধন কাটাইয়া এক স্বপ্ন-রাজ্যের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। জীবনের পূর্ণতা ও মাহাত্ম্যের দিক দিয়া তাহা নিরর্থক নয়। রোমান্সের মনোভাব চিরস্থায়ী। যতদিন পৃথিবীতে জীবনাবেগ থাকিবে, যতদিন পৃথিবীতে নর-নারীর মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকিবে, ততদিন রোমান্সও থাকিবে। সুতরাং সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতি লেখকদের মাঝে মাঝে অধিক আকর্ষণ দেখা গেলেও, রোমান্সের মৃত্যু নাই।

(রোমান্টিক নাটকের অনেকগুলি শ্রেণী-বিভাগ আছে। কতকগুলিতে বহির্ঘটনামূলক জীবনাবেগ, দুঃসাহসিক প্রেম মুখ্যভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর নাটককে The play of romantic adventure বলে। 'রীতিমত নাটক', 'তটিনীর বিচার' এই শ্রেণীর নাটক। কতকগুলি নাটকে হাল্কা অথবা গম্ভীর ভাবাত্মক বিষয় লইয়া কোন আদর্শ বা প্রেমের শক্তি প্রতিপন্ন করা হয়। এগুলির ইংরেজী নাম The play of sentiment. দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' 'চিরকুমার সভা' এই শ্রেণীর নাটক। আর কতকগুলি নাটক আছে যেগুলির উপকরণ সংগ্রহ করা হয় ছড়া, লোক-গীতি ও পুরাণ কাহিনী হইতে—The play based upon legend. 'সীতা', 'চাঁদসদাগর', 'নর-নারায়ণ', 'মহুয়া', 'মলুয়া' প্রভৃতি বহু নাটক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। Romantic tragedy-র দুইটি ভাগ দেখা যায়—এক শ্রেণীতে থাকে কামনা-বাসনার আবেগ (passion) ও অপর শ্রেণীতে থাকে কল্পনা-কবিত্বের প্রাচুর্য (imagination)। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', 'অশ্রুমতী', 'প্রফুল্ল', 'রিজিয়া' প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত : দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে 'বিসর্জন', 'তপতী'। রূপকের সাহায্যে আর এক শ্রেণীর নাটক লেখা হয়, যাহাতে সাধারণ অর্থ অপেক্ষা আর একটি বিশেষ অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'তাসের দেশ' এই শ্রেণীর অন্তর্গত।)

৩। বস্তুতান্ত্রিক নাটক

বস্তুতান্ত্রিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ করা হয় সমাজের অতি পরিচিত ঘটনা ও অবস্থা হইতে। নাটকের চরিত্রগুলিকে এমনভাবে সাজান হয়, যাহাতে তাহাদিগের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা সমাজের একটা সত্য ও সুস্পষ্টরূপ ফুটিয়া ওঠে এবং সে বিশেষ রূপটি কল্পনার দ্বারা প্রসারিত নয়। নাটকের কাহিনীতে যে বিচিত্র ছোট-বড় চরিত্রের সমাবেশ হয়, সেই সব চরিত্র যেন আমাদের বিশেষ পরিচিত বলিয়া মনে হয়। তাহাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না যেন আমাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার সহিত মিশিয়া যায়। এই শ্রেণীর নাটক দেখিয়া অন্তরে যে রসের সৃষ্টি হয়, তাহা আনন্দরস। কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বড় করিয়া দেখান বস্তুতান্ত্রিক নাটকের লক্ষ্য নয়, সমগ্র সমাজ ও বিচিত্র মানুষের জীবন লইয়া তাহার কারবার। তাই আজ কলের কুলিমজুর, লাঞ্ছিত, রিক্ত, স্ত্রী-পুরুষ সবাই বস্তুতান্ত্রিক নাটকের মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেছে। তাহাদের সকলের উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশ। এই সমগ্র দেশের সমাজ-জীবনের আত্মপ্রকাশ নাটকের পরিধিকে বাড়াইয়া দিয়াছে।

কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে সকলের ধারণা আজকাল সমান নয়। বর্তমানে একদল সাহিত্যিক মনে করিয়া থাকেন যে, যাহা কিছু অসুন্দর, যাহা কিছু সামঞ্জস্যহীন—তাহাই বাস্তব। কিন্তু বাস্তব কখনও অসুন্দর বা সামঞ্জস্যহীন হইতে পারে না। বিশ্বসংসারে ছড়ান রহিয়াছে অনেক জিনিস, তাহার সবটুকু আমরা সাহিত্যের কাজে লাগাই না। তাহার মধ্যে যেটুকু বাছাই ও ছাঁটাই হইয়া আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ে, কেবলমাত্র সেইটুকুই বাস্তব—বাকি অংশটুকু অবাস্তব। এই অবাস্তব অংশও কল্পনার জাদুতে বাস্তব হইয়া ওঠে। সেইজন্য বলা চলে, "বিষয় বাছাই নিয়ে রিয়্যালিজম্ নয়, রিয়্যালিজম্ ফুটবে রচনার জাদুতে"—(রবীন্দ্রনাথ)। অথচ আজকাল কাব্যের সৌন্দর্য অপেক্ষা বিষয় বাছাইটাই অনেকের নিকট বড় বলিয়া মনে হইতেছে। কোন লেখকের অনবধানে যদি তাঁহার কাব্য সুন্দর হইয়া ওঠে, তবে তাহা আধুনিক লেখকদের অনেকের কাছে গতযুগের বলিয়া নিন্দিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"সত্যই সৌন্দর্য। কিন্তু সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই, অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি জ্ঞানে নয়, স্বীকৃতিতে, তাকেই বলি বাস্তব। খুব বেশী চেনা হলেই যে বাস্তব হয় তা নয়; কিন্তু যাকে চিনি অল্প, তবু যাকে অপরিহার্যরূপে হাঁ বলেই মানি সেই আমার পক্ষে বাস্তব।"

ভিন্ন ভিন্ন মানুষের রুচি ভিন্ন প্রকারের। কেহ টক খাইতে ভালবাসে, কেহ পছন্দ করে মিষ্টদ্রব্য। রসিকব্যক্তি মাত্রেই সাহিত্যের মধ্যে রসবস্তুর সন্ধান করিয়া থাকেন। রসহীন বস্তুর কোন মূল্য নেই; বস্তুর মধ্যে রসের প্রকাশ হইলে তাহা চিরকালের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়।

"বাইরের হাটে বস্তুর দর কেবলই ওঠানামা করছে—সেখানে নানা মুনির নানা মত, নানা লোকের নানা ফরমাশ, নানা কালের নানা ফেশান। বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়লে কবির কাব্য হাটের কাব্য। তাঁর অন্তরের যে ধ্রুব আদর্শ আছে তারই পরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। ··সে আদর্শ আনন্দময়, সুতরাং অনির্বচনীয়।"—(রবীন্দ্রনাথ)

নাটকের বাস্তবতা সম্বন্ধে Hugh Sykes Davies তাঁহার Realism in the Drama গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে—A certain amount of realism is to be found in all periods of the drama, and that it is not the particular asset of any one period or school. মিঃ ডেভিজ আরও বলিয়াছেন যে, রিয়্যালিস্টিক নাটক কেমন করিয়া লিখিতে হয় তাহার সম্বন্ধে কেহ যদি তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, তবে তাঁহার উত্তর হইবে এইরূপ: Write as you please. Have a due consideration for the circumstances of the theatre, and above all for the natural preconception of the drama which your audience will have. But beyond that there are no technical devices which will help you, and only by a complete sincerity with yourself you will be able to reach a kind of human experience which is common to all men, which will be felt by your audience to be a part of themselves, so that they will have the impression, at least, that your characters are, indeed, just like themselves".

বাঙলা-সাহিত্যে নিছক বস্তুতান্ত্রিক (Realistic) নাটক তেমন লেখা হয় নাই। সামাজিক নাটক যাহা লেখা হইয়াছে তাহার অধিকাংশ ভাবপ্রধান। একটা নৈতিক আদর্শ স্থাপনের জন্য সেগুলির জন্ম। শরৎচন্দ্রের 'যোড়শী', 'রমা', 'বিজয়া', তারাশঙ্করের 'কালিন্দী', 'দুইপুরুষ', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'বিশ বছর আগে', 'মেঘমুক্তি', 'মাটির ঘর' বুদ্ধদেব বসুর 'কালো হাওয়া' এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য নাটক।[২]

(গ) রূপপ্রধান নাটক

রূপভেদেও নাটকের শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে। এখানে রস, আদর্শ বা ভাব অপেক্ষা আকৃতির দিকে নাট্যকারের লক্ষ্য থাকে অধিক। সংস্কৃত-শাস্ত্রে

২। অতি আধুনিক কালে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ির 'দুঃখীর ইমান', মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট', সলিল সেনের 'ডাউন ট্রেন', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'ক্ষুধা' প্রভৃতিকে বস্তুতান্ত্রিক নাটকের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলা চলে।

নৃত্য-গীত-বাদ্য এই তিনের সমন্বয়কে নাট্য বলে। ইহার অপর নাম তৌর্যত্রিক। এই তিনের সহযোগিতায়—আনন্দসৃষ্টি করাই পূর্বকালে নাটকের উদ্দেশ্য ছিল। বর্তমানে সাধারণতঃ গীতের প্রাধান্য থাকিলে গীতিনাট্য ও নৃত্যের প্রাধান্য থাকিলে নৃত্যনাট্য বলা হয়।

১। গীতিনাট্য ও যাত্রা

গীতিনাট্যে গীতের প্রাধান্য থাকিলেও নৃত্য ও বাদ্য তাহার সহিত যুক্ত হয়। ইংরেজিতে এই শ্রেণীর নাটককে বলে Opera, বাংলায় বলে 'যাত্রা'।[৩] আমাদের দেশে 'অপেরা' নামটি "যাত্রা"র বদলে বেশ চলিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতকে এই Opera-এর উদ্ভব হয়। এই অপেরা এবং Barlesque Play নামক আর এক শ্রেণীর নৃত্যগীতবহুল বিদ্রূপাত্মক নাটকের মিলনে গাথানাট্য বা Ballad Opera-এর প্রচলন হয়। আর এক শ্রেণীর গীতিপ্রধান নাটক দেখা যায়, যেগুলিকে Masque বলে। পাত্র-পাত্রীরা মুখোশ পরিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয় এবং অতি মানবীয় চরিত্র নাটকে অংশগ্রহণ করে। Gray-এর Beggar's Opera এবং Milton-এর Comus যথাক্রমে Opera ও Masque-এর উদাহরণ। উদ্ভট কল্পনা ও সংগীত-প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে Extravaganza (অদ্ভুত-নাট্য) বলে।

প্রাচীনকালে বাংলাদেশেও গীতিনাট্যের অভিনয় প্রচলিত ছিল। দুই, তিন অথবা তদূর্ধ্ব পাত্র-পাত্রী লইয়া গীতের সাহায্যে নানা অঙ্গভঙ্গির দ্বারা পৌরাণিক ঘটনাবিশেষের অভিনয় করা হইত। তাহাতে কথোপকথনও কিছু কিছু থাকিত। মাঝে মাঝে হাস্যরসের ব্যবস্থা ছিল। এইগুলিকে পালাগান বলা হইত। পালাগানে মূল গায়েন ও তাঁহার দোহারেরা নাটকীয় আলাপ অংশ চালাইতেন। 'ঝুমুর' ও 'পাঁচালি' এই পালাগানের অন্তর্গত। ঝুমুরে দুইটি পাত্র-পাত্রীর মধ্যে দ্বৈতগান ও নাচ চলিত এবং একের অধিক পাত্র-পাত্রী থাকিলেও কোন পদের বা গানের মধ্যে দুইজনের বেশি লোকের কথাবার্তা থাকি না। পাঁচালীতে একটিমাত্র অভিনেতা থাকিত এবং সে গান গাহিবার সময় চামর দুলাইত। কথকতাও ঠিক এই শ্রেণীর নাট্যগীতি। সেখানেও একটির বেশি দুইটি লোক থাকিত না।

পালাগানগুলি যাত্রাগানের পূর্বরূপ। এই পালাগানগুলির সহিত পূর্বভারতে প্রচলিত একপ্রকার গীতিনাট্যের ধারার মিলনে যাত্রার উদ্ভব হয় বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দে' এবং বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' পূর্বভারতীয় ধারার নিদর্শন পাওয়া যায়।

৩। গীতিন্যট্য ও যাত্রার আঙ্গিক ভিন্ন। গীতিনাট্য মূলতঃ নাটক কিন্তু যাত্রা পৃথক সাহিত্যাকৃতি। যাত্রার ইংরেজী Opera নহে।

সপ্তদশ শতকে এইরূপ নাটক রচনার ধারা মিথিলা এবং বঙ্গদেশ হইতে নেপালে প্রসারিত হয়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—

"এইসব নাটকে গদ্য অংশ ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালা বা মৈথিলে (সংস্কৃতের পরিবর্তে), এবং পদ্যশ্লোকের স্থানে মৈথিলী বা কোসলী (অথবা পূর্বী-হিন্দী)-তে পদ বা গান আছে, নাটকের পাত্র-পাত্রীদের কার্য-কলাপ (প্রবেশ, নির্গমন, উপবেশন ইত্যাদি) পূর্ব-নেপালের প্রাচীন ভাষা, ভোট-ব্রহ্ম শাখার অনার্য মোঙ্গলীয় ভাষা নেওয়ারী লিপিবদ্ধ আছে।·· রামানন্দ রায় কর্তৃক এই সংস্কৃতময় গীতগোবিন্দের অনুকরণে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে জগন্নাথ-বল্লভ নামে 'সঙ্গীত-নাটক' রচিত হইয়াছিল। পদময় সঙ্গীত-নাটক বা নাট্যকাব্যের ধারা বিচার করিলে গীতগোবিন্দকে ঐ পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে" ('শ্রীজয়দেব কবি' প্রবন্ধ)।

ষোড়শ-শতকে 'রুক্মিণীহরণ' নামে একখানি নাট্যগীতির অভিনয় সপারিষদ শ্রীচৈতন্যদেব করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহাতে মহাপ্রভু সাজিয়াছিলেন 'লক্ষ্মী', গদাধর 'রুক্মিণী', নিত্যানন্দ 'বড়াইবুড়ি', শ্রীবাস 'নারদ' ও হরিদাস 'কোতোয়াল'। অভিনয়কালে শ্রীচৈতন্যদেব স্ত্রীজনসুলভ লাস্য-নৃত্যও করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে যে যাত্রার গান হইত, তাহাতে কোন বাঁধা পালা ছিল না। পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অনুযায়ী কথোপকথন, গান ও শ্লোকাদি পাঠ করিত। অনেক সময় কয়েকটি নির্দিষ্ট গান থাকিত, নটেরা উপস্থিত মত কথোপকথন তৈরি করিয়া লইত। পরে বাঁধা পালার প্রচলন হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এইরূপ কয়েকখানি বাঁধা পালা বাঙলাদেশ হইতে নেপালে গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের 'চণ্ডী-নাটক' যাত্রা পালার একটি অপূর্ণ উদাহরণ। এই সময়ে যাত্রার মধ্যে পাঁচালির প্রভাব আসিয়া পড়ে। কৃষ্ণযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা প্রভৃতি নানাশ্রেণীর যাত্রাপালা এই সময়ে অভিনীত হয়। কৃষ্ণযাত্রায় হাস্যরসের অবতারণার জন্য নারদমুনি ও তাঁহার শিষ্য ব্যাসদেবের চরিত্র প্রবর্তিত হয়। উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে কালিয়দমন ও রাস লোকপ্রিয় হইয়া ওঠে। এই সময়ে যাত্রায় পাঁচালির সঙ্গে কীর্তন মিশ্রিত হয়। কিছুদিন বিদ্যাসুন্দর পালার সমাদর দেখা যায়। উনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে যাত্রায় থিয়েটারি ঢঙের আমদানি হয়। ইংরেজি আদর্শের সঙ্গে কথকতার ধরনের বক্তৃতা, প্রাচীন যাত্রা, পাঁচালি ও কীর্তনের ভক্তিরসপূর্ণ গানের সংযোগে নূতন যাত্রাপদ্ধতির সৃষ্টি হয়। এই সময়ে বহু নাটক খোলা আসরে ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে থাকে। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে" লিখিয়াছেন,—

"সেই যুগে (উনবিংশ শতকের শেষের দিকে)...'গীতাভিনয়' নামে যাত্রা ও নাটকের মাঝামাঝি ধরনের এক প্রকার অভিনয় এদেশে দেখা দিয়াছিল। এই সকল অভিনয় পুরাদস্তুর নাটকেরই মত ; তফাতের মধ্যে অভিনয়ে দৃশ্যপটাদির বালাই ছিল না.। নাটকাভিনয় এদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই খুব উৎসাহিত হইয়া উঠে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ-নির্মাণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া সকলের পক্ষে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন সম্ভব ছিল না।"

যাত্রাকে আমাদের দেশে গীতাভিনয় বলে। যাত্রার আসল অর্থ হইতেছে, দেবতার উৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা। তারপর এই অর্থ হইল দেবতার উৎসব উপলক্ষে নাট্যগীতি। যাত্রার পালা-বাঁধার নিয়ম আর থিয়েটারের নাটক বাঁধার নিয়মে অনেক প্রভেদ আছে। প্রাচীন যাত্রার একটা বিশেষত্ব ছিল, নারদমুনির হাস্যরসের অবতারণা। থিয়েটারে থাকে দৃশ্যপট, কনসার্ট, আলো এবং সাজসজ্জার পরিবর্তন। এগুলির ব্যবস্থা না থাকিলে নাটকের অভিনয় ভাল জমে না। খাঁটি যাত্রায় দৃশ্যপট, আলো, কনসার্টের তেমন কোন মূল্য নাই। যাত্রার আসল প্রাণ হইতেছে 'জুড়ি-দোহার'। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"ধর কালিদাসের 'শকুন্তলা' আরম্ভ হ'ল—হরিণ শিকারে চলেছেন রাজা রথ চালিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে। থিয়েটারওয়ালা এখানে ঠেকবে, এটা নিশ্চয়। গতিবেগ নেই রথের, হরিণের, কিছুরই ; স্থির দৃশ্যপট, স্থির কাঠ-কাগজে-কাদায়-মাটিতে গড়া রথ ঘোড়া সবই—তার উপরে খাড়া সচলাচল রাজা স্টেজের উপরে, রাজার মৃগয়া-যাত্রার একটা বৈরূপ্য ঘটন ছাড়া কিছুই সম্ভব হয় না। কাজেই থিয়েটারের স্টেজে এ. অংশ সুযোগ্য লোকে বাদ দিয়ে যান। যাত্রাওয়ালা এখানে নির্ভয়—সে গানের পর জুড়ির গান বর্ণনা জুড়ে দর্শকের মনোরথ তেজে নিয়ে ফেলে আশ্রমের কাছ। গীতছন্দে স্যন্দন চল্লো, হরিণ দৌড়লো নানা বর্ণের মধ্যে দিয়ে দৃশ্য-পরম্পরা ছাড়িয়ে, চ'লে গেল মন অতি সহজ উপায়ে যাত্রাতে,—সচল মনোরথ (স্বচ্ছন্দ গতি পেলে সুর ও ছন্দের সাহায্যে) —এই ছিল যাত্রার বিশেষত্ব। থিয়েটারে যেটা ঘটানো অসম্ভব, সেটা সুসম্ভব হ'ল যাত্রার অধিকারীর কাছে (দিলে সে হাঁকিয়ে রথের জুড়ি ঘোড়া আসরের মধ্যে) নির্ভয়ে—ধুলো লাগলো না দর্শকের গায়ে, বালি পড়লো না কারুর চোখে, দুয়ো দিলে না কেউ!"—(যাত্রা ও থিয়েটার)

যাত্রার মধ্যে থাকে একটা প্রচণ্ড গতিবেগ। একটি সম্পূর্ণ পালা পুরাপুরি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার বিশ্রাম নাই। একখানি সম্পূর্ণ যাত্রার পালা তিন চারদিনে শেষ করিবার নিয়ম ছিল। কিন্তু প্রত্যেক দিনের অভিনীত

অংশের মধ্যে একটি পূর্ণ বিষয়ের রূপ দিবার চেষ্টা থাকিত। থিয়েটারের নাটক এইরূপ ভাবে অভিনয় করিবার নিয়ম নাই।

'যাত্রা' ছাড়াও রঙ্গমঞ্চে অভিনেয় এক প্রকার গীতিবহুল ক্ষুদ্রাকার নাটককেও গীতিনাট্য বলা হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এইরূপ কয়েকখানি গীতিনাট্য লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 'মোহিনী প্রতিমা' 'মায়াতরু' 'আলাদিন' 'স্বপ্নের ফুল', 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' প্রভৃতি তাঁহার প্রসিদ্ধ গীতিনাট্য। অতুলকৃষ্ণ মিত্রও গীতিনাট্য লিখিয়া এককালে যথেষ্ট নাম করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'মায়ার খেলা' 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' 'শাপ মোচন' সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্য। তাহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ গীতোৎসবগুলি এই শ্রেণীর। গিরিশচন্দ্রের 'আবুহোসেন', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' Extravaganza-র উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাঙলা ভাষায় এই Extravaganza প্রথম প্রবর্তন করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে বলিয়াছেন—"একদিন কথা হইল আমাদের ভিতর Extravaganza নাট্য নাই। আমি তখনই Extravaganza প্রস্তুত করিবার ভার লইলাম। পুরাতন "সংবাদ-প্রভাকর" হইতে কতকগুলি মজার-কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া একটা 'অদ্ভুত-নাট্য' খাড়া করিয়া তাহাতে সুর বসাইয়া বাড়ির বৈঠকখানায় মহা উৎসাহের সহিত তাহার মহলা আরম্ভ করিয়া দিলাম।"

২। নৃত্যনাট্য

নৃত্যনাট্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। সে কালে নটেরা নাট্যকলার সৌন্দর্যসাধনে যথাবিধি নৃত্যকলার প্রয়োগ করিতেন। সে নৃত্য অনেক সময় তাললয়াদিযোগে এবং অবস্থাভেদে বিনা তালে কেবলমাত্র ভাব-ভঙ্গির দ্বারা দর্শক সমক্ষে লীলায়িত হইয়া উঠিত। এই জাতীয় নৃত্যকে নৃত্যনাট্য বা নাট্যনৃত্য বলা হইত। রসভাবহীন তাললয়াদি-যোগে যে নর্তন, তাহাকে বলা হইত 'নৃত্ত' (নৃত্তং তাললয়াশ্রয়ম্) ; রস, ভাব ও ব্যঞ্জনাদি সহযোগে যে নর্তন তাহাকে বলা হইত 'নৃত্য' (ভাবাশ্রয়ং নৃত্যং) ; নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য প্রায় সমার্থক। মূল অভিনেয় নাট্যবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠেয় নর্তনই নাট্য, (অবস্থানুকৃতির্নাট্যং)। এই নাট্যাভিনয় প্রদর্শনের একটা নাট্যক্রম ছিল। নৃত্যের পূর্বে প্রার্থনা করিবার পর নৃত্য আরম্ভ হইত। তাহাতে কণ্ঠে থাকিত সংগীত, তাহার অর্থ হস্তদ্বারা প্রকাশিত হইত ; নেত্রদ্বারা তাহার ভাব দ্যোতিত হইত এবং চরণদ্বারা তাহার তাল রক্ষা করা হইত। এইরূপ করিবার কারণ বোধহয় এই যে, হস্তলীলার প্রতি দৃষ্টি ধাবিত হয়, দৃষ্টির পশ্চাৎ চিত্ত ধাবিত হয়, চিত্তের সঙ্গে ভাব অনুসরণ করিয়া থাকে ;

আবার ভাবের পরিণতি রসে, রস হইতে আনন্দের উৎপত্তি। এই আনন্দ-দানেই নাটকের সার্থকতা।

ইংরেজিতে এইরূপ ধরনের কোন নাট্যাভিনয় সম্ভবতঃ নাই। থাকিলেও আমার জানা নাই। সাধারণতঃ যেগুলি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়, সেগুলি Pastoral dance বা Ballad dance. সেই সব নাট্যাভিনয়ে শারীরিক ক্রিয়া-কলাপ যতখানি থাকে, সৌন্দর্যসৃষ্টির আবেদন ততখানি থাকে না। বিখ্যাত রুশীয় নর্তকী এ্যানা পাভলোভা সেইজন্য ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের অনুশীলনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যশস্বী নৃত্যবিদ্ উদয়শংকর তাঁহার নৃত্য-সঙ্গীরূপে নৃত্যজগতে প্রথম প্রবেশ করেন। অবশ্য উদয়শংকর পরে ভারতীয় নৃত্যের আধ্যাত্মিক রসতত্ত্ব জগতের নানাস্থানে পরিবেশন করিয়া নৃত্য-রসিকদের মনে এক বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে এক নূতন ধরনের নাট্যাভিনয় প্রবর্তন করিয়াছেন। 'নৃতনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"এই গ্রন্থের অধিকাংশই গানে রচিত, এবং সে-গান নাচের উপযোগী। এ-কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। যে পাখির প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপরে চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।"

রবীন্দ্রনাথের নৃতনাট্যের মধ্যে রূপলোক ও রসলোক—উভয় লোকই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অন্তর ও বাহিরের যোগে এই লীলারসের সৃষ্টি। এমন অখণ্ড লীলারস আর কোন লেখকের সৃষ্টিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তাঁহার 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র অভিনয় দেখিয়া রসিক দর্শকেরা যথেষ্ট আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। 'নটরাজ'-এর নৃত্যাভিনয় কালে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"নটরাজের ভাণ্ডার তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উদ্বোধিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধন মুক্ত হয়। 'নটরাজ' পালাগানের এই মর্ম।"

নৃত্যছন্দে আনন্দ রূপায়িত হয়। ভাষা যেখানে স্তব্ধ, সংগীত সেখানে নীরব সেই অনির্বচনীয় রূপলোকে অরূপের বন্দনা চলে নৃত্যের তালে তালে। ভারতবর্ষের এই নৃত্য উৎসারিত হইয়াছে দেবলোকে। নটরাজ শিবই হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নর্তক। প্রকৃতির অন্তর্নিহিতা আদ্যাশক্তির স্বচ্ছন্দ ছন্দ-হিল্লোল

নটরাজের নৃত্যে রূপায়িত। সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য-পরিবেশক শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ, ভারতীয় নৃত্যের যে মূলসূত্র নির্দেশ করিয়াছেন তাহা এইরূপ,—

"ভারতীয় নৃত্যে অঙ্গভঙ্গীমায় প্রকাশিত হচ্ছে বিশ্বের ছন্দ। এই ছন্দ জাগে অঙ্গের নীরব সুরে, রেখার আবেশমাখা আল্পনায়, তার সুরের মূর্ছনায়। রেখার ক্ষুদ্র আঘাতগুলি এক একটি মিড়, গমক ও তানেরই মত আবেগ-বিহ্বল। নাটকে যেমন পাই ভাবের সংঘাত, নৃত্যে তেমনি পাই মনের গোপন গহনে কল্পনা ও স্বপ্নের গতি-ঝংকার, সেখানে কথা, ছবি, গান, সবই নিষ্ফল হয়ে ফিরছে। আবেগের পটভূমিকার উপর চিত্রিত হচ্ছে রূপায়িত ভাবলোক। আবেগের মাঝখানে অঙ্গের অন্তরালে সুপ্ত হয়ে আছে যে অদৃশ্য সত্তা, তাকে স্পর্শ করছে নৃত্যের ছন্দ-জাগরণী। প্রতি অঙ্গ বিক্ষেপে প্রশান্ত মানস-সরোবরে অহরহ উঠছে ভাঙছে কতশত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বপ্ন-তরঙ্গ। পরিদৃশ্যমান জগৎ যেন প্রতিমুহূর্তে তার সত্যকারের স্বরূপটির সামনে এসে থমকে দাঁড়াচ্ছে; তাই লাস্য নৃত্যে তরঙ্গায়িত হচ্ছে জীবন-মরণের অনন্ত প্রবাহ—এই নৃত্যে প্রকাশিত হচ্ছে পুরুষ ও প্রকৃতির ভাব-সম্মেলন, যাতে সঞ্জীবিত হচ্ছে প্রতি অণু-পরমাণু, যাতে বিচ্ছুরিত হচ্ছে ইন্দ্রিয়াতীত বিভূতি। এই হল ভারতীয় নৃত্যশিল্পের মূলসূত্র।"—(ভারতীয় নৃত্য)

(ঘ) উদ্দেশ্যপ্রধান নাটক

বর্তমানে এক শ্রেণীর নাটক দেখা যায়, যেগুলি নাট্যকারের একটা বিশেষ মতকে আশ্রয় করিয়া প্রচারোদ্দেশে লিখিত। এলিজাবেথীয় যুগের নাটকে যে আত্মপ্রচারকে গৌণ স্থান দেওয়া হইত, এই শ্রেণীর নাটকে তাহাই মুখ্য ভাব ধারণ করিয়াছে, দেখা যায়। এই শ্রেণীর নাট্যকারেরা নিজেদের সৃষ্ট চরিত্রের মুখ দিয়া নিজেদের বিশেষ মতটি ব্যক্ত করিয়া থাকেন; অথবা সংকেতের দ্বারা জগতের কোন বৃহত্তর সমস্যার সমাধান করিয়া থাকেন। কোন কোন পূজনীয় ব্যক্তির চরিত্র মহিমা প্রচার উদ্দেশ্যেও কেহ কেহ নাটক লিখিয়াছেন। এ-গুলি সবই উদ্দেশ্যপ্রধান নাটক। আজকালকার দিনে উদ্দেশ্যপ্রধান নাটক নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও, নাটকের প্রকৃতি বিচারে এগুলিকে তেমন মূল্য দেওয়া যায় না। কারণ, নাটকের উদ্দেশ্য নাট্যকারের আত্মসত্তাকে প্রকাশ করা নয়, নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়া নাটকান্তর্গত চরিত্রকে প্রকাশ করা। প্রচার অপেক্ষা রস-সঞ্চার করাই নাটকমাত্রেরই চরম লক্ষ্য।

১। সমস্যামূলক নাটক

সমাজ ব্যবস্থার নূতন চেতনা হইতে বর্তমানে নানা সমস্যার উৎপত্তি হইতেছে। পূর্বে সমালোচকদিগের ধারণা ছিল যে, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই—সাহিত্য কেবল ব্যক্তিমনের সৃষ্টি। আবার বর্তমানে কোন কোন সমালোচক ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সাহিত্য সমাজমনেরই অভিব্যক্তি—ব্যক্তিমনের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এই দুইটি মতের কোনটাই সত্য নয়, কারণ সাহিত্য গঠিত হয় এই দুয়েরই সমন্বয়ে। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি মত উদ্ধৃত করিলেই ইহা আরও সুস্পষ্ট হইবে।—

"আপন সৃষ্টিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনও ইতিহাস তাকে সাধারণের সঙ্গে বাঁধেনি। ইতিহাস যেখানে সাধারণ সেখানে বৃটিশ 'সবজেক্ট' ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের বিচিত্র-লীলা চলছিল, কিন্তু নারকেল গাছের পাতায় যে আলো ঝিলমিল করছিল সেটা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের রাষ্ট্রিক আমদানি নয়। আমার অন্তরাত্মার কোনও রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে সে বিকশিত হয়েছিল· কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা গ্রহণ করেন।"

তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"আত্মা পুত্রস্নেহের মধ্যে সৃষ্টিকর্তারূপে আপনাকে প্রকাশ করতে চায়। তাই পুত্রস্নেহ তার কাছে মূল্যবান। ·হাল ধরে আছে আমার সৃষ্টির তরীতে সেই আত্মা যার নিজের প্রকাশের জন্য পুত্রের স্নেহের প্রয়োজন, জগতের নানা দৃশ্য নানা সুখ-দুঃখকে যে আত্মসাৎ ক'রে বিচিত্র রচনার মধ্যে আনন্দ পায় ও আনন্দ বিতরণ করে।"

অন্তর্দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করিয়া যাঁহারা কেবলমাত্র বাহিরের সমস্যাকে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনার প্রয়াস পান, তাঁহারা যে সাহিত্যের মূল আদর্শের সহিত পরিচিত নন, এ-কথা বলিলে বোধহয় অন্যায় হইবে না। সাহিত্যের মধ্যে সমাজমন ও ব্যক্তিমন পরস্পর একত্রভাবে বাস করে : অথচ বর্তমানকালের সাহিত্যে বেকার-সমস্যা, রাষ্ট্রিক সমস্যা, জাতি-সমস্যা, বিবাহ-সমস্যা, যৌন-সমস্যা, ইতর-ভদ্রের সমস্যা শুধু সমস্যা হিসাবে যতখানি দেখা দিতেছে, বোধহয় সাহিত্য-হিসাবে ততখানি নয়। আবার আর এক সমস্যাও দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ এই বিভিন্ন সমস্যাগুলি বুদ্ধির সাহায্যে প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সেই সকল স্থলে ব্যক্তির মন অপেক্ষা মননশীলতা প্রকাশ পাইতেছে অধিক। আধুনিক অধিকাংশ নাটকেই এই মননশীলতার প্রাচুর্য বিশেষভাবেই লক্ষিত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে এই যে, অধিকাংশ স্থলেই পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের কথা না বলিয়া নাট্যকারের ভাব-কল্পনাকে

প্রকাশ করিতেছে। এই প্রচার-প্রচেষ্টার জন্য নাটকের মূল্য হ্রাস হইয়া পড়িতেছে।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ হইতে ইংলণ্ডে এই বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্যা-মূলক নাটকের আমদানি দেখা দিয়াছে। শুধু ইংলণ্ডে কেন, ইউরোপের অন্যান্য স্থানেও যেমন ফরাসি, জার্মানি, বেলজিয়াম এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া দেশে ঠিক ঐ সময় হইতেই নূতন ধরনের নাটক লেখা শুরু হইয়াছে। ইংলণ্ডে নরওয়ে দেশের নাট্যকার Ibsen-এর নাটকাবলী প্রচারিত হইলে, ইংলণ্ডের নাট্য-সাহিত্যে এক যুগান্তরের সূচনা হয়। Ibsen-এর নাটকাবলী আধুনিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও সমাধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্বে যে সমাজ-সমস্যামূলক নাটক (Problem play) লেখা হইত, তাহাতে নাট্যকার সমাজ-সমস্যাটি দর্শকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেন, কিন্তু নিজ মত ব্যক্ত করিতেন না। কিন্তু Ibsen-এর সময় হইতে যে Thesis drama বা Drama of Ideas-এর প্রবর্তন হইল, তাহাতে নাটকীয় চরিত্রের কোন পক্ষকে বা নাট্যকারের বিশেষ কোন মতকে প্রচার করিবার চেষ্টা দেখা গেল। Ibsen-ই সর্বপ্রথম প্রাচীন নাট্য-রচনা পদ্ধতির অবান্তর উপাদানগুলি বর্জন করিয়া এক সহজ রচনা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। কোন কোন আধুনিক নাটকে action-কে অস্বীকার করিয়া, কেবলমাত্র আলোচনার দ্বারা নাটকীয় ভাবকে ব্যক্ত করা হয়। ইহাদিগকে Static drama অথবা Discussion drama বলা হয়। Thesis drama-র উদাহরণ স্বরূপ Ibsen-এর 'A Doll's House' 'The Pillars of Society' 'Ghosts' 'Rosmers-holm' প্রভৃতির নাম করা যায়। জার্মানীর Hauptmann এবং Sudermann, সুইডেনের Strindberg, ফ্রান্সের Hervieu এবং Brieux এবং ইংলণ্ডের Pinero, Henry Arthur Jones, Galsworthy এবং Bernard Shaw প্রভৃতি এই বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্যামূলক নাটক লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।

বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে আধুনিক বুদ্ধিগ্রাহ্য সমস্যামূলক নাটক নাই বলিলেও চলে। গত শতকে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নামে যে সামাজিক নাটকখানি লিখিয়াছিলেন তাহাকে ঠিক মননশীল নাটক বলা চলে না এবং তাহার রচনা-কৌশলও আধুনিক নাটকের আঙ্গিকে সৃষ্ট নয়। নাটকহিসাবেও তাহার তেমন মূল্য ও মর্যাদা নাই। নাটকের রসসৃষ্টি অপেক্ষা প্রচার কার্যটাই মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে। চিন্তার পরিশুদ্ধতায় এবং রচনা-কৌশলের নূতনত্বে রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'ই বোধ হয় এই শ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। আধুনিক বাঙলা নাটকের মধ্যে জ্যোতিবাচস্পতির 'নিবেদিতা', 'সমাজ', শচীন সেন-গুপ্তের 'ঝড়ের রাতে', 'স্বামী-স্ত্রী', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মেঘমুক্তি', 'বিশ বছর আগে', তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই পুরুষ', 'কালিন্দী', মনোজ বসুর

'প্লাবন', বুদ্ধদেব বসুর 'কালো হাওয়া'-র নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু এ-গুলিও নাটকীয় ভাব-বিন্যাস এবং আঙ্গিকের বিচারে সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় চিন্তাপ্রধান সমস্যামূলক নাটকগুলির সমতুল্য নয়।[৪]

২। রূপক-নাটক

নীতিমূলক আখ্যান (allegorical theme) ও সাংকেতিক রচনা (Symbolic art)—রূপককে এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। জাতকের গল্প, কথামালা, Pilgrim's Progress, Faerie Queene প্রভৃতির আখ্যান-ভাগ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপ রচনায় একটি উপাখ্যানের অতীত একটি নীতি থাকে। কিন্তু সাংকেতিক রচনায় কোন বিশেষ রূপকে প্রকাশ না করিয়া মনুষ্য জীবনের ও বিশ্বজগতের একটি নির্বিশেষ সত্তাকে প্রকাশ করা হয়। Dr. Spurgeon বলিয়াছেন,—

> The essence of true symbolism rests on the belief that all things in Nature have something in common, something in which they are really alike—(Mysticism in English Literature)

বিখ্যাত সমালোচক অজিত কুমার চক্রবর্তী তাঁহার কাব্য পরিক্রমা গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

> "কতকগুলি রস যাহা কাব্যের বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে—তাহাদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত আছি, কিন্তু সেই রসগুলির মধ্যেই যে মানুষের সমস্ত হৃদয়াবেগের প্রকাশ নিঃশেষিত তাহা নহে; প্রেম, ভক্তি, করুণা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তি যে রসোদ্রেক করে তাহার ধারণা আমাদের মনে সুস্পষ্ট, কিন্তু অন্তরের জন্য পিপাসা যে রসকে জাগায় তাহার ধারণা তো তেমন স্পষ্ট নহে; কারণ সেই বিশেষ অনুভূতিটিই কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরা দেয় না, সেই কারণে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যখন কঠিন হয়, তখন তাহা প্রকাশের জন্য symbol বা বিগ্রহকে আশ্রয় করিতে হয়, অর্থাৎ ইঙ্গিত-ইশারায় সেই রসের খানিকটা আভাস দিতে হয়।"

রূপক-নাট্য মনের অপরূপ রাজ্যের অনবদ্য সৃষ্টি। সে সৃষ্টির মধ্যে বাস্তব নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের দ্বন্দ্ব সংঘাত বা বিক্ষোভ নাই। রূপক-নাটক মানিয়া লইয়াছে অরূপকে, অপ্রকাশকে অতীন্দ্রিয় ইঙ্গিতকে। সেইজন্য রূপক-নাটকের অভিনয় নাট্যালয়ে বিধেয় কিনা সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ

৪। বিধায়ক ভট্টাচার্যের মাটির ঘর, দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনস্রোত, উৎপল দত্তের অঙ্গার, বীরু মুখোপাধ্যায়ের সংক্রান্তি প্রভৃতি বর্তমানকালে রচিত নাটকগুলিকে সমস্যামূলক-নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

করিয়া থাকেন। অভিনয়কালে ইহার সবটুকু দর্শকদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। যাহা মনোজগতের জিনিস তাহাকে বহির্জগতের আবহাওয়ায় প্রকাশ করিতে গেলে তাহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়। রূপক-নাট্যকারেরা ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহতের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের লক্ষ্য কেবল—,

"To see the world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower."

নাটকে রূপক-সৃষ্টির প্রচেষ্টা খুব বেশিদিন পূর্বে দেখা দেয় নাই। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে কয়েকজন সাহিত্যিক অনুভব করিয়াছিলেন যে, বাস্তব ঘটনার সংক্ষুব্ধ-তরঙ্গলীলার মাঝে মানুষের মনকে ভাসাইয়া দিলে, অন্তরের অপরূপ সৌন্দর্যকে ধরা যায় না। তাই তাঁহারা বহির্জগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাত হইতে আপনাদিগের মনকে সংযত ও সংহত করিয়া অন্তর্মুখী করিয়া তুলিলেন। জীবনের অতীন্দ্রিয় রহস্য ও সাংকেতিকতাকে নাটকের বিষয়ীভূত করিয়া তাঁহারা এক নূতন ধরনের সাহিত্যের সৃষ্টি করিলেন। ইহাকেই রূপক-নাট্য বা Symbolic drama নাম দেওয়া হইল। প্রথমে Ibsen তাঁহার নাটকে সামান্যভাবে এই সাংকেতিকতার প্রবর্তন করিলেন। তারপরে জার্মানীতে Hauptmann, বেলজিয়ামে Maeterlinck, ইটালিতে D'Annunzio, ফ্রান্সে Edmond Rostand, আয়র্লণ্ডে William Butler Yeats, ইংলণ্ডে Jerome K. Jerome ও Charles Rann Kennedy এবং আমেরিকায় Percy Mackaye—এই নূতন ধরনের নাটক লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। উনবিংশ শতকের শেষ পাদ হইতে বিগত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সাহিত্যের মধ্য দিয়া জীবনের পরম রহস্যটি এইরূপে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা চলিয়াছে।

রূপক-নাটকে ব্যক্তিগত মানুষের চিত্র অপেক্ষা শ্রেণীগত মানুষের ব্যাখ্যা থাকে অধিক। উৎকৃষ্ট সাহিত্যের ধর্মই হইতেছে, যে চরিত্রগুলি লইয়া তাহার কারবার, সেগুলি ঠিক কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতীক নয়, কোন বিশেষ জাতির প্রতিনিধি। সাহিত্যের সৃষ্ট চরিত্রে এই শ্রেণীগত ভাব থাকে বলিয়া, সেগুলি আমাদের ভাল লাগে। সেইজন্য সাহিত্য কেবলমাত্র রূপের চিত্র নয়, তাহা এক হিসাবে রূপকও বটে। রূপসৃষ্টি প্রধান হইলে তাহাকে সাধারণ সাহিত্য নাম দেওয়া হয়; আবার গভীরতর তত্ত্বকথার সন্ধান থাকিলে তাহাকে রূপক বলা হয়। 'রূপকে' রূপের মূল্য গৌণ, তত্ত্বই প্রধান। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বিশ্বের মর্মকথায় রূপান্তরিত হইলে রূপকের সার্থকতা। রূপকের গল্প অনন্য-সাধারণ ও অপরূপ। সেইজন্য রূপককে রূপকথাও বলা চলে। রূপকের চরিত্রের কোন ব্যক্তিত্ব নাই, তাহারা এক একটা বিশেষ গুণের প্রতীক। তাহারা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কথা বলে না, তাহাদিগের কাজ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা।

কিন্তু 'রূপকে' রূপ-কে একেবারে অস্বীকার করিলে চলে না। 'রূপকে' রূপেরও একটা বিশেষ মূল্য আছে। কোন আশ্রয় না থাকিলে কোন তত্ত্বকেই রূপ দেওয়া যায় না; আর তাহা শিল্পের কোঠায় পৌছায় না। সেই সাহিত্য বড় সাহিত্য, যাহাতে একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের চিত্র ও শ্রেণীগত মানুষের আনন্দ-বেদনা পাশাপাশি থাকে। যে সাহিত্যে রূপের চাপে তত্ত্ব নষ্ট হয় অথবা তত্ত্বের চাপে রূপ নষ্ট হয়, সে সাহিত্য নিকৃষ্টশ্রেণীর সাহিত্য। সেইজন্যই বোধহয় নিছক রূপক-সাহিত্যকে আজকাল বড় সাহিত্য বলিয়া অনেকে মানিতে চাহিতেছেন না।

রূপক-নাটককে কেহ কেহ Static drama-ও বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে, এইরূপ নাটক বহির্জগতের action দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। রূপক-নাটককে যাঁহারা Plotless drama বলিয়া থাকেন তাঁহাদিগের সহিত আমি একমত নই। কারণ, শিল্পমাত্রই বস্তুনিরপেক্ষ নয়। বিস্তৃত কাহিনী না থাকিলেও, কাহিনীর একটা রেখাচিত্রও যদি না থাকে, তাহা হইলে কোন নাটকই গড়িয়া তোলা সম্ভব নয়। তবে এ-কথা ঠিক যে রূপক-নাটকে ঘটনাংশ অপেক্ষা অরূপের ব্যঞ্জনাই থাকে অধিক।

রূপক-নাটকের মধ্যে একটা অস্পষ্টতা থাকে। নাটকের অনেক কথা দর্শকেরা সহজে ধরিতে বা বুঝিতে পারেন না। এ-সম্বন্ধে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলিয়াছেন,—

"বাস্তবিক পক্ষে সে-কথাগুলি ধরিবার বা বুঝিবার জন্য নয়, অনেকগুলি কথা মিলিয়া একটা অনুভূতির আভাসমাত্র মনের মধ্যে জাগাইবার জন্য। "মহারাজ আমার কথা বুঝাবার জন্য নয়, বাজবার জন্য"—(ফাল্গুনী) এ-কথাটার একটা অর্থ আছে। সত্যই রূপক-রচনার সব কথা বুঝিবার জন্য নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা সুরকে বাজাইবার জন্য; এই সুরই রূপক-রচনার সবখানি।"

আমাদের দেশে প্রকৃত রূপক-নাটক রবীন্দ্রনাথই লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ নানা প্রকারের নাটক লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রূপক-নাট্যকার হিসাবেই তাঁহার খ্যাতি বেশি। 'ঋণশোধ' 'পরিত্রাণ' অরূপরতন' 'গুরু' 'ডাকঘর' 'ফাল্গুনী' 'মুক্তধারা' 'রক্তকরবী' প্রভৃতি রূপক-নাটকগুলির নাম সকলের কাছে সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা বস্তু-জগতের ঘটনা ও পরিবেশের মধ্যে আনন্দ খুঁজিয়া পায় না, সকল সময়েই সংকেত-রহস্যময় ইন্দ্রিয়াতীত ভাব-বস্তুটিকে পাইবার জন্য ব্যস্ত। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনার সমস্ত মর্মকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া এই আদর্শ তাঁহার লেখায় ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ইন্দ্রিয় জগতের পশ্চাতে অতীন্দ্রিয় জগৎকে জানিবার সাধনাই

ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনার সর্বোত্তম আদর্শ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে জানিয়াছেন।

কিন্তু ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে, ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার ভাবগত সত্য রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকগুলিতে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়িলেও 'ডাকঘর' 'অচলায়তন' 'ফাল্গুনী' 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'তে যে-রূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সহিত প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের, বাঙলার উনবিংশ শতকের নাট্যরীতি বা আমাদের দেশের যাত্রা-কথকতার নাট্যরীতির সঙ্গে মিল নাই। তাঁহার মতে, এই নূতন ধরনের নাট্যরূপ সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য নাট্যরূপের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে বিশিষ্ট নাট্যরূপ স্ট্রীণ্ডবার্গ, মেটারলিঙ্ক, ইয়েটস্, আন্দ্রিফ, হাউপ্টম্যান প্রভৃতি সাহিত্যনায়কদের নাট্যরীতিতে দেখা দিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই নাট্যরীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হইয়া পারেন নাই। কিন্তু এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই নব নাট্যরূপের প্রভাব সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যকে অভিভূত করিতে পারে নাই। রূপক-নাটক সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতাও যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। সুতরাং নীহারবাবুর ভাষায় বলা যাইতে পারে যে,—

"রূপক-নাট্যের বিশেষ ভঙ্গিমার ছায়াটিকে হয়ত রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য নাটক হইতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু কায়া তাঁহাকে নিজেই সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল এবং তাহার বিকাশের পথ তিনি নিজেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।"

অদূর ভবিষ্যতে সমালোচকেরা সাধারণ নাট্যকারহিসাবে রবীন্দ্রনাথের কি মূল্য নিরূপণ করিবেন তা আমি জানি না, কিন্তু এখন এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সাংকেতিক রহস্যময় নাটক-রচয়িতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে ভবিষ্যতেও পূজা পাইবেন; এবং আত্মার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও উপলব্ধির নিদর্শন হিসাবে তাঁহার নাটকগুলি স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি উৎকৃষ্ট রূপক-নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নাটকে সাংকেতিকতা মানিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন। তিনি Dr. Thompson-কে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকগুলি allegorical নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—"I am very fond of them, and to me they are just like other plays. To me, they are very concrete," কবির এই মত মানিয়া লইলে এই প্রকার দাঁড়ায় যে, 'রক্তকরবীর' নন্দিনী একটি মানবীয় ছবি এবং রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজিতে গেলে অনর্থ ঘটিবে। কিন্তু কবির এই মত অনেকেই সমর্থন করেন না।

তবে এ-কথা মানিতেই হইবে যে, রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলির একটা বিশেষ ধর্ম আছে, যাহা অন্য নাট্যকারদের নাই। মেটারলিঙ্ক, ব্যারী,

ইয়েট্‌স্‌ প্রভৃতি যে রূপক-সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে সাধারণ জীবনের ছাপ খুব গভীর নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাধারণ জীবনের কথাই খুব বেশি করিয়া বলিয়াছেন। ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন,—

"তিনি (রবীন্দ্রনাথ) রূপকের মধ্যে ঘরের কথাকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রূপক-কাব্যের ইহাই সবচেয়ে বড় কথা যে তাহাতে অরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে দৈনন্দিন জীবনের সহজ সাধারণ ঘটনার মধ্য দিয়া। প্রত্যেক রূপক-নাটকের মধ্যেই একটা কথা বলিবার থাকে যাহা অসাধারণ, যাহা দৈনন্দিন জীবনেব অতীত; কিন্তু এই অসাধারণকেও তিনি প্রকাশ করিয়াছেন একান্ত সাধারণের সংশ্রবে আনিয়া। তাঁহার প্রত্যেক নাটকেই একটি চরিত্র থাক যে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অতীত; যে অরূপ লোকের রূপক। কিন্তু এই চরিত্রটির সঙ্গে পার্থিব, সাধারণ লোকদের একটা নিবিড় অন্তরঙ্গ সংস্রব রহিয়াছে। যে অদৃশ্য লোকের অধিবাসী কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাহার হৃদয়ের স্পন্দন নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। সে অচেনা নীল পাখি নয়, সে অদৃশ্য দ্বীপ নয়, সে অপরিচিত আলো নয়, সে আমাদের নিতান্ত আপনার লোক।"—(রূপক-নাট্যে রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যেও একটা সাধারণ জীবনের স্পন্দন শুনিয়াছেন। মুক্তধারার ঝরনা শুধু দেবতার নয়, তাহা শিবতরাইয়ের লোকদের তৃষ্ণা নিবারণের আধার। ষড়ঋতুর পরিবর্তনের মধ্যে তিনি একটা বিশেষ বিশেষ মানুষের রূপ দেখিয়াছেন, তাহাতে অতি-প্রাকৃত কিছুই নাই। এমনি আরও নানান দিক দিয়া তিনি মানুষের সহজ জীবনযাত্রাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহার রূপকতত্ত্ব বিকশিত হইয়াছে নাটকের বিরোধের মধ্য দিয়া। এই বিরোধ বাহিরের বিরোধ নয়, মানুষের অন্তরাত্মার বিরোধ। রূপক-নাট্যে বিরোধের স্থান খুব সংকীর্ণ, অরূপের সন্ধানই থাকে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অথচ বিরোধ না থাকিলে নাটক সার্থক হইয়া ওঠে না। অনেকেই এই সমস্যাকে এড়াইয়া গিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকে ইহার সমাধান পাওয়া যায়।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে রূপক বা রূপকথার কোন মূল্য নাই। সেইজন্য সাম্প্রতিক নাটকে সাংকেতিকতাকে অস্বীকার করা হয়। নাটকের যে প্রধান গুণ সংঘর্ষ, সাংকেতিকতা তাহার পরিপন্থী। অথচ এই যুগেই রূপক-নাট্যের এক নবধারার প্রবর্তন হইল কিরূপে? ইহার কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগ হইলেও মানুষের মন ক্রমেই তত্ত্বানুসন্ধানে অন্তর্মুখী হইতেছে। এই বস্তু-তান্ত্রিক যুগেও অতি সাধারণ জিনিসের মধ্যে কোন বিশেষ অর্থ আছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য মানুষ ব্যস্ত। তত্ত্বানুসন্ধানের এই

ঔৎসুক্য হইতে একদল লোক রূপক-সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, আবার আর একদল লোক যাহা কিছু দেখিতেছেন তাহারই মধ্য হইতে বিশেষ অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই রূপক-সৃষ্টি ও রূপক-অনুসন্ধানের আর একটি কারণ হইতেছে, এ-যুগ সমানাধিকারের যুগ। কেবলমাত্র ব্যক্তির মাহাত্ম্য প্রচার করা এ-যুগের ধর্ম নয়। এ-যুগের গণসাহিত্য মানুষের শ্রেণীগত সত্তাই স্বীকার করে। এমনি করিয়া বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য রূপক-সাহিত্যের পথ তৈরি করিতেছে।

একদল সমালোচক আছেন, যাঁহারা সাধারণ নাটকেও এই সাংকেতিকতার অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তবে যেখানে নাট্যকার সাংকেতিক নাটক বলিয়া নিজেই নিজের নাটকের পরিচয় দিয়াছেন, সেখানে সাংকেতিকতার অনুসন্ধান না করিলে নাটকের সত্যরূপটি হারান হয়। যেমন Maeterlinck-এর Blue Bird—ইহাকে সাংকেতিক নাটক না বলিয়া উপায় নাই এবং ইহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে গেলে ইহার রহস্যময় রূপটির পরিচয় গ্রহণ করিতেই হইবে। Shakespeare-এর The Tempest নাটকে অনেকে রূপকের সন্ধান করিতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছেন ; কেননা, ঘটনাপরম্পরার সহিত যথার্থরূপে রূপকের অর্থ মেলে না। সুতরাং যেখানে রূপকের আভাস নাট্যকার দেন না, সেখানে সাংকেতিকতার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া অনাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'তে রূপকের অনুসন্ধান না করিয়া রসের অনুসন্ধান করিলেই বোধহয় আনন্দ পাওয়া যায় অধিক।

৩। চরিত-নাটক

মহাপুরুষদের চরিত্র-বর্ণনা করিয়া নাটক লেখার রীতি এ-দেশে বহু কাল হইতে আছে। চৈতন্যদেব হইতে আধুনিক কালের বহু ধর্মগুরুর জীবনেতিহাস অবলম্বনে নাটক লিখিয়া যাত্রায় এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু সে-গুলি সাধারণ মানুষের জীবন-চরিত নয়। সাধারণ বলিতে আমি এই কথা বলিতে চাই যে, ধর্মসাধনার বাহিরে থাকিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এমন মানুষের নয়। ইউরোপে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রনেতাদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে কয়েকখানি নাটক অভিনীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। চলচ্চিত্রে আমরা Emile Zola-র জীবনী চিত্রিত হইতে দেখিয়াছি। বাঙলা দেশে 'বনফুল' সর্বপ্রথম চরিত-নাটকের (Biographical Play) প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর' নাটক রসিকজনের তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হইয়াছে। এই সকল নাটকের উদ্দেশ্য মহাপুরুষদিগের জীবনের মহিমা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা। বর্তমানে

"বনফুলে'র অনুকরণে অনেকেই চরিত-নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মহেন্দ্র গুপ্তের 'মাইকেল ও 'মহারাজ নন্দকুমার' এবং নিতাই ভট্টাচার্যের 'মধুসূদন' উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোন কোন অংশ নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হইতে শোনা গিয়াছে।

ভবিষ্যতে এরূপ নাটক আরও হয়তো অনেক লিখিত হইবে এবং অভিনীত হইবে। কিন্তু চরিত-নাটক লেখা খুবই শক্তি-সাপেক্ষ। একটি জীবনের সমগ্র ইতিহাস জুড়িয়া জুড়িয়া প্রদর্শন করিলেই তাহা নাটক হইয়া ওঠে না। সমাজের যে-কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বিস্তৃত জীবনের কেবলমাত্র সংঘর্ষময় অংশটুকু বাছিয়া লইয়া নাটক সাজাইতে হয়। তাহার মধ্যে অলীক কল্পনার স্থান নাই। জীবনকে যথাযথ রাখিয়া প্রকাশভঙ্গি ও আকর্ষণীশক্তির দ্বারা জীবনের ক্রম-পরিণতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন। মহান ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্যের সফলতায় কেহ ধর্মনেতা, কেহ রাষ্ট্রপতি, কেহবা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পর্যায়ে উন্নীত হন। নাট্যকারকে সেই উদ্দেশ্যের নিবিড় অনুভূতিকে আবিষ্কার করিয়া তাহাকেই জীবনের বহুবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়া দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজাইয়া পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতে হয়। অথচ অনেকের এমন ধারণাও আছে যে, কোন জীবন-চরিতকে সহজ কথায় সংলাপময় আকারে রূপান্তরিত করিতে পারিলেই তাহা নাটক হইয়া ওঠে। এরূপভাবে রূপদান করিয়া অনেক নাটক ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে। সাধারণ নাটক রচনার যে নিয়ম-পদ্ধতিগুলি আছে, সেগুলি চরিত-নাটক সম্বন্ধেও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মনে রাখিতে হইবে—

"ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের গল্প অগ্রসর হয়। নাটকীয় মুখ্য চরিত্র কথনও সরল রেখায় যায় না। জীবন একদিকে যাইতেছিল, এমন সময় ধাক্কা খাইয়া তাহার গতি অন্যদিকে ফিরিল; পুনরায় ধাক্কা খাইয়া আবার অন্যদিকে অগ্রসর হইল—নাটকে এইরূপ দেখাইতে হইবে। * * ফলতঃ, সুখের ও দুঃখের বাধা ও শক্তি, চরিত্র ও বহির্ঘটনার সংঘর্ষণে নাটকের জন্ম। যুদ্ধ চাই, তা সে বাহিরের ঘটনাবলীর সহিতই হউক কিংবা নিজের সঙ্গেই হউক। অন্তর্দ্বন্দ্ব যে নাটকে দেখানো হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।"—(দ্বিজেন্দ্রলাল)

বাঙলার যে কয়খানি চরিত-নাটক প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে সবগুলি সার্থক হইয়া ওঠে নাই। কোনখানি অভিনয়ের গুণে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে, কোনখানি নাট্যকারের কিছুটা কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। নাটক রচনার মূলসূত্রটি অবলম্বন করিয়া বর্ণনীয় চরিত্রের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিকতা রক্ষা করিয়া চরিত-নাটক লিখিবার প্রয়োজন এখনো আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নাটকের বিভিন্ন উপকরণ

১। সাদৃশ্য

নাটকীয় আখ্যানভাগকে রসঘন করিবার জন্য কখনও মূল ঘটনার পাশে আর একটি অনুরূপ কাহিনী সংগ্রথিত হয়। ইহাকেই সাদৃশ্য (Parallelism) বলে। কেবলমাত্র নাটকীয় গতিকে ক্ষিপ্রতর অথবা নাটকীয় অভিনয় সাফল্যের নিমিত্তই যে সাদৃশ্যের প্রয়োগ বিধেয় তাহা নয়, সাদৃশ্যের সংগঠন নাটকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকরণ এবং উপকাহিনীগুলিকে একটি ঐক্যসূত্রে বাঁধিয়া দেয়। Shakespeare-এর নাটকে সাদৃশ্যের উদাহরণ খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার King Lear-নাটকের দুইটি অনুরূপ কাহিনী সুন্দরভাবে মিশিয়া গিয়া নাটকের শেষে একই পরিণতি লাভ করিয়াছে। একটি গল্পে রাজা লিয়র যে কন্যাকে ভুল বুঝিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন, শেষে সেই কন্যাই তাঁহার আদরণীয় হইল। অপর গল্পে পিতা Gloucester যে পুত্রকে অবিশ্বাস করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন, শেষে সেই পুত্রই তাঁহার প্রিয়পাত্র হইল। এমনি করিয়া দুইটি গল্প অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে পরিবর্তিত হইয়া একই পরিণতি লাভ করিল। একই প্রকারের দুইটি ঘটনা পাশাপাশি দিবার উদ্দেশ্য এই যে, পাঠক বা দর্শক এইরূপ ঘটনাকে অসম্ভব বলিয়া মনে করিবেন না। একটি ঘটনা অপরটিকে সত্য এবং সম্ভাব্য করিয়া তোলে। ইহাই সাদৃশ্যের চমৎকার উদাহরণ।

২। বৈসাদৃশ্য

নাটকীয় আখ্যানভাগের মধ্যে যে বিপরীত ব্যক্তি-স্বার্থ বা বিপরীত বাসনা-কামনার সংঘর্ষ থাকে, তাহাকেই বৈসাদৃশ্য (Contrast) বলে। ইহা সাদৃশ্যের অপেক্ষা নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদান। এই বৈসাদৃশ্যের নানাপ্রকার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, নাটকের গোড়ায় যে ভাব লইয়া নাটকীয় বিষয়ের শুরু হয়, নাটকের পরিণতিতে তাহার বিপরীত ভাবই দেখা যায়। নাটকের গোড়ায় যদি নায়িকাকে সুখী বলিয়া মনে হয় এবং নাটকের শেষে যদি নায়িকা দুঃখী হয়, তবে তাহাকেই ঘটনার বৈসাদৃশ্য বলা যাইতে পারে। একটা উদাহরণ দিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। ওথেলো ডেস্‌দেমোনাকে ভালবাসে এবং ওথেলোর বিশ্বাস তাহাদের বিবাহিত

জীবন সুখের হইবে—এই ভাব লইয়া নাটকের আরম্ভ হইল। কিন্তু নাটকের পরিণতিতে দেখা গেল যে, ওথেলো ডেস্‌দেমোনার ভালবাসায় অহেতুকভাবে সন্দিহান হইয়া তাহাকে হত্যা করিল এবং ইহাতে তাহার নিজের জীবনও ব্যর্থ হইল। যে সুখের কল্পনা করিয়া ওথেলো জীবন আরম্ভ করিয়াছিল তাহা দুঃখের অশ্রুতে ভাসিয়া গেল। ইহারই নাম বৈসাদৃশ্য। ট্র্যাজিডি এবং কমেডির বিচার করিতে গেলে এই বৈসাদৃশ্যের অবস্থাটি বিচার না করিলে চলে না। এই বৈসাদৃশ্যের দ্বারাই tragic effect সৃষ্ট হয়। ইব্‌সেনের অনেকগুলি নাটকে এই বৈসাদৃশ্যের চমৎকার উদাহরণ মেলে। তিনি তাঁহার An enemy of the people এবং Rosmersholm নাটকে একটা শান্তি এবং আনন্দের মধ্যে নাটকীয় ঘটনার উদ্বোধন করিয়াছেন, কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে যে তাহা একটি প্রবল ঝটিকার মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বৈসাদৃশ্য কেবল গল্পাংশের মধ্যে নয়, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য, ঘটনা এবং চরিত্রের মধ্যেও দেখা যায়। ওথেলো এবং ইয়াগোর চরিত্র এইরূপ বৈসাদৃশ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবার একই চরিত্রের মধ্যে বিপরীত ভাবের সমাবেশ থাকিতে পারে এবং সেই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্বে চরিত্রের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে থাকে। যখন Julius Caesar নাটকে Brutus-এর মুখে শুনি—"Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more." তখনই ব্রুটাসের মনের দুইটি বিপরীত ভাব—বন্ধুত্ব ও স্বদেশপ্রেমের দ্বন্দ্ব বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না।

৩। নাটকীয় বক্রোক্তি

অলংকার-শাস্ত্রে একই উক্তি বা একই ভাবধারার মধ্যে দুইটি অর্থোৎপত্তি হইলে তাহাকে বক্রোক্তি বলে। নাটকীয় বক্রোক্তিতে কেবলমাত্র যে, দুইটি অর্থোৎপত্তি হয় তাহা নহে, ঘটনার অন্তর্গত প্রকৃত সংবাদ জানা না-জানার কথাও তাহাতে থাকে। সেইজন্য নাটকীয় বক্রোক্তি বা Dramatic Irony-কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—ঘটনামূলক বক্রোক্তি (Irony of Situation বা Incident) এবং বাচনিক বক্রোক্তি (Verbal Irony)। পূর্বাহ্ণে সংঘটিত হইয়াছে অথবা ভবিষ্যতে ঘটিবে এমন একটি ঘটনা সম্বন্ধে দর্শকরা অবগত আছেন, অথচ রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ পাত্র-পাত্রীরা তাহার কিছুই জানেন না, এমন অবস্থায় সেই ঘটনা সম্বন্ধে সেই অবতীর্ণ পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে কেহ যদি কোন বিপরীত মন্তব্য করেন, তবে সেই উক্তিতে দর্শকদের মনে যে ভাব-সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়, তাহাই ঘটনামূলক বক্রোক্তি "Ignorance of the sequel on the part of the personages represented clashes with the knowledge of it on the part of the audience"—(Prof. Moulton). Henry V নাটকে ষড়যন্ত্রকারীরা যখন রাজাকে হত্যা করিবার সংকল্প করিল, তখন ষড়যন্ত্রকারীরা

জানিত যে তাহাদিগের এ ষড়যন্ত্রের কথা তাহারা ছাড়া বাহিরের আর কেহ জানে না, অথচ দর্শকরা জানে যে রাজা এ খবর পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। এই ব্যাপার জানার ফলেই ষড়যন্ত্রকারীদের ভাগ্য ও নাটকের পরিণতি সম্বন্ধে দর্শকদের মনে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়। এই যে একই জিনিসের দুইটি বিপরীত ভাব দর্শকদের মনকে সচকিত করিয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে, এই দুই বিপরীত ভাবের জ্ঞানকেই নাটকীয় বক্রোক্তি বলে। চোরকে চোর না বলিয়া যখন 'সাধু' কথাটি প্রয়োগ করা হয়, তখন 'সাধু' কথাটির প্রকৃত অর্থটি বুঝিতে দর্শকদের কোনই কষ্ট হয় না। ওথেলো ইয়াগোকে কখনও Honest ইয়াগো ছাড়া বলে নাই, অথচ ওথেলো নাটকের পাঠক বা দর্শকমাত্রেই জানে যে ইয়াগো কি-রকম Honest ছিল! কোন নাটকের প্রারম্ভ দেখিয়া আমরা যেরূপ পরিণতি আশা করি সেরূপ না হইয়া নিয়তির দ্বারা যখন নায়ক-নায়িকার ভাগ্য পরিচালিত হইয়া দুঃখময় হয়, তখন তাহাকে Tragic Irony বলে। ইহা সাধারণতঃ গ্রীক নাটকেই দেখা যাইত। শেকস্‌পীয়রের Macbeth-নাটকে এই নিয়তির অদৃষ্ট-হস্তের ইঙ্গিত পাই। বাঙলায় মাইকেলের 'পদ্মাবতী নাটক' ও 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' এই নিয়তির লীলা দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। প্রচ্ছন্নতা ও বিস্ময়

নাটকের আখ্যানভাগে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একটা উদ্বেগ ও উৎসাহ সৃষ্টির জন্য অনেক নাটকের উদ্দেশ্যটি প্রচ্ছন্ন রাখা হয়। নাট্যকার নাটকের মূলবস্তু বা চরিত্রের পরিচয় নাটকের শুরুতেই প্রকাশ না করিয়া নাটকের ক্রম-পরিণতির সময় একটু একটু করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। নাটকের আলাপন ও ঘটনা-বিন্যাসের মধ্যে দিয়া তখন নাটকের আসল উদ্দেশ্যটুকু দর্শকের নিকট সরল হইয়া পড়ে এবং দর্শকদের মনে তৎক্ষণাৎ বিস্ময়ের উদয় হয়। নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাসের এই উপায়কে নাটকীয় প্রচ্ছন্নতা ও বিস্ময় (Concealment and Surprise) বলে। এমন অনেক নাটক দেখা যায়, যেখানে নাট্যকার পূর্বেই নাটকীয় বিষয়টি দর্শকদের বলিয়া দেন। ইহা ভাল কি মন্দ, সে-কথা বলা বড় শক্ত। কারণ, নাট্যকার যে উপায়েই হোক, তাঁহার নাটকে যদি একটি সুপরিণতি দিতে পারেন, তবেই তাহাতে তাঁহার নাটকের সার্থকতা। নাটকের মধ্যে নাটকীয় চরিত্রের বা ঘটনার প্রচ্ছন্নতা ও বিস্ময় শেকস্‌পীয়রের নাটকে যেমন দেখা যায়, বাঙলা নাটকেও তেমনি দেখা যায়। সাজাহান নাটকের দিলদার বোকা সাজিয়া মোরাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেন, কিন্তু যখন নাটকের শেষের দিকে জানা যায় যে তিনি এশিয়ার

বিজ্ঞতম সুধী ছদ্মবেশী নিয়ামৎ খাঁ তখন দর্শকদের মনে বিস্ময় উৎপন্ন হয়। 'বিসর্জন' নাটকে রঘুপতি রাজাকে খুন করিয়া রাজরক্ত আনিতে বলিলে—

"আমি রাজপুত, পূর্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে
এই রক্ত দিব।"—

বলিয়া জয়সিংহ যখন ছুরিকাঘাতে আত্মবিসর্জন করে, তখন দর্শকদের মনে এক অভূতপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়।

৫। অতিপ্রাকৃত উপাদান

নাটকীয় কথাবস্তুর ব্যাখ্যা ও সূচনার উদ্দেশে নাটকে অতিপ্রাকৃত উপাদানের (Supernatural Element) সমাবেশ করিতে হয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে এই অতিলৌকিকতার প্রতি শিক্ষিত সমাজের তেমন আস্থা নাই। কিন্তু এই অতিলৌকিকতাকে মানিয়া লইলে নাটকীয় রসাস্বাদনের পক্ষে সুবিধা হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, এই অতিপ্রাকৃত উপাদানের সাহায্যে নাট্যকার একটা বিশেষ চিন্তা-মানসের পরিচয় দেন। ইহা ঠিক নাট্যকারের ব্যক্তিগত অভিমত নয়। ইহা নাটকের রস-পরিবেষণের একটা উপায় মাত্র। ঝড়ঝঞ্ঝা, মেঘবিদ্যুৎ, ভূতপ্রেত, স্বপ্ন বা অভাবনীয় ঘটনা-সংস্থাপনের দ্বারা নাট্যকার যে অতিলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন তাহাতে নাটকীয় রস ঘনীভূত হয়। 'শকুন্তলা'য় দুর্বাসার অভিশাপ বা Macbeth-এ কুঠার দর্শন প্রভৃতি সংকেতগুলির মধ্যে নাটকীয় কথাবস্তুর একটি গভীর অর্থ নিহিত আছে। অনেক সময় মানবভাগ্যে নিয়তির নিষ্ঠুর লীলা বুঝাইবার জন্যও নাট্যকারেরা নাটকে অতিপ্রাকৃতের সমাবেশ করেন। Byron-এর ভাষায় বলা চলে—'I had a dream, which was not all a dream'. সাংকেতিকতার দিক হইতে নাটকে স্বপ্নেরও একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই অতিপ্রাকৃত উপাদানের প্রয়োগ দ্বারা নাট্যকার মানুষের জীবনের ইন্দ্রিয়গত এবং অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করেন। সময়ে সময়ে একটা নৈতিক আদর্শ স্থাপনের জন্যও তাঁহারা ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। কখনও কখনও অতিপ্রাকৃত উপাদান এক বা বহু চরিত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয় এবং ইহা নাটকীয় ঘটনাবর্তের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ইহাকে Objective Supernatural Element বলে। যেমন, Hamlet নাটকে Hamlet-এর পিতার প্রেতাত্মা—Horatio, Marcellus এবং Hamlet সকলের সামনেই আবির্ভূত হইয়াছে। এই প্রেতাত্মার অবর্তমানে

Hamlet-নাটকের কোন সার্থকতাই থাকিত না। অনেক সময় এই অতিপ্রাকৃত উপাদান কেবল বিশেষ চরিত্রের দৃষ্টিগোচর হয়, ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্যান্য চরিত্রগুলি তাহাকে দেখিতে পায় না। ইহাকে Subjective Supernatural Element বলে। Phillippi যুদ্ধক্ষেত্রে Julius Caesar-এর প্রেতাত্মা Brutus-এর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু Brutus সাহস করিয়া যখনই তাহার সহিত আলাপ করিতে গিয়াছে, তখনই সে অদৃশ্য হইয়াছে। বলা যাইতে পারে যে, এইরূপ প্রেতাত্মার পার্থিব রূপ নাই। ইহা Brutus-এর উত্তেজিত মনের সৃষ্টিমাত্র।

বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র অতিলৌকিক ঘটনার সমাবেশে গ্রন্থ রচনার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার 'কপালকুণ্ডলা' 'চন্দ্রশেখর' 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাসে এইরূপ দৃষ্টান্তের ভূরিভূরি প্রমাণ আছে। এই সকল গ্রন্থ নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া অভিনীত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। স্বপ্ন ও যোগবলের উপর যে বঙ্কিমের বিশেষ আস্থা ছিল, তাহা তাঁহার গ্রন্থাদি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। Subjective Supernaturalism-এর উদাহরণস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকখানির কথা স্মরণ করা যাইতে পারে। চাণক্যের 'প্রেয়সী'র কোন পার্থিব রূপ নাই। অথচ তিনিই চাণক্যের সব। চাণক্যের মনের যে অন্তর্মুখী দ্বন্দ্ব তাহা এই প্রেয়সীর সংস্পর্শেই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ঝড় ও মেঘগর্জনের ইঙ্গিতে দুঃখময় নাটকের গভীরতা সম্পাদিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীর স্বপ্নে তাহার আত্মহত্যার ইঙ্গিত জাগিয়াছে, তপস্বিনীর স্বপ্নে আসন্ন যুদ্ধের এবং অহল্যার স্বপ্নে কৃষ্ণকুমারীর ভবিষ্যৎ আভাসিত হইয়াছে। জয়সিংহের মৃত্যুর পূর্বে জয়সিংহ ও রঘুপতির মনে যে ঝড় উঠিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে মন্দির-প্রাঙ্গণে ঝড়বৃষ্টির দ্বারা। সেই দুর্যোগের মাঝেই জয়সিংহ আত্মবিসর্জন করিল।

৬। স্বগতোক্তি

নিকটে কেহ নাই অথচ কেহ যদি আপন মনে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া যায় অথবা পাত্র-পাত্রী নিকটে থাকা সত্বেও তাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া কেহ যদি কিছু বলে, তাহাকেই 'স্বগতোক্তি' (Soliloquy) বলা হয়। অথবা অভিনয়কালে অন্যান্য পাত্র-পাত্রীদের কাছে কোন কিছু গোপন করিবার জন্য যদি কোন অভিনেতার মনে কোন ভাব আন্দোলিত হইতে থাকে, তিনি সকলের অজ্ঞাতে মুখে যখন সেই ভাবটি প্রকাশ করেন, তখন তাহাকেও স্বগত বা আত্মগত বাক্য বলে। সংস্কৃত নাটকে এইরূপ স্বগতোক্তির অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দিই। শকুন্তলা

উপস্থিত রহিয়াছেন, রাজা দুষ্মন্ত তাঁহার সামনে স্বগতোক্তি করিতেছেন,—“ইঁহার উপর আমার যেমন অনুরাগ আমার উপরে কি ইঁহার সেইরূপ অনুরাগ হইবে?” অথবা “আমার প্রার্থনার এখন উত্তম অবসর। কেননা, এই শকুন্তলা আমার বাক্যের সহিত নিজের বাক্য মিশ্রিত করিতেছেন না সত্য, কিন্তু আমি যখনই কোন কথা বলিতেছি, তখনই ইনি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছেন; আমার মুখের সম্মুখবর্তিনী হইয়া ইনি দাঁড়াইতেছেন না; কিন্তু ইঁহার দৃষ্টি অন্য বিষয়েও অধিকক্ষণ নিবিষ্ট থাকিতেছে না।”

বর্তমানকালের নাটকে এইরূপ ভাষণ পরিত্যক্ত হইতেছে। এক ব্যক্তি অজস্র কথা বলিয়া যাইতেছে, অথচ সে-কথা উপস্থিত অন্য কেহ শুনিতে পাইবে না, ইহা বর্তমানকালের নাটকীয় বিষয় হইতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রুতিগোচর হয় এমন বাক্য লইয়া বাদানুবাদের মধ্য দিয়া যে ভাবরসের সৃষ্টি হয়, সেই ভাবরসই বর্তমানকালের নাটকের প্রধান অবলম্বন। সেইজন্য বর্তমান কালের অতি আধুনিক নাটক হইতে স্বগতোক্তি বাদ পড়িয়া যাইতেছে।[১] তাই বলিয়া প্রাচীনকালের নাটক যে এ-কালের নাটক হইতে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট—এ-সব কথা একেবারেই উঠিতে পারে না। দুই যুগের দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দুই প্রকার নাটক গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দুই প্রকার নাটকই তাহাদের নিজ নিজ যুগে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সত্য।

বাঙলা সাহিত্যের এ-কালের নাটকাবলীতে এই স্বগতোক্তির প্রচুর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক খুঁজিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ-যুগের নাটক সাধারণতঃ শেক্‌সপীয়রের নাটকের প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। শেকস্‌পীয়রের নাটকে Soliloquy-র ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বগতোক্তি খুব পছন্দ করিতেন। তাঁহার ‘চন্দ্রগুপ্ত’ নাটকে চাণক্য বহু স্বগতোক্তি করিয়াছেন। কিন্তু এই স্বগতোক্তিগুলি যে একেবারে মূল্যহীন সে কথাও বলা যায় না। চরিত্রের ও মনের অবস্থা প্রকাশ করিতে এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনা বর্ণনা করিতে —এই স্বগতোক্তিগুলি কি কিছুই সাহায্য করে না? “তুমি আমাকে অনেক শিখিয়েছো প্রেয়সী আমার! তুমি আমাকে শিখিয়েছো—সংসারকে ঘৃণা কর্তে, ক্ষমতাকে তুচ্ছ কর্তে, ঈশ্বরের অত্যাচারের বিপক্ষে সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে। হে সুন্দরি! আমায় সংসার হতে আরও দূরে টেনে নিয়ে যাও—যত দূরে পারো। নরকে হয় তাও ভালো; শুদ্ধ সংসার থেকে যত দূরে হয়।”

১। রঙ্গমঞ্চে কেহ নাই, বক্তা আপন মনে কথা বলিয়া যাইতেছেন, এইরূপ স্বগতোক্তির ব্যবহার আধুনিক নাটকেও চলিতেছে।

—ইত্যাদি উক্তি কি চাণক্যের অশান্ত হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি নয়? ইহাতে কি নাটকের মূল্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই? তবে আধুনিক নাটকে দীর্ঘ স্বগতোক্তি তুলিয়া দেওয়াই উচিত। তাহা না হইলে নাটকীয় রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে।

৭। কোরাস

প্রাচীন গ্রীসদেশে নাট্যাভিনয়ের সময় দল বাঁধিয়া যে গান গাহিত তাহাকে কোরাস বলিত। পরে এই পদ্ধতি সারা ইউরোপের জাতীয় সংগীতগুলিতে প্রচলিত হয়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙলা নাটকে পাশ্চাত্য রীতির এই কোরাস বা সমবেত সংগীত প্রবর্তন করেন। তাঁহার রচিত 'মেবার পাহাড', 'যখন সঘন গগন গরজে', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' প্রভৃতি গানগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পূর্বেও ভারতবর্ষে এই প্রকার গানের প্রচলন ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। মূল গায়ক গানের একটি কলি গাহিয়া ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য গায়করা সেই কলিটি সমবেতভাবে গাহিত। রাজপুত চারণগণ এই রীতিতে গান গাহিত। এখনও যাত্রার জুড়িতে ও কীর্তন গানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে।

কোরাস গানের উৎপত্তি অতি প্রাচীন কালেই হইয়াছিল। পূর্বে এক প্রকার লোক-সংগীত চারণ কবিরা গ্রীসের ধনীগৃহে গাহিয়া বেড়াইত। সে-গুলির মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের চিহ্নও থাকিত না। পরে উহার সহিত নীতি-মূলক গল্প সংযোজিত হয়। এই সংযোজনের ফলে কবিতা যে নবমূর্তি ধারণ করে, তাহাতেই গীতিকাব্যময় সমবেত সংগীতের (Choral lyric) জন্ম হয়। এই কোরাস সংগীত হইতেই গ্রীক ট্র্যাজিডির উৎপত্তি। গ্রীক ট্র্যাজিডির মধ্যে যে সত্য ও পবিত্রভাবের ইঙ্গিত থাকিত, তাহাই কোরাস গানে প্রকাশিত হইত। আর কোরাসের কাব্যময় অনাড়ম্বর ভাষায় নাটকীয় চরিত্র ও কথা-বার্তাগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিত। ট্র্যাজিডির দীর্ঘচ্ছন্দ কবিতাগুলি যন্ত্র-সহকারে সমবেত কণ্ঠে গীত হইত। তাহাতে গ্রীক কবিতার সাংগীতিক মূল্য বহুলাংশে বাড়িয়া যাইত।[২]

২। গ্রীক নাটকে কোরাস কেবল গানই করিত না, তাহারা নাটকের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় শ্রেণীই কোরাসে থাকিত। এদের একজন নেতা নির্দিষ্ট থাকিত। মঞ্চ হইতে কিছু নীচে মঞ্চের সামনে এরা আসন গ্রহণ করিত। সমস্ত নাট্যাভিনয় আদ্যন্ত এরা প্রত্যক্ষ করিত। কিন্তু নাটকের মূল ঘটনায় এরা খুব বেশী অংশ নিত না। যখন মঞ্চ ফাঁকা থাকিত প্রধান ব্যক্তিরা প্রস্থান করিতেন তখন কোরাস নানারূপ কথাবার্তা বলিয়া নাট্যরস সঞ্জীবিত করিয়া তুলিত। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা, দর্শকদের নাটক বুঝিতে সহায়তা করিবার জন্য নাটকের পাত্রপাত্রীদের প্রশ্ন করা, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নানা তত্ত্বের আলোচনা উপস্থাপন প্রভৃতির দ্বারা কোরাস নাটকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিত।

৮। শাশ্বত ত্রয়ী (Eternal Triangle)

পৃথিবীতে বৈচিত্র্য আছে অজস্র, কিন্তু সেই অজস্রতার মধ্যে সাহিত্যের কাহিনী রচিত হইয়াছে খুব অল্প সংখ্যক বিষয় লইয়া। George Patti নামে একজন ফরাসী সমালোচক নাটকীয় বিষয় বিশ্লেষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে নাটকীয় বিষয় ছত্রিশ প্রকারের হইতে পারে। কিন্তু এই ছত্রিশ প্রকারের বিষয়ও সর্বজনীনভাবে কাজে লাগান হয় না। সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্য রচনার মূলে যে কাহিনীটি সচরাচর লক্ষ্য করা যায়, তাহার নাম দেওয়া হয় শাশ্বত ত্রয়ী (Eternal Triangle)। কোন কাহিনীতে যখন দুইটি পুরুষ একটি নারীর জন্য অথবা দুইটি নারী একটি পুরুষের জন্য বিবাদ করে, তখন সেই তিনটি চরিত্রকে 'শাশ্বত ত্রয়ী' বলা হয়। প্রেম, ঘৃণা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি মানবীয় বৃত্তিগুলি এইরূপ কাহিনীতে প্রধান হইয়া দেখা দেয়। প্রাচীন এবং আধুনিক সকল শ্রেণীর নাট্যকারই এই শাশ্বত ত্রয়ীর আশ্রয়ে নাটক রচনা করিয়াছেন। বর্তমানে বায়স্কোপের কাহিনীতে এই শাশ্বত ত্রয়ী সর্বত্রই উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ছায়া, হেলেন ও চন্দ্রগুপ্ত এই তিনটি চরিত্র শাশ্বত ত্রয়ীর উদাহরণ।

৯। গ্রীক নাটকে নিয়তিবাদ

সাহিত্যের ধর্ম হইতেছে, যে যুগের সাহিত্য সেই যুগের চিন্তাধারাকে বহন করা। প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজিডিগুলি অনুসরণ করিলে এইরূপ একটি বিশেষ চিন্তা-মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম ও রাজনৈতিক উৎসব হইতেই গ্রীক ট্র্যাজিডিগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল। সেইজন্য কেবলমাত্র নিছক সাহিত্য হিসাবে এগুলির মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। নাটকের কাহিনী বিন্যাসের তলে তলে কাব্যময় একটা ভাবাদর্শের (Motive-এর) সন্ধান সকল ট্র্যাজিডিতেই লক্ষ্য করা যায়। এই ভাবাদর্শের সুষ্ঠুতা সম্পাদনে গ্রীক ট্র্যাজিডির সার্থকতা। গ্রীকজাতির জীবন-যাপনের যে আদর্শই থাকুক না কেন, গ্রীক ট্র্যাজিডির প্রধান ধর্ম হইতেছে নিয়তি পূজা (Worship of Destiny)। এই নিয়তি গ্রীক ট্র্যাজিডিতে অদৃশ্য শক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মানুষের কার্যাবলীতে যখন নিয়তির এই অদৃশ্য শক্তির প্রভাব অনুভূত হয়, তখন তাহার অনিবার্যতার পরিমাপক হিসাবে 'অদৃষ্টের পরিহাস' (Irony of Fate) দেখা দেয়। এই নিয়তির প্রভাব আরও নানা প্রকারে অনুভূত হইয়া থাকে। জাগতিক প্রাণীদিগের রক্ষার জন্য যে ঈশ্বরবিধান (Providence) আছে, তাহাকেও নিয়তি বলা হয়। আবার উদ্দেশ্যহীন ঘটনা-নিয়ন্ত্রণের ফলেও যখন সৌভাগ্যের (Fortune)

উদয় হয় তখন তাহাও একপ্রকার নিয়তি। নিয়তির মধ্যে একটা নৈতিক আদর্শও লক্ষ্য করা যায়। ভালই হোক আর মন্দই হোক, কোন কিছুর আধিক্য দমন করিবার জন্য নিয়তির যে শাসন তাহাকে Nemesis বলে। পাপ করিলেই যে নিয়তি শাসন করিয়া থাকে আর পুণ্য করিলে যে নিয়তি রেহাই দিয়া থাকে, ইহা ঠিক নয়। কোন কিছুর মাত্রা ছাড়াইলে নিয়তি তাহার শাসন-দণ্ড প্রয়োগ করিয়া থাকে। একটি গল্প আছে যে, Polycrates নামে একটি লোক অত্যন্ত অর্থশালী হইয়া পড়িলে নিয়তির বিধানে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। নৈতিক শাসনকে কখনও কখনও Justice (Dike) নামেও অভিহিত করা হইত। মানব-ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে নিয়তি কখনও কখনও ঈশ্বররূপেও (Deity) গৃহীত হইয়াছে। দৈববাণী (Oracle) দৈবজ্ঞের বাণী (Soothsaying) এবং ভাবী শুভাশুভের লক্ষণ (Omen) দ্বারাও নিয়তির প্রকাশ স্থিরীকৃত হইত।

এথেন্সবাসীদের মধ্যে এই নিয়তির প্রভাব পূর্ণমাত্রায় ছিল। এথেন্সবাসীরা সাধারণতঃ অতি মধুর ও হাস্যোজ্জ্বল জীবন যাপন করিত। কবিত্ব ও কল্পনায় তাহাদিগের জীবনকে স্বর্গীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এইরূপ আনন্দমুখর জীবনযাত্রার মধ্যেও একটি নিরানন্দ পটভূমিকাও ছিল। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক Moulton তাহাদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"They lived and moved and breathed in an atmosphere of fatalism, reaching beyond the gods, yet ready to emerge in the most trifling detail of experience ; wavering between kind Providence and reckless Fortune ; the eternal sanction of right, yet wearing at times the form of human passions ; revealing itself only in delusive mystery ; set in motion by a human cry, yet once aroused needing only opposition to draw out its malignant irresistibility."—(The Ancient Classical Drama).

বাঙলা সাহিত্যে এই নিয়তির প্রভাব বহু স্থানে দেখা যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার 'পদ্মাবতী' ও 'কৃষ্ণকুমারী নাটকে' গ্রীক নিয়তিবাদের প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার মেঘনাদবধে'র 'রাবণ' এই নিয়তির হাতে পড়িয়া ভাগ্যের অনিবার্য ফল ভোগ করিয়াছে। গ্রীক নিয়তিবাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে যে, নিয়তি অলক্ষ্যে থাকিয়া মনুষ্য-জীবনে ঐশীশক্তির ন্যায়বিচার, ভাগ্যের অমোঘ বিধান এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবনের আধিক্য দমনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। ভাগ্যের দুরতিক্রম্য দুরদৃষ্টের মহানাগপাশে পড়িয়া মানুষ যখন ছটফট করে এবং অনিবার্য ধ্বংসের দিকে অগ্রসর

হয়, তখন গ্রীক নিয়তিবাদের দৃষ্টিতে তাহাই মনুষ্যজীবন। মহাপুরুষদের জীবনে এই দুঃসহ নিয়তির লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু মধুসূদন সৃষ্ট রাবণ-চরিত্র ঠিক গ্রীক নিয়তির পরিপূর্ণ চিত্র নয়। গ্রীক Nemesis বলিতে যে অদৃষ্টের শাসন বুঝায় তাহাতে পূর্বজন্মের কোন সংস্কার নাই। ইহাতে এ জন্মেই পিতা হইতে আহৃত কর্মফলের শাস্তিভোগ বুঝায় (the man himself has not deserved the punishment, but he is punished for the sins of his fathers—Worsfold)। কিন্তু মেঘনাদবধের 'প্রাক্তন' কথাটির মধ্যে পূর্বজন্মের স্বীকৃতি রহিয়াছে। 'প্রাক্তনের গতি হায় কার সাধ্য রোধে'—এইরূপ উক্তির মধ্যে পূর্বজন্মের কর্মফলের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং মধুসূদন ভারতীয় জন্মান্তরবাদ এবং গ্রীক নিয়তিবাদ একত্র মিলাইয়া এই প্রাক্তন কথাটির সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার 'দৈব' বলিয়া একটি কথা আছে, যাহার প্রভাব পৌরাণিক অনেক কাহিনীতে লক্ষ্য করা যায়। দেবতার প্রতিকূলাচরণ করিয়া বা কোপে পড়িয়া অদৃষ্টের যে বিপর্যয় ঘটে, তাহাকেই 'দৈব' বলে। ইহাতে মানুষের নিজের কোন হাত নাই। 'শ্রীবৎস-চিন্তা', 'নল-দময়ন্তী' প্রভৃতি গল্পে এই দৈবের লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহাতেই পূর্বজন্মের কর্মফল কিংবা গ্রীক Nemesis-এর মত কোন কিছুর আধিক্য স্বীকার করা হয় না। দেবতাদিগের কলহের মধ্যে পড়িয়া মানুষ যখন ভাগ্য বিড়ম্বনা ভোগ করে তখন তাহাকেই বলে দৈব।

১০। সর্বজনীনতা

নাটকের কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি এবং সংলাপের পারিপাট্য থাকা সত্ত্বেও, ভাল নাটকমাত্রেই এমন একটা পরিপূর্ণতা অনুভব করা যায়, যাহাতে দর্শকের মনে এক অপূর্ব নাট্যরসের সৃষ্টি হয়। নাট্যরসের এই আনন্দানুভূতিকেই সর্বজনীনতা (Universality) বলে। এই সর্বজনীনতা বিচার করিয়া যে কোন নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব বা নিকৃষ্টত্ব নির্দেশ করা হয়। যে-নাটকে এই সর্বজনীনতার আবেদন থাকে সে-নাটক কালজয়ী হয়। কালিদাসের নাটকাবলী, শেকস্‌পীয়রের নাটক এবং রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলীতে এই সর্বজনীনতা আছে বলিয়াই সেই সকল নাটক নাট্য-রসিকদের চিত্তহরণে আজিও সমর্থ হইতেছে।

সাহিত্যের আসল কাজ হইতেছে প্রকাশ—সর্বত্র, সর্বজনের মধ্যে প্রকাশ। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই আসল প্রকাশ। এই সত্য প্রকাশই হইতেছে অসীমের স্বাদ। চিত্রকর ছবি আঁকিতে বসিয়াছেন, কিন্তু তিনি তথ্য প্রকাশের জন্য বসেন নাই, তিনি বসিয়াছেন সত্য প্রকাশ করিতে। তথ্যকে

তিনি ততটুকু স্বীকার করেন, যতটুকু না হইলে তিনি সত্যের আনন্দ পান না। এই আনন্দ পাওয়াকেই বলে সাহিত্যের সর্বজনীনতা। আমরা তাহাকেই সাহিত্য বা ললিতকলা বলি যাহার মধ্যে আছে উপলব্ধির এই সর্বজনীন আনন্দ।

সত্যবোধের মধ্যে আছে পূর্ণতা। সাহিত্যে এই পূর্ণতা সৃষ্টি করা তত সহজ নয়। সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইতেছে বিচিত্র মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র। এই মানবহৃদয় ও মানবচরিত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইহার অনেক অংশ, অনেক স্তর। এই সব বিক্ষিপ্ত অংশকে পূর্ণতা দেওয়া অসাধারণ প্রতিভার কাজ। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, শেকস্‌পীয়র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সামান্য কয়েকজন মাত্র এই কার্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

কিন্তু একটা প্রশ্ন এখানে হয়তো অনেকের মনে জাগিতে পারে। সে প্রশ্ন হইতেছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি দুঃখময় কেন? কালিদাসের 'শকুন্তলা', ভবভূতির 'উত্তররাম-চরিত', শেকস্‌পীয়রের 'ওথেলো', 'জুলিয়াস সীজর', 'ম্যাকবেথ', 'হ্যামলেট' প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নাটকগুলি সবই করুণ সুরে ছন্দিত কেন? আনন্দবিতরণই যদি সাহিত্যের মূল কার্য হয়, তবে এই দুঃখময় নাটকগুলি সর্বজনীনতার কোঠায় উঠিল কিরূপে? ইহার উত্তর এইরূপ হইতে পারে, সাহিত্যের শেষ কথা আনন্দ। কিরূপে সেই আনন্দকে পাওয়া যায় সে কথা সাহিত্যের পক্ষে গৌণ। বিশ্বের অনেক উপেক্ষিতের মধ্যে, অনেক বেদনার মধ্যে মন আপনাকে খুঁজিয়া পায়। নিবিড় বোধের দ্বারা পাওয়া যায় সুন্দরকে, আনন্দকে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন,—

"চারিদিকের রসহীনতায় আমাদের চৈতন্যে যখন সাড় থাকে না তখন সেই অস্পষ্টতা দুঃখকর। তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান। আমি যে আমি, এইটে খুব ক'রে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ। যখন সামনে বা চারিদিকে এমন কিছু থাকে যার সম্বন্ধে উদাসীন নই, যার উপলব্ধি আমার চৈতন্যকে উদ্বোধিত ক'রে রাখে তার আস্বাদনে আপনাকে নিবিড় ক'রে পাই। এইটের অভাবে অবসাদ। বস্তুতঃ মন নাস্তিকত্বের দিকে যতই যায় ততই তার দুঃখ। দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক, কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখ আমাদের স্পষ্ট ক'রে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না। গভীর দুঃখ ভূমা, ট্র্যাজিডির মধ্যে সেই ভূমা আছে, সেই ভূমৈব সুখং। মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় ব'লে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল এবং বহুল করবার জন্য এদের না পেলে তার স্বভাব

বঞ্চিত হয়। আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আটে উপভোগ করছে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি। রামলীলায় মানুষ যোগ দিয়ে যায় খুশি হয়ে, লীলা যদি না হোত তবে বুক যেত ফেটে।"

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টিতে থাকে এক অসামান্যতা। সেইজন্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি সাধারণ বাস্তব চরিত্রগুলির সহিত তুলনীয় নয়। এই অসামান্যতার ফলে চরিত্রগুলি চিরন্তন হইয়া ওঠে। নারীজাতির কথা মনে হইলে, মনে পড়ে লক্ষ্মী ও উর্বশীর কথা। ইহারা সমগ্র বিশ্বের নারীজাতির প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথ এই দুই শ্রেণীর একটিকে বলিয়াছেন মায়ের জাত, অপরটিকে বলিয়াছেন প্রিয়ার জাত। যে কোন শ্রেষ্ঠ নাটকে স্ত্রী-চরিত্র বিচারের কালে এই দুই প্রকার নারীর সহিত পরিচয় ঘটে। ভ্রমর ও রোহিণী আমাদের নিকট যত পরিচিত, আমাদের ঘরের পরিজনেরা তত পরিচিত নয়। ইহার কারণ, ইহারা কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়, ইহারা দুইটি বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত স্ত্রীজাতির প্রতিনিধি। সাজাহান ও চাণক্য—এই দুইটি চরিত্রের সার্থকতাও অসামান্যতায়। একজন ভারতের মহামহিমান্বিত সম্রাট, অপরজন প্রাচীন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ইহা তাঁহাদের আসল রূপ নয়, ইহা তাঁহাদের বাহিরের রূপ। সম্রাট সাজাহানের আসল রূপ তাঁহার রাজমহিমার মধ্যে নাই, মানুষ হিসাবে তাঁহার আসল রূপ রহিয়াছে স্নেহে, প্রেমে, মহত্ত্বে। আর ব্রাহ্মণ চাণক্য বুঝিয়াছিলেন যে হৃদয়কে ফাঁকি দিয়া মস্তিষ্ককে বড় করার নাম মনুষ্যত্ব নয়। এই বোধই চাণক্যের আসল রূপ। এই সমষ্টিগত সর্বজনীন রূপই সাহিত্যের একটি বিশেষ লক্ষণ। এই বিশেষ গুণের ফলেই সাহিত্য সামান্য হইতে অসামান্য হইয়া ওঠে।

১১। হাস্যরস

অসংগতির আঘাত বা দুঃখ যখন মানুষের মনের অনতিগভীর স্তরে পৌঁছিয়া সহানুভূতির সৃষ্টি করে, তখনই হাস্যরসের উদ্ভব হয়। তোৎলামি, খঞ্জতা, কপটতা, মিথ্যাদম্ভ ইত্যাদি আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে। মোটা লোকের পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাওয়া, গলায় বোতাম লাগাইয়া খোঁজা, কানে কলম গুঁজিয়া সারা বাড়ি অনুসন্ধান করা ইত্যাদি ব্যাপারে না হাসিয়া থাকা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাগুলি আমাদের নিকট আনন্দের ব্যাপার হইলেও ইহার মধ্যে সামান্য দুঃখও থাকে। মানুষের জীবনের অসংগতি ও অস্বাভাবিক ভাব দেখিলেই আমাদের মনে প্রথমে দুঃখ উপস্থিত হয়। সেই দুঃখ সহানুভূতিতে পরিণত হইলেই হাসির উৎপত্তি হয়। সুতরাং অসংগতির

আঘাতজনিত সহানুভূতিই হাস্যরসের প্রধান উপাদান। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে হাস্যরসের উৎপত্তির কারণ দিয়াছেন এইরূপ,—

"হাস্যরসের ব্যাপার প্রয়োজন-সম্বন্ধ-বিরহিত ও ভাব-প্রবৃত্তি প্রভৃতির সহিতও সম্পর্কশূন্য। আকস্মিকতা, অসম্ভাব্যের সম্ভাব্যতা, আত্মপ্রসাদ এবং গর্ব কৌতুকহাস্যের হেতু। কুব্জ ও ন্যুব্জ দেহের প্রতিবিম্ব দর্পণে বিকৃত হইয়া পড়িতে দেখিলে তাহার আকস্মিকতা ও অস্বাভাবিকতা আমাদের হাস্য উদ্রেক করে। হাস্যরসের মধ্যে একটি অসংগতি ও বৈপরীত্য থাকা আবশ্যক; যখন কোন ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে কিছু আমরা আশা করি, তখন যদি আমাদের মনোযোগ তাহার দেহের সম্বন্ধে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে আমাদের হাসি আসে। ভাঁড়ামি ও বিদূষকের রঙ্গ ইচ্ছাকৃত অসংগতি বলিয়া হাস্যরসের কারণ হয়।…যখন আমরা কোন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তিকে খেমটা নাচিতে দেখি তখন হাসি পায়।"

হাসিমাত্রেই সমাজগত এবং কোন বিশেষ ব্যক্তির বা শ্রেণীর সৃষ্টি-ছাড়া খেয়ালের বিরুদ্ধে ইহা মূলতঃ সমগ্র সমাজের নিন্দাবাক্য। M. Bergson তাঁহার সুবিখ্যাত Laughter গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

"All laughter is social in character and it is fundamentally the reproof of a particular society to any eccentricity on the part of a single person or of a special class."

হাস্যরসের মধ্যে একটা পরপীড়নেচ্ছাও লুক্কায়িত থাকে। বোকা লোককে নানা প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া অথবা কোন লোকের কোন বিষয়ের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া আমরা যে হাসিয়া থাকি, তাহাতে পীড়নের ভাবই অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে উৎসাহ, বিস্ময় প্রভৃতি নয়টি স্থায়িভাব আছে। হাস এই নয়টি স্থায়িভাবের অন্যতম। অস্বাভাবিক আকার, কার্য, বাক্য বা বেশভূষাদি দর্শনে চিত্তে যে প্রসন্নতা-সমন্বিত অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাকে হাস বলা হয়। এই হাসই বিভবাদি সহযোগে হাস্যরসে পরিণত হয়। বিকৃত উচ্চারণের দ্বারা সহজেই হাস্যরসের উদ্রেক হয়, এমন দুইটি উদাহরণ এখানে দিলাম।

(১) কেনারাম। আপনি ইংরাজি পড়েছেন?

রামমাণিক্য। পড়্‌চি, বোরো গোলমাল ঠ্যাহে।

কেনা। কেন?

রাম। মর্দাগোর পেরনাউনে (Pronoun) হি, হিজ, হিম অইচে; মাইয়াগোর নামে শি, হার্, হার্ কইচে; যদি মর্দাগোর হি, হিজ, হিম্ অইল, তবে মাইয়াগোর শি, শিজ, শিম্ অইবে না ক্যান্?

নিমচাঁদ। আর কি ?

রাম। আর এই হালার পুত্ 'কোম্' (Come), এংরাজির কোম্ডা যে দিহি দেইচো সে দিহি লাগ্‌চে, কোম্ আইবারও অয়, কোম্ যাইবারও অয়। আমাগোর মাস্টের বঙ্গোচন্দ্র বলেন,·· কোম্ আহেন্‌ও, যান্‌ও আর কহন কহন থাহেন্।—(দীনবন্ধু মিত্র)

(২) "ও পিসি এদিকে এসো"—এই শব্দগুলো ইংরাজিতে লিখিতে হইলে উচিতমতো লেখা উচিত—O pc adk so. পিসি যদি বলেন 'এসেছি'—তবে লেখো She—আর পিসি যদি বলেন 'এইচি' তবে আরও সংক্ষেপে He. কিন্তু কোন ইংরেজের পিসির সাধ্য নাই এরূপ বানান বুঝিয়া উঠে। আমাদের কখগঘ-র কোনো বালাই নাই—তাহাদের কথার নড়চড় হয় না। —(রবীন্দ্রনাথ)

ইংরেজিতে হাস্যরস বুঝাইবার অনেকগুলি শব্দ আছে—Wit, Humour, Fun, Satire, Irony, Sarcasm, Pun, Lampoon, Comic প্রভৃতি। এই সকল শব্দে হাস্যরসের এক একটি প্রকারভেদ বুঝিতে পারা যায়। বাঙলাতেও কয়েকটি শব্দ আছে—যেমন ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, আমোদ, কৌতুক, বক্রোক্তি, রঙ্গরস প্রভৃতি, কিন্তু এ-গুলি ঠিক ইংরেজির প্রতিশব্দ নয়। এ-গুলি বাঙলার নিজস্ব ভাব-প্রকাশক শব্দ।

হাস্যরসের এই বিচিত্র ধারা সকল নাটকের মধ্যেই অল্প-বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া কমেডিতে ব্যঙ্গ-কৌতুক ও শ্লেষ না থাকিলে একেবারেই চলে না। প্রহসনতো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ লইয়াই প্রধানতঃ গঠিত হয়। ট্র্যাজিডিতেও একটি নির্মল এবং প্রশান্ত ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। কোনো গুরুগম্ভীর বিষয় আলোচনার সময় চিত্তের প্রশান্তির জন্য যে হাস্যোদ্রেকের প্রয়োজন হয়, ইংরেজিতে তাহাকে Comic relief বা Dramatic relief বলে। এই রঙ্গরসের প্রয়োগ কোন কোন স্থলে তীব্র, আবার কোন কোন স্থলে মধুর হইয়া থাকে।

Wit বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি বুদ্ধির লীলা বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। ইহাতে সামান্যমাত্র পীড়ন থাকে। ইহা অতর্কিতে মানুষের মনকে ধাঁধাইয়া তোলে। ইহার সৃষ্টিকর্তা পরকে হাসায়, কিন্তু নিজে হাসে না। ইহা এক মুহূর্ত স্থায়ী আতসবাজীর সহিত তুলনীয়। ইহার পরমাশ্চর্য বিস্ময়ের মধ্যে হৃদয়গত কোন গভীর আলোড়নের স্পন্দন অনুভূত হয় না। কিন্তু Humour-এ সহজ, সরল, হাস্যরসের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ পায়। ইহা দর্শকের মনে প্রীতি ও করুণার সঞ্চার করে, দারিদ্র্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে মনকে সজাগ করিয়া তোলে এবং অসত্য, শঠতা ও ছলনার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করে। ইহার অন্তরে একটি কল্যাণকর আবেদন লুক্কায়িত থাকে।

ইংরেজির Pun শব্দটি আমাদের প্রাচীন কাব্যের 'শ্লেষ' 'যমক' ইত্যাদি অলংকারের পর্যায়ে পড়ে। কথার ধ্বনি আর অর্থ লইয়া এই Pun-এর খেলা। একটা উদাহরণ দিই। অমৃতলাল বসুর 'যাজ্ঞসেনী' নাটকে আছে—

নাগরক। তোমরা কি বাক্‌জীব—ভাঁড় ?

হিরণ্য। হাঁ নাগরক বাবা, ভাঁড় বটে—তবে ফুটো, একদিক দিয়ে জল ঢাল্‌লে, আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

এখানে 'ভাঁড়' কথাটির দুইটি অর্থ, এবং ভাঁড় কথাটির উপরই Pun করা হইয়াছে। আবার অতি সহজ সরলভাবে একজন আর একজনকে যখন হাস্যোদ্দীপক বাক্যের দ্বারা তাহার আনন্দের ভাগী করেন, তখন Fun-এর সৃষ্টি হয়। Irony-র মধ্যে একটা বক্রোক্তি থাকে অর্থাৎ অসাধুকে 'সাধু' বলিলে যদি দর্শক তাহাকে অসাধু বলিয়া বুঝিতে পারেন তবে তাহাই বক্রোক্তি। Satire এবং Sarcasm-এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড আঘাত সৃষ্টি করিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিবার প্রচেষ্টা থাকে। কাহারও নামে তীব্র শ্লেষাত্মক রচনা লেখাকে Lampoon বলে। আমোদ ও কৌতুক সুখাবহ দুঃখ। "কৌতুক চেতনাকে পীড়ন করে—আমোদও তাই। এইজন্য প্রকৃত আনন্দের প্রকাশ স্মিতহাস্যে এবং আমোদ ও কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্যে।" কৌতুক ও কৌতূহলের মধ্যে নূতনত্বের লালসা আছে। কৌতূহল জিনিসটা অনেক স্থলে নিষ্ঠুর, কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে।

নাটকে হাস্যরস সৃষ্টি করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। নিম্নশ্রেণীর লেখকের হাতে পড়িলে হাস্যরস অশ্লীলতায় পরিণত হয়। একটি মাতালের চিত্র আঁকিতে গিয়া নাট্যকার তাহার মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষামূলক হাস্যরস পরিবেশন করিতে পারেন, আবার আদর্শচ্যুত হইলে তাহা পাঠকের বা দর্শকের ধৈর্য্যচ্যুতিও ঘটাইতে পারে। উচ্চ আদর্শের হাস্যরস মানুষের নৈতিক চরিত্র-গঠনে ও পাপবিমুখতার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে। বাঙলা নাটকে অধিকাংশস্থলে হাস্যরস উন্নত আদর্শ পায় নাই। তাই নিম্নস্তরের ঠাট্টা, পরের কুৎসা, ভাঁড়ামি প্রভৃতির সাহায্যে হাস্যোদ্রেক করাই নাট্যকারদের কলা-কৌশল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য পরশুরামের 'চিকিৎসা-সংকট' বা রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলী এই পর্যায়ের অন্তর্গত নয়।

বাঙলা নাটকের অনেক স্থলে হাস্যরস শুধু কৌতুকসৃষ্টির জন্য প্রয়োগ করা হয় না, তাহার মধ্যে একটু ধর্মভাবও মিশাইয়া দেওয়া হয়। গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকের বিদূষক চরিত্র ঠিক এই ধরনের। এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটকে Court-Jester এবং Fool বা Comic-buffoon—এই দুই শ্রেণীর হাস্যরসিকের পরিচয় পাওয়া যায়। Court-Jester সাধারণতঃ

চতুর ও শিক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু Fool নিম্নশ্রেণীর জীব। ভাঁড়ামি করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করাই তাহাদিগের ব্যবসা। 'সাজাহান' নাটকের 'দিলদার' চরিত্র এই Court-Jester এবং Fool-এর সম্মিলিত সংস্করণ।

বাঙালীর জীবনে হাসি নাই বলিয়া বাঙলা নাটকে নিছক হাসির উপাদান খুবই কম। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা'—কবির এই উক্তি সে-যুগে সত্য হইলেও, এ-যুগে সত্য কিনা সন্দেহ! এ-যুগের একজন বিখ্যাত কবি বাঙালীর এই নিরানন্দ ভাব দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন,—

"সমগ্র জীব-সৃষ্টির মধ্যে হাসিবার অধিকার মানুষের একচেটিয়া; অন্য কোনও জন্তু হাসিতে পারে, এ-পর্যন্ত জানা যায় নাই। আমরা সেই মানুষের অধিকার পরিত্যাগ করিয়া, গাম্ভীর্যের ও পাণ্ডিত্যের অনুরোধে, পশু-প্রকৃতির অনুসরণ করিব কেন?"—

(বিজয়চন্দ্র মজুমদার)

১২। নৃত্য

নৃত্যে মানুষের মনের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের অদৃশ্য সত্তাকে বাহিরে টানিয়া আনে নৃত্যের ছন্দ-জাগরণী। শিবের 'তাণ্ডব' ও পার্বতীর 'লাস্য'—এই উভয়বিধ নৃত্যের অন্তরে আছে পুরুষ ও প্রকৃতির ভাব-সম্মেলন বা ভোগ ও ত্যাগের অখণ্ড যোগাযোগ। এই অখণ্ডতাই সংসারে সকল বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সম্পূর্ণতা আনিয়া দেয়।

বৈদিক-যুগে দেবতার আরতি ও সোমরস প্রস্তুতকালে নৃত্য হইত। পৌরাণিক ও বৌদ্ধযুগে নৃত্য ছিল শিক্ষার অঙ্গ। গুপ্তযুগে নৃত্যের যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায়। সাঁচী, ওঁকারধাম, বড়বুদ্ধ, অজন্তা, ইলোরা, কাঞ্চী, কোনারক, এলিফ্যাণ্টর প্রভৃতি মন্দির ও পর্বতগাত্রে সেকালের নৃত্যভঙ্গির অসংখ্য নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক-কালেও নৃত্যশিল্প একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। গুজরাট, বাঙলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক-নৃত্যে ইহার অস্তিত্ব এখনও বজায় আছে। কবি বালাতোল, গুরু নম্বুদ্রী, উদয়শংকর, আচার্য কেলু নায়ার, মেনকা, সাধনা বসু, বালা সরস্বতী প্রভৃতি নৃত্যশিল্পীরা প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যের শিল্প-সুষমাকে এখনও সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন।

ভারতীয় নৃত্যের নৃত্যছন্দে ভারতীয় মানসের অন্তর-সৌন্দর্য ও জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। নৃত্যের তালে তালে ফুটিয়া ওঠে সৌন্দর্য-লোকের শ্বেত শতদল। সত্যের অমৃতরূপ, আনন্দরূপ ব্যক্ত হয় নৃত্যভারতীয় কলায়।

এইখানেই ইউরোপীয় কল্পকলার সহিত ভারতীয় কল্পকলার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক Havell বলিয়াছেন,—

"The whole of modern European academic art-teaching has been based upon the unphilosophic theory that beauty is a quality which is inherent in certain aspects of matter or form...Indian thought takes a much wider, a more profound and comprehensive view of Indian art. Beauty, says the Indian artist, is subjective, not objective. It is not inherent in form or matter; it belongs to spirit, and can only be apprehended by spiritual vision."—

এই অন্তর-সৌন্দর্যের প্রাচুর্য থাকায় ভারতীয় নৃত্য ললিতকলার অন্তর্গত।

আমাদের দেশে বর্তমানে যে নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়— (১) দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য, (২) মণিপুরী নৃত্য ও (৩) উত্তর ভারতীয় নৃত্য। এই তিনটি প্রধান শাখা ছাড়াও সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া গ্রাম্যলোক ও অনার্যদের মধ্যে নানাপ্রকার নৃত্যরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাকে লোকনৃত্য বলে। এ-গুলি ক্রমেই হারাইয়া যাইতেছে। এখনও দেবতার উৎসবে এবং নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে ইহাদের মুমূর্ষু রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই লোকনৃত্যকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাহিরে নানাস্থানে নৃত্যাভিনয়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-তালিকায় ইহা আবশ্যিক শিক্ষারূপে গৃহীত হইয়াছে।

বাঙলা দেশেও বর্তমানে কতকগুলি নৃত্যবিদ্যা-শিক্ষালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে বাঙলার বাহিরে আলমোড়া পাহাড়ের উপর উদয়শংকর যে নৃত্যবিত্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহার প্রতি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে আমাদের দেশে যোদ্ধা ও লাঠিয়ালেরা নানারূপ লোকনৃত্য করিতেন। স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় 'রায় বেঁশে', 'ঢালি', 'কাঠি' প্রভৃতি ব্রতচারী নৃত্য প্রচলিত হইয়াছে।

এখন ভারতের তিনটি নৃত্য-শাখার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক। দক্ষিণ-ভারতীয় নৃত্য অতি প্রাচীন। ইহার প্রভাব ভারতবর্ষ ছাড়াও যবদ্বীপ, ভারত-চীন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, চীন এবং জাপানেও প্রসারিত হইয়াছিল। পাঁচটি রসের দ্বারা (যথা—বাৎসল্য, সখ্য, মধুর, রৌদ্র ও বীর) সাধারণতঃ দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের আনন্দ পরিবেশনের রীতি আছে। 'মুদ্রা'র দ্বারা নৃত্যের অর্থ বুঝান হইয়া থাকে। করাঙ্গুলি-বিন্যাসকেই নৃত্য-শাস্ত্রের ভাষায়

'মুদ্রা' বলে। রামায়ণ ও মহাভারত হইতে দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের ভাব সংগৃহীত হয়। এই প্রাচীন নৃত্যের নিদর্শন এখনও মালাবারের 'কথাকলি' নৃত্যের মধ্যে দেখা যায়। এই নৃত্যের প্রধান সহায় ইহার অপূর্ব ছন্দলীলা। এই ছন্দলীলায় দেহের প্রতি অঙ্গভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে কথা বলে। শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

"I have seen a South Indian dancer acting the part of a deer, at the same time as he was representing the character of the hunter. When taking the part of the deer he had not only transformed his soul into that of a gazelle, but even his ears, his eyes—until every movement of his body was describing to the inner tragedy of the poor creature threatened by the hunter in the forest."—(The Dance in India.)

'মণিপুরী নৃত্যে' বাঙলার প্রাচীন গীতিময় সাহিত্য এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মণিপুরবাসীরা বৈষ্ণব, এই নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদিগের দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই নৃত্যের সঙ্গে যে সংগীত যোজনা করা হয়, তাহা 'কীর্তন'। 'মণিপুরী নৃত্যে' রাধাকৃষ্ণের যে প্রেমলীলা বর্ণিত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়জ প্রেম নয়, তাহা অতীন্দ্রিয় প্রেম। প্রকৃতির অন্তরের অনন্ত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করাতেই ইহার কৃতিত্ব।

উত্তর ভারতীয় নৃত্য হিন্দু ও মুসলমানী নৃত্যের সংমিশ্রণে গঠিত। পারস্যদেশের নৃত্য হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া ইহা আকবরের রাজত্ব-কালে মূর্তি পরিগ্রহ করে। ইহার স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবেদনের জন্য ইহা কোনদিনই ভারতীয় শিক্ষিত মনের উপর তেমন রেখাপাত করিতে পারে নাই। ইহা নগর-নর্তকী বা বাঈজীদের ব্যবসারের সহায়রূপে প্রসার লাভ করিয়াছে।[৩]

৩। নাটকে সাধারণত চিত্তবিনোদনের জন্যই নৃত্যের আয়োজন করা হয়। নৃত্যের দ্বারা দর্শকচিত্তকে লঘু আমোদে ভরিয়া তোলা হয়। ট্র্যাজেডি অপেক্ষা কমেডি নাটকেই এ ধরনের নৃত্যের অবতারণা সমধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে নৃত্যকে নাটকীয় দ্বন্দ্বের সঙ্গে গভীরভাবে অন্বিত করিবার প্রয়াসও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ইবসেনের 'এ ডলস্ হাউস' নাটকে নোরার টেরেন্টেলা নাচ তার তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছে। তার নাচ দেখিয়া হেলমার বলিয়াছে—"এ নাচের উপর তোমার জীবন মরণ নির্ভর করছে নাকি?" উত্তরে নোরা বলেছে, "হ্যাঁ করছেই তো।" সত্যি সত্যি নোরা হেলমারকে চিঠির বাক্সের কাছে না যাইবার জন্য তাঁহাকে বাধা দিয়া ঐরূপ নাচ নাচিয়াছিল।

১৩। সংগীত

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে"—অর্থাৎ সঙ্গীত বলিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে বুঝায়। বর্তমানে সংগীত বলিতে আমরা শুধু কণ্ঠ-সংগীতকেই বুঝিয়া থাকি। প্রাচীন ভারতে নাট্য-শালাকে সংগীতশালা বলিত। সংগীত হইতেই ছন্দের উৎপত্তি। এই সংগীতই মানবমনের আদি ভাষা। সরস্বতী এই সংগীতের দেবী। গির্, বাক্ ও বাণীর সমন্বয়ে বীণাপাণি। 'বাক্' প্রকাশের পূর্ববর্তী অবস্থার নাম 'গির্'। অরণ্যচারী পশুপক্ষী এখনও এই অবস্থায় আছে, মানুষও একদিন এই অবস্থায় ছিল। ক্রমে বাক্-দেবী বীণাপাণি মনুষ্যের ভাব ও জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া মূক প্রকৃতির মধ্যে বাণীরূপে মানব-সভ্যতার আদিধাত্রীরূপে প্রকটিত হইলেন। উহার পর হইতে সংগীত আত্মজাগরণ লাভ করিয়া বিভিন্ন ধারায় প্রমূর্ত হইল। গন্ধর্ববেদই সংগীত-শাস্ত্রের মূল। ভরতমুনি উহা প্রণয়ন করেন। গন্ধর্বগণ স্বর্গপুরীতে গীত ও বাদ্য করিত, আর অপ্সরাগণ নৃত্য করিত।

ভারতীয় সংগীত অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। ইহার দুইটি বিভাগ—(১) রাগসংগীত বা মার্গসংগীত, (২) লোক-সংগীত বা দেশীসংগীত। রাগসংগীত অত্যন্ত প্রাচীন, ধ্রুপদসংগীত এই বিভাগেরই অন্তর্গত। খেয়ালসংগীত সৃষ্টি করেন আলাউদ্দিন খিলজির সভাগায়ক সংগীতবিদ্ আমির খস্রু; কিন্তু ওস্তাদমহলে অন্ত্যজজ্ঞানে ইহার প্রবেশাধিকার অনেকদিন পর্যন্ত ছিল না। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহের সভাগায়ক সদারঙ্গের চেষ্টায় খেয়ালসংগীত রাগসংগীতের একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। পাঞ্জাবের শোরী ও লক্ষ্মৌয়ের কদরপিয়া যথাক্রমে টপ্পা ও ঠুংরির প্রবর্তক। অপেক্ষাকৃত চটুল সুর হইলেও ইহাকে ক্রমে রাগসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

লোকসংগীতের মধ্যে একটা সহজ সুরের আবহাওয়া দেখা যায়। পল্লী-অঞ্চলের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পটভূমিকায় ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য নানা স্থানিক বৈশিষ্ট্য ইহার বিশেষ রূপের সৃষ্টি করিয়াছে। গুজরাটে মাঁঢ় ও গর্‌বা; বিহারে বিহারী; উত্তর ভারতে নাত্, দেহাতিধূন, গজল; বাঙলায় বাউল, ভাটিয়ালি, কীর্তন, ঝুমুর, সারি, জারি, মারফতি, দেহতত্ত্ব, রামপ্রসাদী, মালসি, মানশিক্ষা, কবি, তরজা, পাঁচালী, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি ঢঙের গান এই বিভাগের অন্তর্গত। এ-ছাড়া মধ্যযুগীয় সাধকদের পোষকতায় এক শ্রেণীর ভগবদ্ভাবমূলক গান মুখ্যতঃ উত্তর ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছিল, যাহাকে 'ভজন' বলা হয়। মীরাবাঈ এইরূপ কতকগুলি ভজন গান লিখিয়া সারা ভারতের সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন।

বর্তমানে রাগসংগীত ও লোকসংগীতের সমন্বয়ে এক নূতন শ্রেণীর 'আধুনিক সংগীত' গড়িয়া উঠিতেছে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই সমন্বয়ের পূর্ণতার উপর ভারতীয় সংগীতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। বাঙলাদেশে অনেক-দিন হইতে এই প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং রবীন্দ্রনাথই এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক। রবীন্দ্রনাথ রাগসংগীতের কাঠামোতে লোকসংগীতের যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাতে সংগীত-রসিকমাত্রেই বিস্মিত হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায়ই বাউল ও ভাটিয়ালি শিক্ষিত সমাজে উচ্চ আসন পাইয়াছে।

বাঙলাদেশ গানের দেশ। চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রামপ্রসাদ, রামনিধি গুপ্ত, দাশরথি রায় প্রভৃতির গানে বাঙালীর প্রাণ নৃত্য করিত। নানা নূতন নূতন ভাব ও প্রেরণার সংস্পর্শে বাঙলা গানে জোয়ার আসিয়াছিল। নীলপূজার ও চড়কের গাজনে বৌদ্ধ ও নাথ-যোগীদের প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। পাঁচালী, কীর্তন, কবি, আগমনী প্রভৃতি নানা ধর্মমতের আশ্রয়ে লালিত ও পালিত হইয়াছিল। বাই, খেমটা, তরজা, ঝুমুর, টপ্পা সংগীতে মুসলমান সমাজের দান বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি গান লিখিয়া এককালে যথেষ্ট নাম কিনিয়াছিলেন। তাঁহার গানগুলির অধিকাংশই তাঁহার রচিত নাটকের অন্তর্গত। সে-গুলি নাটকীয় সংস্থান, নাটকীয় চরিত্র এবং নাটকীয় হাবভাবে রচনা করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র প্রেম-সংগীত ও আধ্যাত্মিক সংগীত রচনায় সমান পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক সংগীতের মধ্যে শ্যামা-সংগীত, শিব-সংগীত, কৃষ্ণ-সংগীত, রামগীতি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কয়েকটি হিন্দুস্থানী ভজনের অনুরূপ সংগীতও রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিতে অনেক উৎকৃষ্ট গান আছে। সে-গুলি প্রেম-সংগীত, স্বদেশপ্রেমমূলক-সংগীত, নৃত্য-সংগীত এবং হাসির গান এই চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই চারি শ্রেণীর সংগীত রচনায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেম-সংগীতগুলি নির্দোষ, লালসা-বর্জিত; স্বদেশপ্রেমমূলক সংগীতগুলি দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত; নৃত্যসংগীত-গুলির অধিকাংশই স্বভাব-বর্ণনাবিষয়ক; হাসির গানগুলি সামাজিক জীবনের অসংগতি ও বৈসাদৃশ্যের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের নিজস্বভঙ্গি ও তাঁহার সুরের নূতনত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয়বিধ সংগীতেই বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি কোন কোন স্থলে ভারতীয় সুরে পাশ্চাত্য সংগীতের ভঙ্গি যোজনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি উভয় দেশের সংগীতের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

"একটি যেন রাজপথে নির্ভয় স্বাধীনগতি, স্বাবলম্বা, বিংশতি বর্ষীয়া সুকুমারী ইংরেজ মহিলা; অপরটি যেন গৃহপ্রাঙ্গণে সশঙ্কগতি গৃহ-

প্রবেশোদ্যতা ষোড়শী সুন্দরী বঙ্গবধূ···একটি আশাময়ী উন্মুখী সূর্যমুখী, অপরটি যেন সভয়া বিনত-নয়না অপরাজিতা। একটি হাস্য, অপরটি বিলাপ।”

দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতা লিখিয়া সুর সংযোগ করিতেন না, তিনি সুরটি মনের মধ্যে ভাঁজিয়া লইয়া তবে একটি গীত রচনা করিতেন। তিনি বুঝিতেন সংগীতের সুরই সার, কথাগুলি বহিরবয়ব। প্রকৃত গান সুরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার কথাগুলি প্রাণহীন কঙ্কালে পরিণত হয়। সেই সুর তিনি বিদেশ হইতে গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বাঙলা সংগীতে এই বিলেতি চালের জন্য অনেকে দ্বিজেন্দ্রলালের তীব্র নিন্দাও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দেশী-বিলেতি সুরের নিগূঢ় মিলনে যে নবযুগের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে বাঙলা গানের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বপক্ষে একটি সুন্দর যুক্তি দিয়াছিলেন,—

“দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজী সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাঁকে হিন্দু সংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু-সংগীতে বিদেশী সোনারকাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয় তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিন্দু-সংগীত বলে কোনো পদার্থ যদি থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দু-সংগীতের কোন ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড় করেই পাবে।”

পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথও এমনি একটা মিলনের মধ্যেই বাঙলা গানে আধুনিক যুগের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি হিন্দি গানের গঠন-প্রণালীর মধ্যেই বাঙলা গানের নূতন রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ণাঙ্গ গানে অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, রাগ-রাগিনী ও তাল বজায় রাখিয়াও তিনি অনেক সময় তাহার ভিতরে মিশ্রণকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী-চৌধুরানীর ভাষায় বলি:—“তিনি ‘আছে দুঃখ আছে মৃত্যু’—গানে ভৈরোঁ (টোড়ি?) ও বিভাস মিশিয়ে, বাঘে-গরুকে একঘাটে জল খাইয়ে, বর্ণ-সংকরের চূড়ান্ত খেলা দেখিয়েছেন।” মিশ্ররাগ ভারতীয় সংগীত-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ না হইলেও, শুচিবায়ুগ্রস্তেরা ইহাকে সহ্য করিতে পারেন না। এ-সম্বন্ধে শ্রীধূর্জটি মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—

“আমাদের সংগীত একটি অচলায়তন নয়; তাতে কোনপ্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নেই, তার ইতিহাস আছে, গতি আছে, অভিব্যক্তি আছে, পরিণতি আছে। এই মূল কথাটি প্রত্যেক সমালোচক, শিক্ষার্থী ও রস-পিপাসুর জানা উচিত, জানলেই রবীন্দ্রনাথের সংগীতের উপর শ্রদ্ধা আসবে।”

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় কীর্তি তিনি তাঁহার গানের মধ্যে গীতরসকে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই গীতরস এমন একটা জিনিস, যাহা কেবল কথার মধ্যে পাওয়া যায় না, আবার সুরের মধ্যেও পাওয়া যায় না। সুর এবং কথার মিলনেই ইহার জন্ম। সুরই প্রধান এবং কথা বহিরবয়ব, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ মানিতেন না। গানের রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সহজিয়াপন্থী। যাহা অন্তরকে সহজভাবে স্পর্শ করিয়াছে তাহাকেই তিনি মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার গানে সৃষ্টির সম্পূর্ণতা যতখানি আছে, এমন আর কোন রচয়িতার গানে নাই। গানের রূপকে তিনি উপযুক্ত সুরের রূপ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাহা সম্পূর্ণ। তাঁহার গান কেবল কথার তান বা ভাবের বিলাস নয়। তাঁহার গান তাঁহার এক একটি চিত্তবৃত্তির প্রকাশ।

"তাঁর কাছে সুর ও কথা একত্রে আসে, হরগৌরীর মতন। হরকে গৌরী থেকে বিচ্ছিন্ন করলে হরকে পিশাচ এবং গৌরীকে শীর্ণা ব'লে ভ্রম হয়। সুর ও ভাবার্থক কথার মিলনের রূপ এবং সে-রূপ তাঁর অন্তরের সত্তায় বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ।"

অনেকে মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া অত্যন্ত সহজ। কিন্তু সে-কথা ঠিক নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের গানে যে সূক্ষ্ম মিড় এবং মাধুর্য আছে, সে-গুলি সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে না পারিলে, রবীন্দ্র-সংগীতের অর্ধেক সৌন্দর্য মাঠে মারা যায়। সেইজন্য গানের জলসায় ও সভা-সমিতিতে রবীন্দ্রনাথের যে সব সংগীত নানাজনের মুখে গাহিতে শোনা যায়, সে-গুলির অধিকাংশই বিরক্তি উৎপাদন করে। অনেকে আবার রবীন্দ্রনাথের গান ওস্তাদি গানের অপেক্ষা নিচু স্তরের বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী গানের বিপক্ষে গিয়া তাঁহার গানের এই সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। এখানে শ্রীধূর্জটিপ্রসাদের আর একটি উক্তি তুলিলেই কথাটা পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

"তিনি হিন্দুস্থানী সংগীত-ধারার বিপক্ষে যাওয়া দূরে থাকুক, সেই ধারাকেই দেশী সংগীতের সংস্পর্শে ও ব্যক্তিগত ভাবের সম্পর্কে এনে নতুন জীবন দিয়েছেন। নতুনকে অপরিচিত বলে অবজ্ঞা না করলে অনেক সময় দেখা যায় যে, সেটি পুরাতনের রূপান্তর, সনাতনেরই বিকাশ। সনাতনকে পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে তার মধ্যে অনেক নতুন জীবনের আভাস রয়েছে।[৪]"

৪। নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগও নানাদিক থেকে অর্থবাহী হইতে পারে। নৃত্যের মত চিত্ত-বিনোদনের জন্যই সাধারণত নাটকে সঙ্গীতের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া প্রতীক নাটকে নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব গানের মাধ্যমে রূপায়িত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকে 'আলো আমার আলো' গানটিকে থিম্ মিউজিক বলা

১৪। নাট্যাভিনয়

নাট্যসাহিত্য ও নাট্যাভিনয় সম্ভবতঃ একই সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিল। ভরতমুনি মহেন্দ্রসভায় নাট্যাভিনয়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উর্বশী ভরতমুনির নিকট অভিনয় শিক্ষা করিবার কালে অন্যমনস্কভাবে 'পুরুষোত্তম' না বলিয়া 'পুরুরবা' বলিয়া ফেলায়, ভরতমুনি কর্তৃক অভিশপ্তা হন। ভরতমুনির কৃপায় নাট্যাভিনয় পৃথিবীতে প্রচলিত হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। নায়কাদি চরিত্রের অনুকরণের নাম অভিনয়। ভরতমুনি এই অভিনয়কে চারিভাগে ভাগ করিয়া গিয়াছেন—যথা, আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। অঙ্গভঙ্গি দ্বারা অবস্থার অনুকরণের নাম 'আঙ্গিক' অভিনয়। বাক্য ভঙ্গি দ্বারা অন্যের স্বর ও কথার অনুকরণের নাম 'বাচিক' অভিনয়। বেশভূষাদি দ্বারা অন্যের সাদৃশ্য অনুকরণের নাম 'আহার্য' অভিনয়। স্তম্ভ, স্বেদাদি সত্ত্বগুণসম্ভূত অভিনয়ের নাম 'সাত্ত্বিক' অভিনয়।

এই নাট্যাভিনয় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই প্রচলিত হইয়াছিল। অভিনয়-কালে ভাব ও রস বিস্তারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকায়, অভিনয়ের সময় নির্দেশেরও নিয়ম ছিল। দিন-রাত্রির মধ্যে সকল সময় মানব-মন সমানভাবে সকল ভাব ও রস গ্রহণ করিতে পারে না। সেই জন্য এক এক নাট্যের জন্য এক এক সময় নির্দিষ্ট ছিল। নাট্যশালা-নির্মাণ, নাট্যাঙ্গ-রচনা, বেশভূষাদি সংগ্রহ ও গীতবাদ্যনৃত্যে কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ যত্ন লওয়া হইত। যে নাটকে এক প্রহর অর্থাৎ তিন ঘণ্টাব্যাপী সময় লাগিত, তাহাই ছিল শ্লাঘ্য। নাটকের যে রসটি প্রধান থাকিত, তদনুসারে নৃত্য ও সংগীত কল্পিত হইত। পরিচ্ছদ তিন প্রকারের ছিল—শুভ্র, মলিন ও বিচিত্র। ধর্মকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি, সামান্য স্ত্রীলোক, অমাত্য, কঞ্চুকী ও পুরোহিত শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, রাজা, বা রাজপুরনারীগণের পরিচ্ছদ বিচিত্র বর্ণের হইত। মাতাল, উন্মাদ, গিরিবাসী, চোর, লোকসন্তপ্ত ও দণ্ডিত ব্যক্তির বস্ত্র মলিন হইত।

প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে প্রাচীন ভারতে নাট্যাভিনয়ের পদ্ধতির কথা জানিতে পারা যায়, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া কোন অভিনয় হইয়াছিল কিনা সে-কথা জানিতে পারা যায় না। ভরতমুনি তাঁহার 'নাট্যসূত্রে' রঙ্গমঞ্চ-নির্মাণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে-সময়ে রঙ্গমঞ্চ

যাইতে পারে। আধুনিক কালে গান অনেক স্থলে সংলাপের স্থান গ্রহণ করে। গানের মাধ্যমে চরিত্রের দ্বন্দ্বকেও অভিব্যক্ত করা হয়। পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিত, সূক্ষ্মব্যঞ্জনা এবং আবহসৃষ্টির কাজে সঙ্গীতকে লাগানো হয়। পাখীর কাকলি, যন্ত্রের শব্দ, সমুদ্র ও ঝড়ের গর্জন, বোমা ফাটার শব্দ প্রভৃতির সূক্ষ্ম প্রয়োগ আধুনিক নাটকে লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপক অর্থে এগুলিও নাটকের সঙ্গীত প্রয়োগের আওতায় পড়ে।

ছিল কিনা তিনি তাহা বলেন নাই। তাঁহার গ্রন্থ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, সে-কালে নিশ্চয় রঙ্গমঞ্চ ছিল, নচেৎ ভরত এমন সুনিপুণভাবে ইহার নির্মাণ পদ্ধতির কথা বলিলেন কিরূপে। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে Dr. Bloch রামগড় পাহাড়ের একটি গুহার সম্মুখে গ্রীক-পদ্ধতিতে রচিত একটি রঙ্গমঞ্চের কথা বলিয়াছেন। বিশেষজ্ঞেরা ইহা খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকে নির্মিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বাংলাদেশে বিগত শতক হইতে যে রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হইতে শুরু হইয়াছে, তাহার সহিত প্রাচীন ভারতবর্ষের রচনা-রীতির সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চ নির্মাণের বর্ণনা থাকিলেও দৃশ্যপটের উল্লেখ নাই। বাঙলা রঙ্গমঞ্চে যে দৃশ্য-পটের আধিক্য দেখা যায়, তাহা বিলেতি থিয়েটারের অনুকরণে আসিয়াছে। ভারতের বাহিরে সর্বত্র এই দৃশ্যপটের সমারোহ নাই; এমন কি ভারতের প্রাচীন যাত্রাগানেও ছিল না। চীন ও জাপানী নাট্যেও নাই। রুশিয়ার কোন কোন নাট্যাভিনয়ের আসর দর্শকগণের ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। প্রাচীন ইউরোপেও দৃশ্যপট রচনার চেষ্টা ছিল না। গ্রীকদের সময়ও কোন কৃত্রিম মঞ্চ ছিল না, কৃত্রিম দৃশ্যপটও ছিল না। Moliere এবং Shakespeare-ও দৃশ্যপট ব্যবহার করেন নাই। অথচ গত শতাব্দীতে ইউরোপীয় নাট্য-মঞ্চে কৃত্রিম দৃশ্যপট ও আলোকসজ্জার দ্বারা নাট্যমঞ্চকে ভারাক্রান্ত করিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। সে-শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চসজ্জা বর্তমানে সে-দেশে বর্জন করা হইয়াছে। অথচ তাহারই অনুকরণে আমাদের দেশে যে দৃশ্যপট রচনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আজও নির্লজ্জভাবে অনুকৃত হইতেছে।

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক পথ অনুসরণ করেন নাই। অভিনয়, দৃশ্যপট, প্রেক্ষাগৃহের আবহাওয়া, সংগীত ও সুর-সংযোজনায় তিনি যথেষ্ট মৌলিকত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার প্রযোজিত অভিনয়ে দৃশ্যপটের বাহুল্য ও বাহিরের জাঁকজমক তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। তাঁহার মতে, নাটকের রহস্যময় রূপটি দর্শকের মনের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, নাট্যাভিনয়কে সহজ, স্বাভাবিক ও বেগবান করিয়া তুলিতে হইবে। আধুনিক নাট্যমঞ্চের আয়োজন সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,—

> "আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত। কালিদাস মেঘদূত লিখে গেছেন, ঐ কাব্যটি ছন্দোময় বাক্যের চিত্রশালা। রেখাচিত্রকর তুলি-হাতে এর পাশে পাশে তাঁর রেখাঙ্ক ব্যাখ্যা যদি চালনা করেন, তাহলে কবির প্রতি যেমন অবিচার, পাঠকের প্রতিও তেমনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজের কবিত্ব কবির পক্ষে যথেষ্ট,

বাইরের সাহায্য তাঁর পক্ষে সাহায্যই নয়, সে ব্যাঘাত; এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।"

এই উপলক্ষে তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"শকুন্তলায় তপোবনের একটি ভাব কাব্যকলার আভাসেই আছে। সেই-ই পর্যাপ্ত! আঁকা-ছবির দ্বারা অত্যন্ত বেশি নির্দিষ্ট না হওয়াতেই দর্শকের মনে অবাধে সে আপন কাজ করতে পারে। নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ ক'রে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিতে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালা-গানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই, যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে, সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলে-মানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ, বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।"—(তপতী নাটকের ভূমিকা)।

পরিশিষ্ট

[১]

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি ও বিকাশ

ভূমিকা

ঠিক কোন্ সময় হইতে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছিল, সে-কথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই। প্রাচীন কালের বহু তথ্য আজ হারাইয়া গিয়াছে। তবে অনুমান করিয়া কিছুটা বলা যাইতে পারে। দ্রাবিড় ও আর্যভাষী দুই মহাজাতির সম্মিলনে ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। আর্যরা এ-দেশে আসিয়া আর্য-পূর্ব যুগের বহু ভালো জিনিস আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। অনার্যরা নৃত্য-গীত-বাদ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মনে হয় আর্যরা তেমন ছিলেন না। অথর্ববেদের একটি মন্ত্রাংশে ইহার প্রমাণ আছে। সেখানে ঋষি বলিতেছেন,—'একে গান ও নাচ কে দিল'? (অস্মিন্‌...বাণং কো নৃত্যো দধৌ)। ইহা হইতে অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, নাচ-গানের ব্যাপারে আর্যরা তেমন সুদক্ষ ছিলেন না। ভারতের আদিমনিবাসীদের মধ্যে নাচ-গানের প্রচলন দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিতই হইয়াছিলেন।

দ্রাবিড়দের নাচগান-প্রিয়তার পক্ষে প্রমাণের অভাব নাই। দ্রাবিড়দের দেশ দক্ষিণ ভারতে এখনও নাচ-গানের যথেষ্ট প্রচলন আছে। যে নটরাজ শিব নাট্যাধিপতি বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন, তিনি অনার্য দেবতা। পূর্বে প্রকৃতিদেবীর পূজা দ্রাবিড়দের মধ্যেই কেবল প্রচলিত ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে পৃথিবীর ফলশস্য-উৎপাদন অনুষ্ঠানের সঙ্গে নাচ-গানের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে।

গোড়ার দিকে অনার্যদের প্রতি আর্যদের একটু বিরূপ মনোভাবই ছিল। ব্রাহ্মণদের পক্ষে বেদগান ছাড়া শিব ও বিষ্ণুর জন্য নৃত্যগীত নিষিদ্ধ হইয়াছিল। শূদ্র ও নারীরা তাহা সম্পাদন করিতেন। হোলি ও দোলকে আর্যরা শূদ্রোৎসব বলিতেন। কিন্তু এরূপ মনোভাব বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। আর্যরা অনার্যদের বহু জিনিস গ্রহণ করিয়া তাহার বিপুল উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। নৃত্যগীতবাদ্যের সহিত সংলাপ যোজনা করিয়া তাঁহারা 'নাট্য' সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এরূপ সংলাপাত্মক রচনার নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যে যথেষ্ট মেলে। ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত যম-যমী, পুরুরবা-উর্বশী, অগস্ত্য-লোপামুদ্রা, বিশ্বামিত্র-নদীগণ প্রভৃতি সংবাদ-সূক্তগুলিই ইহার প্রমাণ। যজ্ঞস্থলে ঋত্বিকগণ

এক এক দেবতার সজীব প্রতীকরূপে ঐ সকল সূক্তের সঙ্গীত ও আবৃত্তি করিতেন। উপনিষদের অন্তর্গত যম ও নচিকেতা, গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্য, যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইতে নাটকের বীজানুসন্ধান করা যায়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় কবে হইতে শুরু হইয়াছিল সে-কথা সঠিক বলা যায় না। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে বৈদিক-যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ খ্রীস্টপূর্ব ৬০০ শতকের কাছাকাছি সময়ে ভারতের নাট্যকলা মোটামুটি রূপলাভ করিয়াছিল। তবে সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া খুবই শক্ত।

পুরাণের কাহিনী

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, দৃশ্যকাব্যের আদি জন্মভূমি দেবলোক। দেবাসুর যুদ্ধে জয়ী হইয়া দেবগণ এক বিজয়োৎসবের আয়োজন করেন। সেখানে ইন্দ্রধ্বজ প্রোথিত করিয়া তাহারই নিকটে দেবাসুর-যুদ্ধের অনুকরণ করা হয়। সেই উপলক্ষে ভরতমুনি মঙ্গলসূচক একটি 'নান্দী' রচনা করেন। সেই অনুকৃতি-উৎসব দর্শন করিয়া দেবতারা আনন্দিত হন। কিন্তু অসুররা নিজেদের পরাজয়ের কাহিনী অভিনীত হইতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হয়। অভিনয়কালে তাহারা গোলযোগের সৃষ্টি করিলে ইন্দ্র স্থাপিত-কেতনদণ্ড উত্তোলিত করিয়া তাহাদিগকে প্রহারে জর্জরিত করেন। তৎপরে তাহারা শান্ত হয়। সেই ঘটনার পর হইতে ইন্দ্রধ্বজের নাম হয় 'জর্জর'। সেই 'জর্জর'ই প্রাচীনকালে রঙ্গালয়ের প্রতীক ছিল এবং অভিনয়ের পূর্বে সর্বত্র সেই 'জর্জর'-পূজার বিধি ছিল।

অভিনয়-ব্যাপারে দেবাসুরের মধ্যে বিরোধ বাধিলে ব্রহ্মার আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা একটি রঙ্গালয় নির্মাণ করেন। ব্রহ্মা তখন সমগ্র সৃষ্ট-জগতের প্রীতির নিমিত্ত ঋগ্‌বেদ হইতে পাঠ, সামবেদ হইতে সংগীত, যজুর্বেদ হইতে অভিনয়কলা এবং অথর্ববেদ হইতে ভাব ও রস সংগ্রহ করিয়া নাট্যবেদ বা পঞ্চমবেদ নামে নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তিনি ভরতমুনিকে একটি অভিনয়ের আয়োজন করিতে বলেন। ব্রহ্মার আদেশে ভরতমুনি একটি নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন। সেই নাট্যাভিনয়ে শিব 'তাণ্ডব-নৃত্য,' পার্বতী 'লাস্য-নৃত্য' এবং বিষ্ণু 'নাট্য-রীতি' দান করেন। তণ্ডু-মুনিকে প্রথমে শিখাইয়াছিলেন বলিয়া শিবের নৃত্যের নাম হয় তাণ্ডব। ইহার পর ভরতমুনি নূতন নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া নরলোকে প্রচার করেন। সেই নাট্যশাস্ত্রই জগতে 'ভরত-নাট্যশাস্ত্র' নামে খ্যাত হইয়াছে।

ভরতমুনির অধিনায়কত্বে যে সকল নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তাহার প্রথমখানির নাম 'অমৃত-মন্থন,' দ্বিতীয়খানির নাম 'ত্রিপুরদহ' এবং তৃতীয়-

খানির নাম 'লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর'। মহাকবি কালিদাস তাঁহার 'বিক্রমোর্বশী'-নাটকের তৃতীয় অঙ্কে ভরত-প্রযোজিত 'লক্ষ্মী-স্বয়ংবর' নাটকাভিনয়ের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। বাগ্‌দেবী সরস্বতী এই নাটকখানি রচনা করেন। নাটকের প্রযোজনার ভার পড়ে মহামুনি ভরতের উপর। ভরতের অনুরোধে স্বর্গের ভুবনমোহিনী নর্তকী উর্বশী লক্ষ্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হন। উর্বশী তখন নরপতি পুরুরবার প্রেমে মগ্ন ছিলেন। অভিনয় কালে মনের ভুলে তিনি পুরুষোত্তমের নাম করিতে গিয়া পুরুরবার নাম করিয়া ফেলেন। উর্বশীর এইরূপ অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া ভরতমুনি রুষ্ট হইয়া উর্বশীকে অভিশাপ দেন। সেই নিমিত্ত উর্বশী মুনিশাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া কিছুকাল পুরুরবার মহিষীরূপে পৃথিবীতে বাস করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন গ্রন্থে নাটকীয় বিষয়ের উল্লেখ

উপরের বর্ণিত কাহিনীটি পুরাণের গল্প। পুরাণের গল্পে ঐতিহাসিক সত্যের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা হইতে সঠিক সময় নির্ণয় করা যায় না। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রাচীন গ্রন্থে 'নট', 'নাটক' বা 'নাট্যাভিনয়ে'র উল্লেখ পাওয়া যায়। শুক্ল-যজুর্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতায় 'শৈলূষ' শব্দে নট বুঝাইয়াছে। টীকাকার মহীধরও বলিয়াছেন—'শৈলূষং নটম্' অর্থাৎ শৈলূষকেই নট বলে। বাল্মীকির রামায়ণে 'শৈলূষ' শব্দের প্রয়োগ আছে এবং মহাভারতে দ্রৌপদী 'শৈলূষী' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

মহাকবি বাল্মীকির 'রামায়ণে' নাটক, নট এবং সংগীত শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণে 'ব্যামিশ্রক' শব্দ সংস্কৃত ও প্রাকৃতে মিশ্রিত হইয়া নাটক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভরত দশরথের মৃত্যুকালে দুঃস্বপ্ন দেখিলে তাঁহার বন্ধুগণ নৃত্যগীত ও নাটক পাঠের আয়োজন করিয়াছিলেন। অযোধ্যার অন্তঃপুরচারিকাদের জন্য যে রঙ্গালয় ছিল তাহার উল্লেখ রামায়ণে আছে। যে 'কুশীলব' শব্দটি অভিনেতা অর্থে প্রচলিত আছে, তাহা সম্ভবতঃ কুশ ও লবের রামায়ণ-গান হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

'মহাভারতে'র বিরাট-পর্বে একটি প্রকাণ্ড রঙ্গালয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে। অর্জুন সেখানে বৃহন্নলা-বেশে রাজকন্যা উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন। অভিমন্যু-উত্তরার বিবাহোৎসবে মান্য অতিথিদের অভ্যর্থনার ভার লইয়াছিলেন নট, বৈতালিক, সূত (সংগীতজ্ঞ) এবং মঘদ (নর্তক)। বনপর্বেও নট ও নর্তকের উল্লেখ আছে। উদ্যোগপর্বে শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে দুর্যোধনের রাজ্যে উপস্থিত হইলে দুর্যোধন নৃত্য-গীতের বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন।

মহর্ষি পাণিনি তাঁহার 'ব্যাকরণে' 'শিলালী' ও 'কৃশাশ্ব' নামক দুইজন নাট্যসূত্রকারের নাম করিয়াছেন। শিলালী ও কৃশাশ্ব নাট্যসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া 'শৈলাল' ও 'কার্শাশ্ব' শব্দে নাটক বুঝায়।

পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' 'শৌভিক', 'শৌভিকা', 'শোভনিকা' প্রভৃতি শব্দের সন্ধান মেলে। কেহ কেহ মনে করেন যে, 'শৌভিক' শব্দের অর্থ নাট্য-শিক্ষক। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে 'কংসবধম্' ও 'বলিবন্ধম্' নাটকাভিনয়ের উল্লেখ আছে।

ইহা ছাড়া 'শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে', 'হরিবংশে', 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে,' কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে', 'মনু-সংহিতায়', বাৎসায়নের 'কামসূত্রে' নট ও নাট্যকার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে।

অভিনীত নাটকের প্রমাণ

প্রথম দিককার অভিনীত নাটকের মধ্যে মহাভাষ্যে উল্লিখিত 'কংসবধম্' ও 'বলিবন্ধম্' নাটক দুইখানির নাম করা যাইতে পারে। ইহার পূর্বে কোন অভিনীত নাটকের নাম পাওয়া যায় নাই। মহাভাষ্যের তারিখ বিশেষজ্ঞদের মতে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক। বৌদ্ধযুগে সংস্কৃত নাটক অতি উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল। বুদ্ধদেব তাঁহার অনুশাসনে যদিও তাঁহার শিষ্যদিগকে নাট্যাভিনয় দর্শন নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহারই সমকালে যে নাট্যাভিনয় হইত, তাহার প্রমাণ আছে। বৌদ্ধ-যুগের গ্রন্থ 'ললিতবিস্তরে' আছে যে, যে সময়ে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন মৌদ্‌গল্যায়ন ও উপতিষ্য নামে তাঁহার দুই শিষ্য সর্বসমক্ষে অভিনয় করিয়াছিলেন। 'অবদান শতক' হইতে জানা যায় যে, মগধরাজ বিম্বিসার নাগরাজদ্বয়ের সম্মানার্থে একটি নাটকের অভিনয় করাইয়াছিলেন। ক্রকুচ্ছন্দ নামে এক বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর অধিনায়কতায় শোভাবতী নগরে এই অভিনয় হইয়াছিল। এই দলই আবার গৌতম বুদ্ধের সম্মুখে রাজগৃহে অভিনয় আয়োজন করিয়াছিলেন। অভিনয়কালে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা কুবলয়া তাঁহার অপূর্ব অভিনয় ও লাস্যভঙ্গির দ্বারা সন্ন্যাসীদের মনে আদিরসাত্মক ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহাতে বুদ্ধদেব তাঁহাকে এক বিকটদর্শনা বৃদ্ধায় পরিণত করেন এবং শেষে কুবলয়ার মনে অনুশোচনা আসিলে বুদ্ধ তাঁহাকে ভিক্ষুণী-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। তিব্বতে বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে বহু নাটকাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। অজন্তার মূর্তিগুলি দেখিলে সেকালে সংগীত ও নৃত্যের যে বহুল প্রচার ছিল তাহাই প্রমাণ হয়। সীতাবেঙ্গা-গুহায় যে রঙ্গমঞ্চ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে, মহারাজ অশোকও নাটকাভিনয়ের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অশোকের গিরণার শিলা-লেখে 'সমাজ' কথাটি হয়তো নাট্যাভিনয়ের ইঙ্গিত করে। কুশজাতক, উদয়জাতকে

নাট্যাভিনয়ের কথা আছে। কণভের জাতকে নট, সমাজ এবং সমাজ-মণ্ডলীর কথা আছে। সেখানে 'নট' মানে অভিনেতা, 'সমাজ' মানে নাট্যাভিনয় এবং 'সমাজ-মণ্ডলী' মানে রঙ্গমঞ্চ। বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈনধর্ম ধর্ম-প্রচারার্থে নাটককে অবলম্বন করিয়া নাটকের উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

অশ্বঘোষ রচিত 'শারিপুত্রপ্রকরণ' একখানি প্রাচীন বৌদ্ধ নাটক। এখানি খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে রচিত হইয়াছিল। জর্মান পণ্ডিত ল্যুডস্ মধ্য-এশিয়া হইতে ইহার পুঁথির ভগ্নাংশ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই পুঁথি আবিষ্কৃত হওয়াতে প্রচলিত অনেক বড় বড় মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই নাটকখানি হইতে প্রমাণিত হয় যে বৌদ্ধযুগে নাটক বিশেষভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কালিদাস তাঁহার নাটকে ভাসের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। সেই ভাসের 'স্বপ্ন-বাসবদত্তা', 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ন' প্রভৃতি নাটকও কিছুদিন পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কালিদাসের পূর্বে নাটক যে কিরূপ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল, তাহাই ঐ নাটকগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

লোকনাট্য

প্রাচীন সংস্কৃত নাটকগুলি অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্য লিখিত হইত এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে অভিনীতও হইত। কিন্তু অল্প শিক্ষিত জনসাধারণের পারিবারিক উৎসবেও একপ্রকার নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকিত। এই সব নাট্যাভিনয়ের জন্য কোন বাঁধা রঙ্গালয়ের প্রয়োজন হইত না। কৃষ্ণের জন্মোৎসব, রাস প্রভৃতি বিষয় এবং রামায়ণ-কাহিনী লইয়া ইহার পালা রচিত হইত। শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতার শোভাযাত্রা উপলক্ষ্যেও নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। মনে হয় এই সকল পালাভিনয়ের অনুকরণে ইদানীন্তন কালের পুতুলনাচ, হাফ্-আখড়াই, বহুরূপী, কথকতা, হরবোলা, যাত্রা প্রভৃতি নানা-প্রকার নাচ-গান-অভিনয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রাকৃত নাটক

সংস্কৃত নাটকের পূর্বে এবং সমকালেই প্রাকৃত ভাষায় কয়েকখানি নাটকও লিখিত হইয়াছিল। খ্রী: পূ: পঞ্চম শতক হইতে খ্রীস্টাব্দ দশম শতক পর্যন্ত প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষে নানা শাখায় প্রচলিত ছিল। মৌর্য, অন্ধ্র এবং শক্ জাতির রাজকার্যে এই ভাষা ব্যবহৃত হইত। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এই ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কালিদাসের নাটকে প্রাকৃতজনের কথাবার্তায় প্রাকৃত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, প্রাকৃত ভাষা ভদ্রসমাজের সাহিত্যে একেবারে বর্জনীয় ছিল না।

দশম শতকে মহারাষ্ট্রীয় কবি রাজশেখর প্রাকৃত ভাষায় 'কর্পূর মঞ্জরী' নামে একখানি উপরূপক লিখিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি পণ্ডিত-সমাজে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

সংস্কৃত নাটকে একটি জিনিস লক্ষ্য করা যায়, সেটি হইতেছে শৌরসেনী প্রাকৃতের সমাদর। প্রধান নায়ক-নায়িকারা হয় সংস্কৃতে, নয়তো শৌরসেনী প্রাকৃতে কথাবার্তা বলিত। এই শৌরসেনী বা শূরসেন মথুরা অঞ্চলের ভাষা। এই মথুরা-অঞ্চল আবার ভারতবর্ষের মধ্যদেশে অবস্থিত। ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, নাট্যকলার উৎপত্তিস্থান মধ্যদেশ। নাট্যোৎপত্তির স্থানটির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করা গেলেও, নাট্যোৎপত্তির কাল সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

গ্রীক প্রভাবের কল্পনা

ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ গ্রীক প্রভাবের কল্পনা করিয়াছেন। আমাদের রঙ্গমঞ্চে 'যবনিকা' কথাটি পর্দা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, 'যবন' শব্দ হইতে 'যবনিকা' কথাটির সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সে-কথা ঠিক নয়। Ionia দেশবাসী গ্রীকদের নামানুসারে Ionian শব্দটি হইতে 'যবন' কথাটি উদ্ভূত হইয়াছে। চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থা-রহিত যে-কোন ম্লেচ্ছাচারী বিদেশীকে ভারতীয়েরা 'যবন' বলিত। যবনের সহিত যবনিকার কোন সম্পর্ক নাই। শিল্‌ভাঁ লেভিঁর মতে, যবনদের (বিদেশীদের) দ্বারা পারস্যদেশ হইতে আনীত পর্দাকে 'যবনিকা' বলা হইত। কিন্তু যবনিকার আসল অর্থ পর্দা নয় এবং তখনকার দিনে গ্রীসীয় রঙ্গমঞ্চে পর্দার ব্যবহার ছিল না। যবনিকার মূল কথাটি হইতেছে 'যমনিকা', প্রাচীন প্রাকৃতে ইহা 'জবনিকা'-রূপে পাওয়া যায়। পরে 'জ' পরিবর্তিত হইয়া 'যবনিকা'-রূপে সংস্কৃতে স্থান পাইয়াছে। ভাস, কালিদাস, ভবভূতির নাটকে যবনিকার উল্লেখ নাই। রাজশেখরের 'কর্পূর-মঞ্জরী'তে যবনিকার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। কালিদাস তাঁহার 'শকুন্তলা' ও 'রঘুবংশে' 'যবনী'র কথা বলিয়াছেন। রঘুবংশে 'যবনী' অর্থে পারস্য দেশের রমণী বুঝাইতেছে। কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে, পাণিনির ব্যাকরণে, রামায়ণ-মহাভারত কাব্যে, হরিবংশ প্রভৃতি পুরাণে 'যবন' শব্দের উল্লেখ আছে। আর্যেরা নিজেদের লোক ছাড়া যে কোন লোককেই যবন নামে অভিহিত করিতেন। সীতাবেঙ্গা ও যোগিমারা গুহায় অবস্থিত রঙ্গমঞ্চ গ্রীক রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে গঠিত, এরূপ মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ভরত-নাট্যশাস্ত্রে এবং সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে যেরূপ বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তাহাতে ঐ সকল মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ক্লাসিক

ও খারবেলার হস্তিগুম্ফা শিলালিপিতেও নাট্যাভিনয়ের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় নাট্যগ্রন্থ ও গ্রীক নাট্যগ্রন্থের প্রভেদ

ভারতীয় নাট্যগ্রন্থ ও গ্রীক নাট্যগ্রন্থের তুলনামূলক সমালোচনা করিলে বহু মৌলিক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক নাটকের 'ট্র্যাজিডি' ভারতীয় নাটকে নাই। গ্রীক নাটকের প্রাণ দেশ, কাল ও আখ্যানবস্তুর একতা; ভারতীয় নাটকে কেবল মাত্র আখ্যানবস্তুর বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়, দেশ ও কালের একতা নাই। গ্রীক নাটকের প্রধান অঙ্গ 'কোরাস'-সংগীত ভারতীয় নাটকে নাই। ভারতীয় নাটকের অঙ্কাবতার, বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা প্রভৃতি গ্রীক নাটকে দেখা যায় না। এই নিমিত্তই বোধহয় নাট্যশাস্ত্র-বিশারদ ডক্টর ওয়ার্ড লিখিয়াছেন,—

"There is no real evidence for assuming any influence of Greek examples upon the Indian drama at any stage of its progress"—(Encyclopaedia Britannica, 11th Edition.)

ডক্টর উইলসন বলিয়াছেন,—

"Whatever may be the merits or defects of the Hindu drama, it may be safely asserted that they are unmixedly its own"—(Hindu Theatre, Vol. I, P. XI)

ভারতীয় নাটকের পরবর্তী ইতিহাস

ভারতীয় নাটক আপন নিজস্বতা রক্ষা করিয়াই উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠিয়াছিল। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় এই যে, বহুদিন ধরিয়া যে বিরাট নাট্য-সাহিত্য দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই আজ বিনষ্ট হইয়াছে। যে অল্প কয়েকখানি নাটক আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সেগুলি চিন্তার গভীরতায়, রস-সৌন্দর্যের মনোহারিত্বে এবং রচনার পারিপাট্যে আজিও আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে। যে-গুলি নষ্ট হইয়াছে সে-গুলির সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে যে, জনসাধারণ সংস্কৃত নাটকের অনুপম রচনার রস গ্রহণে অপারগ ছিল বলিয়াই ঐ-গুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, হিন্দুরাজারা বহুদিন যাবৎ তাহাদিগের উৎসবের অঙ্গরূপে নাট্যাভিনয়কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু, কালক্রমে যখন তাঁহাদিগের রাজত্বের পতন হইল, তখন নাট্যকলাও উৎসাহের অভাবে বিনষ্ট হইতে বসিল। পরবর্তীকালে মুসলমান ভূপতিগণ তাঁহাদিগের

ধর্মশাস্ত্রে নিষেধ থাকায় দরুন নাট্যকলায় উন্নতিতে আদপেই মন দেন নাই। ফলে, ভারতীয় নাটক ও নাট্যচর্চার আরও অবনতি ঘটিল।

বৈষ্ণবযুগে যে ভারতীয় নাট্যকলা বাঙলা দেশে জীবিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কয়েকখানি সংস্কৃত নাটক হইতে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের লীলা অবলম্বনে ঐ নাটকগুলি লিখিত হইয়াছিল। 'চৈতন্য-ভাগবত' হইতেও জানিতে পারা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেব একটি নাট্যাভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন। এই নাটকে চৈতন্যদেব সাজিয়াছিলেন 'লক্ষ্মী', গদাধর 'রুক্মিনী', নিত্যানন্দ 'বড়াইবুড়ী', শ্রীবাস 'নারদ' এবং হরিদাস 'কোতোয়াল'।

ভারতের বাহিরে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলা

অনেকে মনে করেন যে, ভারতের বাহিরেও প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার প্রসার হইয়াছিল। শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বালি, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের নাট্যাভিনয় দেখিলে সে কথার প্রতীতি হয়। মধ্য এশিয়া হইতে অশ্বঘোষের নাটকের উদ্ধার হওয়াতে, বহির্ভারতে ভারতীয় নাট্যকলার প্রচার সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট হইয়াছে। তবে এ-সম্বন্ধে আরও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ

নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যতত্ত্ব সম্বন্ধেও যে কয়েকখানা বই লেখা হইয়াছিল, সে প্রমাণও পাওয়া যায়। এই সকল নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কিত গ্রন্থের মধ্যে 'ভরতের নাট্যসূত্র' ধনঞ্জয় পণ্ডিতের 'দশরূপক', রূপ গোস্বামীর 'নাটক-চন্দ্রিকা অলঙ্কার', রামচন্দ্রের 'নাট্য-দর্পণ' এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্য-দর্পণ' সবিশেষ খ্যাত।

প্রাচীন ভারতে নাট্যগৃহ

সেকালে নাট্যগৃহের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তখনকার দিনে রাজারাই ছিলেন নৃত্য, গীত ও বাদ্যের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং নাট্যগৃহ ও সংগীতালয় বেশীর ভাগই নির্মিত হইত রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন প্রশস্ত চত্বরে। প্রাচীন শাস্ত্রানুসারে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ছিলেন আদি নাট্যশালা নির্মাতা। এই নাট্যগৃহগুলি তিন প্রকারের হইত (১) বৃত্তাভাস (Ellipsoidal) অর্থাৎ ডিম্বাকার; (২) আয়তক্ষেত্র (Rectangular) অর্থাৎ যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বড়; (৩) ত্রিভুজাকার (Triangular)। নাট্যগৃহের মোট আয়তন দুই ভাগে ভাগ করা হইত। একভাগে থাকিত নাটমঞ্চ, অপরভাগে থাকিত প্রেক্ষাগৃহ। নাট্যগৃহ দ্বিতল করা হইত—উচ্চতলে দেবকাণ্ড

ও নিম্নতলে অবশিষ্ট বিষয়ের অভিনয় হইত। নায়ককে পূর্বাভিমুখে অবস্থান করিতে হইত। গায়ক-গায়িকাগণ মনোহর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নায়ক যে মুখে থাকিতেন সেই মুখেই থাকিতেন। গায়কদিগের উত্তর পার্শ্বে বাদ্যস্থান থাকিত। মঞ্চের দক্ষিণ দিকে থাকিত তূর্যস্থান (Concert) ও পশ্চাদ্ভাগে থাকিত যবনিকা। যবনিকার অভ্যন্তরভাগ নেপথ্য (Green Room)। রঙ্গমঞ্চের সামনের দিকে থাকিত বৃহৎ যবনিকা (Drop Scene)। সে সময়ে খণ্ডদৃশ্য (Movable Scene) ছিল কিনা তাহা জানা যায় না, তবে অঙ্কিত চিত্র (Oil painting) ছিল। সমস্ত রঙ্গমঞ্চ নানাপ্রকার দৃশ্যপটে পরিশোভিত থাকিত।—যথা, বন, উপবন, উদ্যান, প্রাসাদ, কক্ষ, পর্বত, নদী প্রভৃতি। এই সমস্ত দৃশ্যপট কাপড়ের উপরে এবং রঙ্গমঞ্চের দেওয়ালে অঙ্কিত থাকিত।

সেকালে অভিনয় শুরু করার এই নিয়ম ছিল যে, প্রথমেই সূত্রধার অর্থাৎ ব্যবস্থাপক আসিয়া দর্শকদিগকে নাটক, নাট্যকার ও পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় করাইয়া দিতেন। যাহাতে সকল দর্শক অভিনয়ের আনন্দ সমান-ভাবে উপভোগ করিতে পারে, তাহার জন্য আসনগুলি উঁচু-নিচু করিয়া সাজান হইত। রঙ্গভূমির পূর্বদিকে বসিতেন রাজন্যবর্গ, সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ। ব্রাহ্মণগণ বসিতেন দক্ষিণ দিকে। বালকগণ ও রাজসহচরবৃন্দের আসন ছিল উত্তর দিকে। বিচারক, সমালোচক, অমাত্যবর্গ, কবি, জ্যোতিষী প্রভৃতি আরও বহু শ্রেণীর লোক প্রেক্ষাগৃহের নানাস্থানে নির্দিষ্ট আসনে বসিতেন। অন্তঃপুরের মহিলাদিগের জন্যও বিশেষ আসনের ব্যবস্থা ছিল।

ইন্দ্র-কেতন-দণ্ডোৎসবের অর্থ

এককালে ইন্দ্র-কেতন-দণ্ড ভারতীয় নাট্যের প্রতীক্ চিহ্ন স্বরূপ ছিল। এই ইন্দ্র-কেতন-দণ্ড স্থাপন উপলক্ষে নাট্যাভিনয়ের যে উদ্ভব হয়, সে-কথা পুরাণে উল্লিখিত আছে। ইংলণ্ডে যে মে-পোল (May-Pole) উৎসব হয়, তাহা এই ইন্দ্র-কেতন-দণ্ড উৎসবেরই অনুরূপ। শীতকাল ইংলণ্ডের পক্ষে বড়ই দুঃখের সময়। শীতের অবসানে যখন প্রকৃতিদেবী হাস্যময়ী রূপ ধারণ করেন, তখন গ্রাম্যলোকেরা নূতন জীবনের চিহ্ন স্বরূপ একটি ওক্ বৃক্ষ তুলিয়া গ্রামের মধ্যে মহাসমারোহে প্রোথিত করে এবং তাহার চারিদিকে নৃত্য-গীত আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত করে। ইহাকেই বলে 'মে-পোল' উৎসব। ভারতে ইন্দ্র-কেতন-দণ্ডের স্থাপনও ঠিক একই প্রকারের। তবে ভারতে বর্ষাকাল অত্যন্ত দুঃখের সময়। তাই বর্ষার অবসানে এই উৎসবের আয়োজন করা হইত। প্রাচীন ভারতীয়েরা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে

এই উৎসবের আয়োজন করিত। নবজীবনের চিহ্নস্বরূপ এই কেতন-দণ্ড স্থাপনা উপলক্ষে নানা প্রকার নৃত্য-গীতের আয়োজন হইত। এখনও কোন কোন স্থানে এই উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। এই ইন্দ্রযাত্রার উৎসব এখনও নেপালের একটি প্রধান উৎসব।

[২]

প্রাচীন ভারতীয় নাটকের শিল্পরীতি

(ক) প্রাচীন ভারতীয় নাট্যাদর্শ

সেকালে ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সমাজের নেতা। তাঁহাদেরই বুদ্ধির উপর ভিত্তি করিয়াই অধিকাংশস্থলেই ভারতীয় নাট্য-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা একদিকে যেমন তাঁহাদিগের অধ্যাত্মচিন্তার ফলস্বরূপ ভারতীয় দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি সুগভীর রসবোধের পরিচয় হিসাবে মহাকাব্যকে নাট্যাশ্রয়ে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ মূলতঃ ছিলেন ভাববাদী। এই ভাবের আতিশয্যেই তাঁহারা নাটকের পরিকল্পনায় নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। হৃদবৃত্তির সুমহান আদর্শ নাটকের সংগঠন-কার্যে তলে তলে কাজ করিয়াছে। সেইজন্য দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় নাটকে কাহিনীর মূল্য তেমন স্বীকৃত হয় নাই। নাটকীয় কাহিনীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলে নাটকীয় রসমাধুর্য নষ্ট হয়, এই বিশ্বাসে তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ ভাবকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কাহিনীকে প্রশ্রয় দেন নাই।

চরিত্রসৃষ্টিতে অবাস্তবতা

সংস্কৃত নাটকের কোন চরিত্রই বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক জীবন-সংগ্রামের আদর্শে গঠিত নয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের জীবনাদর্শ অবলম্বনে সংস্কৃত নাটকের প্রসার ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন; সুতরাং নাটকীয় চরিত্রগুলি যে এ-জন্মে পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করিয়া

থাকে, এই মত তাঁহারা পোষণ করিতেন। একটি অসৎ চরিত্র মনুষ্যত্বের দিক হইতে যত গুণের অধিকারী হোক না কেন, সংস্কৃত নাট্যাদর্শের মতে সে পূর্বজন্মের ফলানুযায়ী এ-জন্মে শাস্তি ভোগ করিবেই করিবে। তাহার প্রতি দর্শকদের কোন সহানুভূতি থাকিবে না। কোন দুর্জন ব্যক্তিকে নাটকের নায়ক করিবার নিয়ম নাই; এবং দুর্জনের মৃত্যু দর্শকদের পক্ষে দুঃখদায়ক হয় না। রাবণ সীতাহরণরূপ পাপে নাট্যকারদের হাতে শাস্তি ভোগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বীরত্ব ও উদারতা কাহারও চোখে পড়ে নাই। প্রতিনায়কের চরিত্র উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিবার নিয়ম ছিল বলিয়া, বোধ হয়, রাবণকে রামের তুলনায় হীন করা হইয়াছে। জীবন-সমস্যা অঙ্কনে চরিত্রের রীতিগত আদর্শ খর্ব করিবার সাহস তখনকার দিনে কোন নাট্যকারেরই ছিল না। নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের কোন প্রচেষ্টা প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। মহত্ত্ব আরোপ করিতে গিয়া চরিত্রগুলির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অনেকস্থলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে নাগরিক জীবনের চিত্র জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আইন-আদালত, পুলিস-চৌকিদার, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সামাজিক আদর্শ ও ধর্মজীবন—এই নাটকে সবই আছে। তাহা ছাড়া একটা রাষ্ট্রবিপ্লবও ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এককথায় তদানীন্তনকালের রাজকীয় ও নাগরিক জীবনের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, এক 'মুদ্রারাক্ষস' ছাড়া, সংস্কৃত আর কোন নাটকে পাওয়া যায় না।

কবিত্বের প্রাচুর্য

নাটকের কাহিনী মহাকাব্য হইতে সংগৃহীত হইত বলিয়া সেকালে কবিত্বই নাটক রচনার প্রধান আদর্শ ছিল। ছন্দ ও শব্দ-ঝংকার সৃষ্টির দিকে নাট্যকারেরা ঝোঁক দিতেন বেশি। মাঝে মাঝে শ্লোক-সংযোজনা করিয়া নাটকের মধ্যে যে সৌন্দর্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করা হইত, তাহাতে নাটকীয় সংলাপের শক্তি হ্রাস হইত বলিয়া মনে হয়। গতানুগতিক প্রেম, ঈর্ষা, বিরহ ও মিলন নাটকের বিষয়বস্তু ছিল। চরিত্রের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব না থাকায় নাটকের গতি, কাহিনী এবং সংলাপের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িত। ভারতীয় নাটকের গতিহীনতা লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তখনকার দিনে বোধহয় নাটক অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা পাঠের জন্য লিখিত হইত। কোন পাঠ-গোষ্ঠীতে নাটক শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতগণ খুশী হইলেই সেই নাটকের প্রসিদ্ধি হইত। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিনয়ের জন্যও নাটক লিখিত হইত।

দুঃখময় নাটক

নাটকে বীর, শৃঙ্গার বা করুণ রসের প্রাধান্যবশতঃ নায়ক-নায়িকার জীবনের কষ্ট-সাধ্য সাধনার সমাপ্তিতে সিদ্ধি আসিবেই, ইহাই ভারতীয় নাট্যকারদের বিশ্বাস ছিল। সেইজন্য ভারতীয় নাটকের শ্রেণীবিভাগে ট্র্যাজিডিকে স্বীকারই করা হয় নাই। দুঃখ, বেদনা এবং আত্মত্যাগের গভীরতার মধ্যেই ট্র্যাজিডির জন্ম এবং শেষ। কিন্তু ভারতীয় নাট্যগুরুদের মতে, দুঃখ ও বিরহব্রতের দ্বারা যে জীবন কল্যাণের শুভদীপ্তিতে উজ্জ্বল ও মঙ্গল-মিলনে পরিসমাপ্ত, তাহাই উৎকৃষ্ট নাট্য-সাহিত্য। কালিদাসের 'শকুন্তলা'-নাটকের সমালোচনা কালে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকের রচনা দুঃখময় না হইবার কারণটি সুন্দরভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

> "ধীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া যেখানে দুষ্মন্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, সেইখানে ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে য়ুরোপীয় কবি শকুন্তলা নাটকের যবনিকা ফেলিতেন। শেষ অঙ্কে স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে দৈবক্রমে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার যে মিলন হইয়াছে, তাহা য়ুরোপের নাট্যরীতি অনুসারে অবশ্য ঘটনীয় নহে। কারণ, 'শকুন্তলা' নাটকের আরম্ভে যে বীজবপন হইয়াছে, এই বিচ্ছেদই তাহার চরম ফল। তাহার পরেও দুষ্মন্ত শকুন্তলার পুনর্মিলন বাহ্য উপায়ে দৈবানুগ্রহে ঘটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। নাটকের ঘটনাসূত্রে, দুষ্মন্ত শকুন্তলার কোনো ব্যবহারে এ মিলন ঘটিবার কোনো পথ ছিল না।"

তবু যে ইহা ঘটিয়াছে তাহার কারণ নির্দেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

> "যে প্রেমের উত্তেজনায় তাহারা (নরনারী) ঘূর্ণবেগে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত গ্রহের মতো তাহাদের চারিদিক হইতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজেদের মধ্যেই নিবিড় হইয়া উঠে, সেই প্রেমই প্রধানরূপে কাব্যের বিষয়। কালিদাস অনাহুত প্রেমের সেই উন্মত্ত সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করেন নাই—তাহাকে তরুণ লাবণ্যের উজ্জ্বল রঙেই আঁকিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বলতার মধ্যেই তিনি তাঁহার কাব্যকে শেষ করেন নাই। যে প্রশান্ত বিরলবর্ণ পরিণামের দিকে তিনি কাব্যকে লইয়া গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার কাব্যের চরম কথা।"

ঐক্য-নীতি

সংস্কৃত নাটকে স্থান, কাল এবং ঘটনার সংগতি নাই। নাটকীয় ঘটনাটি বহুকালব্যাপী হইতে পারে এবং বহুস্থানে তাহার দৃশ্য সাজান যাইতে পারে।

আবার একই অঙ্কের মধ্যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যের অবতারণা করাও হয়। যেমন, 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে বসন্তসেনার গৃহের আটটি মহল আটটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যে সাজান হইয়াছে। তাহা ছাড়া বসন্তসেনার গৃহের কক্ষ, গৃহের সম্মুখের রাজপথ, উদ্যান প্রভৃতিও এক একটি ভিন্ন দৃশ্যে সজ্জিত হইয়াছে। ইহাতে রঙ্গমঞ্চসজ্জা ও নাটকীয় রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে। আরও অনেক অসংগতি নাটকের গঠন-ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায়। বিচারক যেমন বলিলেন, "বসন্তসেনার মাতাকে এখানে নিয়ে এস" অমনি শোধনক "যে আজ্ঞে" বলিয়া প্রস্থান করিল এবং তৎক্ষণাৎ বসন্তসেনার মাতাকে লইয়া প্রবেশ করিল। ইহাতে অসম্ভবতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে।

আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকগণ বস্তুগত একতা ও উদ্দেশ্যগত একতা—উভয়কেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। আমাদের প্রাচীন আলংকারিকগণ ঠিক এই মতের পক্ষপাতী। 'সাহিত্য-দর্পণ'কার বলিয়াছেন,—

> "নাটকের বিচ্ছিন্ন অবান্তর অংশগুলির মধ্যে মূল উদ্দেশ্যের সমতা রক্ষিত হওয়া চাই। মুখ্য ঘটনার অংশগুলিও কিঞ্চিৎ সংলগ্ন হওয়া চাই। নাটকে বহু ব্যাপার থাকা সংগত নহে এবং বীজ অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ মূল কারণের যাহাতে সংহার না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা চাই।"

ভাষা

সংস্কৃত নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, মধ্যে মধ্যে শ্লোক সন্নিবেশিত থাকে। সদ্‌বংশজাত এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সচরাচর শুদ্ধ ভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন। সামান্য স্ত্রীলোক, বালক, ভৃত্য ও সাধারণ জনগণ প্রাকৃতভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। তপস্বিনী ও উত্তমজাতীয়া নারীদের সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের রীতি আছে।

পাত্র-পাত্রীর নামকরণ

ব্যক্তিভেদে নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর নামকরণের নিয়ম ছিল। বারবনিতার নামের শেষে 'সেনা', 'দত্তা' যোগ করা হইত ; যেমন,—বসন্তসেনা, বাসবদত্তা। বণিক্ পাত্রের নামের শেষে 'দত্ত' এবং কোন কোন স্থলে 'ভূতি' শব্দেরও প্রয়োগ পাওয়া যায় ; যেমন,—বিষ্ণুদত্ত, চারুদত্ত, দেবভূতি। দাস-দাসীর নাম বসন্তকালে বর্ণনীয় বিষয় হইতে গ্রহণ করা হইত ; যেমন,—কলহংস ও মন্দারিকা (মালতী-মাধব নাটকের দাস ও দাসী)।

উপাখ্যানের নামকরণ

নাটকীয় উপাখ্যানের অন্তর্গত কোন বিশেষ বিষয় লইয়া নাটকের নামকরণ হইত দেখা যায় ; যথা,—রামাভ্যুদয়াদি, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা। প্রকরণ

অপর রূপকের নামকরণ নায়ক ও নায়িকার নামে হইত; যেমন,—মালতী-মাধব। এই নিয়ম সর্বত্র প্রযোজ্য নয়। 'মৃচ্ছকটিক' যদিও প্রকরণ জাতীয় রচনা, তবু নায়ক-নায়িকার নামে ইহার নামকরণ হয় নাই। নাটিকা ও সট্টক প্রভৃতির নামকরণ নায়িকার নামে হইত; যেমন,—রত্নাবলী, বিক্রমোর্বশী।

সম্বোধনের রীতি

সংস্কৃত নাটকের পারস্পরিক সম্বোধনেরও কয়েকটি নিয়ম ছিল। অমাত্য প্রভৃতি অনুজীবিগণ রাজাকে 'স্বামিন্', 'দেব', অধমজাতীয়গণ 'ভট্ট' এবং রাজর্ষিগণ ও বিদূষক 'বয়স্য' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঋষিগণ রাজাকে 'রাজন্' এবং অপত্যপ্রত্যয়ান্ত পদ দ্বারা এবং বিপ্রগণ বিপ্রকে সেই ব্যক্তির বিশেষ নামেও ডাকিতেন। ক্ষত্রিয় বিপ্রগণকে 'আর্য', রাজা বিদূষককে 'বয়স্য' অথবা বিদূষকের ব্যক্তিগত নামে, নটী এবং সূত্রধার পরস্পরকে 'আর্য', পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে 'ভাব' বলিয়া সম্বোধন করিত। তপস্বীদিগকে 'ভগবন্' এবং 'সাধো' বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতি ছিল। বিদূষক রাণী ও চেটীকে 'ভবতি', সূত রথীকে 'আয়ুষ্মন্', বালক এবং যুবা বৃদ্ধকে 'তাত,' বৃদ্ধ পুত্র এবং শিষ্যশ্রেণীকে 'বৎস', বিপ্রগণ অমাত্যকে 'অমাত্য' এবং 'সচিব', শিষ্য গুরুকে 'মহাভাগ', আচার্যকে 'উপাধ্যায়', ভূপতিকে 'মহারাজ' বা 'স্বামিন্', যুবরাজকে 'কুমার' বা 'ভর্তৃদারক', অধম ব্যক্তিগণ কুমারকে 'সৌম্য' বা 'ভদ্রমুখ' এবং প্রজাগণ রাজকুমারীকে 'ভর্তৃদারিকে' বলিয়া সম্বোধন করিত। সাধারণ পাত্র-পাত্রীগণ প্রভুকে 'দেব', তদীয় ভার্যাকে 'দেবি', সখীকে 'হলা', পতিতাকে 'হঞ্জে', কুট্টিনীকে 'অজ্জুকা', গুরুপত্নী ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে 'অম্ব' বলিয়া সম্বোধন করিত।

বিদূষক-চরিত্র

সংস্কৃত নাটকে বিদূষক একটি অতি প্রয়োজনীয় চরিত্র। বিদূষক যে শুধু হাস্য-পরিহাস করিয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করিত তাহা নহে, সেই হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়া সে নায়কের প্রিয়বয়স্যরূপে অভীষ্টসাধনে সহায়তা করিত। অনেকে মনে করেন যে, রূপকের 'শকার', 'বিট' এবং 'বিদূষক' চরিত্র গ্রীসদেশীয় নাটকের অনুকরণে চিত্রিত। অধ্যাপক হিলেব্রান্ট্ বিদূষককে গ্রীসদেশীয় Harlequin-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। Harlequin প্রথমে ছিল ভূতপ্রেতের রাজা, পরে হাস্যরসিক হিসাবে গ্রীক্ নাটকে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু অনেকেই হিলেব্রান্ট্-এর একথা মানেন না। বিদূষক ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মুখ হইতে অসংগত বাক্য নির্গত হইতে দেখিয়া কেহ কেহ

মনে করেন যে বিদূষক পূর্বে শূদ্র ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ইহার উত্তরে অধ্যাপক কীথ বলেন, প্রাকৃত ভাষায় কথাবার্তা বলায়, বিদূষকের মুখে এইরূপ অনৌচিত বাক্য শোনা যায়।

ভরত-বাক্য

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে 'ভারত' নামে এক শ্রেণীর গায়কদের নাম পাওয়া যায়। উহারা নাকি নাট্যাভিনয় বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিল। ভরত-গায়কদের মত এক শ্রেণীর ছড়া-গায়কদেরও নাম শোনা যায়, যাহাদিগকে 'ভাট' বা 'চারণ' বলিত। উহারা কিছুদিন পূর্বেও প্রাচীন কীর্তি-কাহিনী গাহিয়া দেশবাসীর প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগরিত করিত। নাট্যসূত্র-প্রণেতা ভরত-মুনির নামের 'ভরত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে—ভ=ভব অর্থাৎ ভাব, র=রাগ এবং ত=তাল—ইহার সম্পূর্ণ অর্থ সংগীত। গুজরাটে যে-কোন গায়ককে 'ভরত' নামে অভিহিত করা হয়। কোন কোন নাটকে 'ভরত-বাক্য' বলিয়া একটি প্রশস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকের শেষে শান্তি বা মিলন দৃশ্য থাকিলে কোন ধার্মিক পুরুষ যে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন, তাহাকেই 'ভরত-বাক্য' বলে। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে চারুদত্তের বিপদশান্তি হইলে, তিনি ভরত-বাক্য উচ্চারণ করিয়া সুখ-শান্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃচ্ছকটিক নাটকের ভরত-বাক্যটি এইরূপ :—

গাভী হোক্ দুগ্ধবতী শস্যপূর্ণা বসুমতী
মেঘকালে করুক বর্ষণ,
সকল জনের চিত করিয়া গো হরষিত
বহে যেন মধুর পবন।
বৈধ অনুষ্ঠানে রত হোন্ বিপ্র অবিরত
লক্ষীবন্ত হোন্ সাধুগণ।
রিপু করি প্রশমন নৃপ ধর্ম-পরায়ণ
পৃথিবীরে করুন পালন।

[জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ]

কুশীলব

'কুশীলব' বলিতে নাটকের পাত্র-পাত্রীকে বুঝাইয়া থাকে। এই 'কুশীলব' কথাটি রামায়ণের কুশ ও লব হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। 'কুশী' শব্দটি একটি স্ত্রীলোকের নাম, ইহার সহিত 'লব' শব্দটি কিরূপে সমাসবদ্ধ হইল তাহা বোঝা যায় না। আবার 'কু' মন্দ, 'শীল' বুদ্ধি যাহার অর্থাৎ মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন লোক, ইহারও কোন অর্থ হয় না। বৈদিক

সাহিত্যে উল্লিখিত 'শৈলূষ' শব্দটির অর্থ গায়ক ও নর্তক। অধ্যাপক কীথ মনে করেন যে, সর্বপ্রথমে শব্দটি কুশ ও লব নামে গৃহীত হইয়াছিল, পরিশেষে কোন রসিক ব্যক্তি অভিনেতাদিগের চারিত্রিক নীতিহীনতা প্রকাশ করিবার জন্য ইহা 'কুশীলব'-রূপে সংযুক্ত করিয়াছিলেন। মহাকাব্যের সহিত নাটকের জন্ম-ইতিহাসের যে যোগ আছে, 'কুশীলব', শব্দটি তাহার প্রমাণ দিতেছে।

(খ) নাটকের বিভিন্ন রূপ

যাহা অভিনয়কালে রঙ্গভূমিতে দর্শন ও শ্রবণ করা হয় তাহা 'দৃশ্যকাব্য'। অভিনয়াদিতে অন্যের রূপাদির অনুকরণ করা হয় বলিয়া দৃশ্যকাব্যের অন্য নাম 'রূপক'। ক্ষুদ্রাকার দৃশ্যকাব্যগুলিকে 'উপরূপক' বলা হয়। এই উপরূপক ও রূপক স্বরূপতঃ একই প্রকার।

দশরূপক

আলংকারিকরা রূপককে দশ ভাগে ভাগ করিয়াছেন—

(১) নাটক, (২) প্রকরণ, (৩) ভাণ, (৪) ব্যায়োগ, (৫) সমবকার, (৬) ডিম, (৭) ঈহামৃগ, (৮) অঙ্ক, (৯) বীথী, (১০) প্রহসন। পাঁচ অঙ্ক হইতে দশ অঙ্ক পরিমিত গ্রন্থকে বলে **নাটক**—(বিদগ্ধমাধব, হরকেলি নাটক); মহানাটক দশ অঙ্ক পরিমিত—(বালরামায়ণ)। **প্রকরণের** অঙ্ক বিভাগ নাটকের ন্যায়, তবে উহাতে বর্ণনীয় বিষয়টি লৌকিক এবং কবিকর্তৃক স্বয়ং কল্পিত হয়; উক্ত বিষয়ে পুরাণাদি প্রসিদ্ধি থাকে না; উহাতে শৃঙ্গার রস প্রধান থাকে এবং বিপ্র, অমাত্য বা বণিগ্‌বৃত্তি ব্যক্তি উহার নায়ক হন—(মৃচ্ছকটিক, মালতী-মাধব)। **ভাণ** রূপকে ধূর্তব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা থাকে এবং উহাতে নানাবিধ অবস্থান্তর বর্ণিত হয়; উহাতে একটিমাত্র অঙ্ক থাকে—(লীলামধুকর)। **ব্যায়োগ**-রূপকে পুরাণাদি প্রসিদ্ধ কাহিনীটি একাঙ্কযুক্ত হয়; উহাতে প্রসিদ্ধ রাজর্ষি অথবা দিব্য কোনও পুরুষ কিংবা ধীরোদ্ধত কোনও ব্যক্তি নায়ক হন; হাস্য, শৃঙ্গার ও শান্তরস ভিন্ন অপর রসই উহার অঙ্গীভূত হয় এবং উহাতে গর্ভ ও বিমর্ষাদি থাকে না—(সৌগন্ধিকাহরণ)। **সমবকার**-রূপকে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়, উহা প্রসিদ্ধ এবং দেবতা অথবা অসুরবিষয়ক হয়, উহাতে বিমর্ষনামক সন্ধি থাকে না; রূপকটি তিন অঙ্কে গঠিত হয়—(সমুদ্রমন্থন)। **ডিম** নামক রূপকে মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম বা ক্রোধপ্রযুক্ত উদ্‌ভ্রান্ত কিংবা রোগী প্রভৃতির ব্যবহার এবং একটি প্রসিদ্ধ বর্ণনীয় বিষয় থাকে; উহাতে রৌদ্ররস অঙ্গী এবং অপরাপর রস অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়—(ত্রিপুরদাহ)। **ঈহামৃগ**-রূপকের বৃত্তান্তটি কিয়দংশ বিখ্যাত এবং কিয়দংশ অপ্রসিদ্ধ, অতএব মিশ্রভাবাপন্ন; উহাতে চারিটি অঙ্ক থাকে—(কুসুমশেখর বিজয়াদি)। **অঙ্ক**

নামক রূপকে একটি অঙ্ক এবং প্রাকৃত বহুলোক থাকে ; উহা করুণ-রস প্রধান। কেহ কেহ উহাকে উৎসৃষ্টিকাঙ্কও বলিয়া থাকেন—(শর্মিষ্ঠা-যযাতি)। **বীথী**-রূপকে একটি অঙ্ক ও একটিমাত্র নায়ক থাকে। উহাতে প্রভূত শৃঙ্গার রস ও অপরাপর রসেরও কিঞ্চিত সূচনা থাকে। **প্রহসন**-রূপক ভাণ-রূপকের তুল্য এবং উহাতে একটি মাত্র অঙ্ক থাকে ; হাস্যরস উহার অঙ্গী হয় এবং তপস্বী, ব্রহ্মা ও বিপ্র এই তিনের মধ্যে যে কেহ উহার নায়ক হন—(হাস্যার্ণব)।

উপরূপক

উপরূপক আঠারো ভাগে বিভক্ত—(১) নাটিকা, (২) ত্রোটক, (৩) গোষ্ঠী, (৪) সট্টক, (৫) নাট্যরাসক, (৬) প্রস্থান, (৭) উল্লাপ্য, (৮) কাব্য, (৯) প্রেক্ষণ, (১০) রাসক, (১১) সংলাপক, (১২) শ্রীগদিত, (১৩) শিল্পক, (১৪) বিলাসিকা, (১৫) দুর্মল্লিকা, (১৬) প্রকরণিকা, (১৭) হল্লীশ, (১৮) ভানিকা। যে উপরূপকে বর্ণনীয় বিষয়টি কবির কল্পিত স্ত্রীজনবহুল ও চারিটি অঙ্কে গ্রথিত, তাহাকে **নাটিকা** কহে—(রত্নাবলী, বিদ্ধশালভঞ্জিকা)। যে উপরূপকে সাত, আট, নয় অথবা পাঁচটি অঙ্ক থাকে এবং বৃত্তান্তটি দিব্যপুরুষ ও মনুষ্য এই উভয়ের চরিত্র-বিষয়ক হয় ও প্রতি অঙ্কেই বিদূষক থাকে, তাহাকে **ত্রোটক** বলে ; উহাতে শৃঙ্গার রসের আধিক্য থাকে—(স্তম্ভিতরম্ভ, বিক্রমোর্বশী)। যে উপরূপকে নয়টি বা দশটি সাধারণ শিক্ষিত পাত্র, পাঁচটি বা ছয়টি স্ত্রী-চরিত্র এবং একাঙ্কবিশিষ্ট শৃঙ্গার রস প্রধান থাকে এবং যাহাতে সংস্কৃত বচন থাকে না ; তাহাকে **গোষ্ঠী** বলে—(রৈবতমদনিকা)। যে উপরূপকে সংস্কৃত বচন থাকে না, যাহাতে প্রবেশক ও বিষ্কম্ভক থাকে না, যাহাতে প্রভূত পরিমাণে অদ্ভুতরস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে **সট্টক** বলে ; নাটিকার ন্যায় উহা চারি অঙ্কে বিভক্ত এবং অঙ্কগুলি 'যবনিকা' নামে অভিহিত হয়। অপরাপর সমস্ত লক্ষণই নাটিকার তুল্য—(কর্পূর-মঞ্জরী)। যে উপরূপকে একটি অঙ্ক, বহু তাল লয়, ধীরোদাত্ত নায়ক ও পীঠমর্দ উপনায়ক থাকে, তাহার নাম **নাট্যরাসক**। এই উপনায়কে শৃঙ্গাররস অঙ্গী ও বাসকসজ্জা রমণী নায়িকা হন—(নর্মবতী, বিলাসবতী)। **প্রস্থান** নামক উপরূপকে দাস্যবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তি নায়ক, তদপেক্ষা হীন ব্যক্তি উপনায়ক এবং দাসী নায়িকা হয়। উহাতে দুইটি অঙ্ক, তাললয় ও প্রচুর বিলাস বর্তমান থাকে—(শৃঙ্গারতিলক)। যে উপরূপকে ধীরোদাত্ত নায়ক, দিব্য বৃত্তান্ত, একটিমাত্র অঙ্ক, হাস্য, শৃঙ্গার ও করুণ রস থাকে, তাহাই **উল্লাপ্য** উপরূপক (দেবীমহাদেব)। যে উপরূপকে একটিমাত্র অঙ্ক ও প্রভূত হাস্য থাকে এবং শৃঙ্গাররস-সংযুক্ত বহু বচন প্রযুক্ত থাকে, তাহাই **কাব্য** নামক উপরূপক—(যাদবোদয়)। যে উপরূপকে গর্ভসন্ধি ও বিমর্ষসন্ধি নাই, যাহার নায়ক নিকৃষ্ট ব্যক্তি, যাহাতে সূত্রধার, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশক নাই, যাহাতে

একটিমাত্র অঙ্ক, তাহাকে **প্রেঙ্খণ** উপরূপক বলে—(বালিবধ)। যে উপরূপকে পাঁচটি মাত্র পাত্র, মুখ ও নির্বহণ এই দুইটি সন্ধি, প্রচুর সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা, নৃত্যগীতাদি, একটি অঙ্ক, বিখ্যাত নায়িকা ও মূর্খ নায়ক থাকে, তাহাকে **রাসক** উপরূপক বলে—(মেনকাহিত। **সংলাপক** উপরূপকে তিনটি বা চারিটি অঙ্ক, বিধর্মী কোন ব্যক্তি নায়ক, শৃঙ্গার ও করুণরস ভিন্ন অন্য রস প্রধান থাকে—(মায়াকাপালিক)। যে উপরূপকে প্রখ্যাত বৃত্তান্ত, একটি অঙ্ক, ধীরোদাত্ত নায়ক ও প্রসিদ্ধ নায়িকা থাকে, যাহাতে গর্ভ ও বিমর্ষসন্ধি থাকে না, তাহাই **শ্রীগদিত** উপরূপক—(ক্রীড়ারসাতল)। **শিল্পক** উপরূপকে চারিটি অঙ্ক, শান্ত ও হাস্য ভিন্ন রস এবং ব্রাহ্মণ নায়ক থাকে—(কণকাবতীমাধব)। অল্পমাত্র বৃত্তান্ত, প্রভূত শৃঙ্গার রস, একটি অঙ্ক, হীন নায়ক, বিদূষক, বিট ও পীঠমর্দ চরিত্রবিশিষ্ট উপরূপককে **বিলাসিকা** বলে। যে উপরূপকে চারিটি অঙ্ক এবং গর্ভসন্ধি থাকে না, যাহাতে পাত্রসমূহ সকল বিষয়ে দক্ষ এবং যাহাতে অনিকৃষ্ট নায়ক থাকে, তাহাই **দুর্মল্লিকা** উপরূপক—(বিন্দুমতী)। নাটিকা-উপরূপকের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে **প্রকরণিকা** উপরূপক অনেকাংশে সেই লক্ষণাক্রান্ত, ইহাতে কেবল নায়ক-নায়িকা সমানবংশজাত হয়। **হল্লীশ** উপরূপকে একটিমাত্র অঙ্ক, সাত, আট, অথবা দশটি স্ত্রীলোক, উৎকৃষ্ট বাক্য, একটি মাত্র পুরুষ এবং বহু তাললয় থাকে—(কেলি রৈবতক)। **ভানিকা** উপরূপকে বসনাদিবেশের সূক্ষ্মতা, একটিমাত্র অঙ্ক, উৎকৃষ্ট নায়িকা, নিকৃষ্ট নায়ক, মুখ ও নির্বহণ-সন্ধি থাকে—(কামদত্তা)। উক্ত সমস্ত রূপক ও উপরূপকগুলি ঔচিত্য ও সম্ভব অনুসারেই নাটকোক্ত বিশেষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশেষ নামে অভিহিত হয়।

(গ) নাটকের সংগঠন

কোন প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত লইয়া নাটক রচিত হয়—'নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি সমন্বিতম্'। ইহা মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও নির্বহণ বা উপসংহৃতি —এই পঞ্চসন্ধিযুক্ত। বিলাস (অর্থাৎ ধীরদৃষ্টি, বিচিত্র গতি, সস্মিত বাক্য), ঋদ্ধি (অর্থাৎ অভ্যুন্নতি, ধৈর্য, গাম্ভীর্য প্রভৃতি) এবং বিভূতি (অর্থাৎ কখন সুখ, কখন দুঃখ উদ্ভূত হইয়া নানাপ্রকার রসের আবির্ভাব) প্রভৃতি গুণ ইহাতে থাকা চাই। নাটকে পাঁচ হইতে দশ অঙ্ক থাকে।

নায়ক-চরিত্র

নাটকের **নায়ক** হইবেন গুণবান, প্রখ্যাতবংশজাত, প্রতাপবান, ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরোদ্ধত, রাজর্ষি (যথা দুষ্মন্তাদি), দিব্য (যথা শ্রীকৃষ্ণাদি), দিব্যাদিব্য (যথা রামচন্দ্রাদি) এবং দেবাশীর্বাদে যিনি মানবীতে জন্মিয়াছেন

তিনি (যথা যুধিষ্ঠিরাদি)। দাতা, বীর, কুলীন, সুশীল, রূপযৌবনসম্পন্ন, কর্মক্ষম, জনপ্রিয়, তেজস্বী, বিদগ্ধ, বিনয়ী ও সৎস্বভাবাপন্ন—এই গুণগুলিও নায়কের লক্ষণ। শোভা, বিলাস, ঔদার্য, মাধুর্য, গাম্ভীর্য, ধৈর্য, মহাপ্রাণতা ও আত্মশ্লাঘাহীনতা প্রভৃতি নায়কের অন্যান্য গুণও দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কোন একখানি নাটকে নায়কের সকল লক্ষণ একত্র দেখা যায় না।

অন্যান্য চরিত্র

নাটকের মধ্যে বহু বিচিত্র চরিত্র নাটকের কার্যসাধনে সাহায্য করিয়া থাকে। নায়কের বিপক্ষ চরিত্রকে **প্রতিনায়ক** বলা হয়। সাধারণতঃ প্রতিনায়ককে লোভী, দুর্দান্ত, দুরাচারী এবং দুর্জনরূপে চিত্রিত করা হয়, যেমন রাবণ, দুর্যোধন। নায়কের সমান নয়, অথচ নায়কের প্রধান সহায়, প্রিয়ভাষী, সুচতুর, প্রভুভক্ত, গুণবান চরিত্রকে **পীঠমর্দ** বলে। **বিদূষক** নায়কের দ্বিতীয় সহায়। কুসুম, বসন্ত প্রভৃতি বিদূষকের নাম হওয়া আবশ্যক। তাহার কর্ম, বপু, বেশ ও ভাষা হাস্যরস সৃষ্টি করিবে। অধিকন্তু সে ব্রাহ্মণ, প্রাকৃত-ভাষী, ভোজনপ্রিয়, লোভী ও কর্মকুশল হইবে। নায়কের তৃতীয় সহায় **বিট**। বিট সম্ভোগ দ্বারা অর্থসম্পত্তিহীন, ধূর্ত, আংশিক কলাজ্ঞান-সম্পন্ন, কোন একটি বিশেষ কলা সম্বন্ধে পারদর্শী, বাগ্মী, মধুরস্বভাব এবং মজলিসী। নায়কের চতুর্থ সহায় **চেট** বামন, ষণ্ড, কিরাত, ম্লেচ্ছ, আভীর প্রভৃতি হইয়া থাকে। পুলিশের কর্তা, মন্ত্রী বা অমাত্য, সেনাপতি, প্রাড্‌বিবাক (বিচারপতি), পুরোহিত, দূত, রাজকুমার, কঞ্চুকী (অন্তঃপুরস্থ ভৃত্য ও দাসীদিগের কর্তা), প্রতিহারী প্রভৃতি বহু চরিত্র নাটকের মধ্যে দেখা যায়। **শকার** একটি বিশিষ্ট চরিত্র। মূর্খ, আত্মাভিমানী, হীনবংশজ, রাজার অন্তরঙ্গ অন্তঃপুরচারিকাদের ভ্রাতাকে (রাজশ্যালক) শকার বলে। নায়কের ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্না রমণী নাটকের **নায়িকা** হইয়া থাকেন।

ইতিবৃত্ত

পৌরাণিক ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রখ্যাত কাহিনীই নাটকের অবলম্বনীয় বিষয়, কিন্তু নাট্যকার ইচ্ছা করিলে নিজের মনগড়া কাহিনী অথবা মিশ্র-কাহিনী লইয়াও নাটক রচনা করিতে পারেন। তবে প্রখ্যাতকাহিনীটির ভিতরে অযৌক্তিক বর্ণনা দিবার নিয়ম নাই। গল্পটি ভারতীয় হইবে এবং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের কোন একটি কালে স্থাপিত হইবে।

রস-সম্পাদন

কাব্যের ন্যায় নাটকেরও প্রাণ রস। এই রসকে আশ্রয় করিয়াই নাটক রচিত হয়। তন্মধ্যে শৃঙ্গাররস, বীররস বা শান্তরস—ইহার যে কোন একটি রস নাটকে প্রধানরূপে গৃহীত হয়। অপরাপর রসগুলি অঙ্গ বা অপ্রধানরূপে নাটকের মধ্যে অবস্থান করে। নির্বহণে অর্থাৎ উপসংহারে ইহার কার্য অদ্ভুত হওয়া চাই। নাটকে নায়ক-চরিত্র প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে, রসভাব সমুজ্জ্বল হইবে, শব্দার্থ স্পষ্ট ও পরিপুষ্ট হইবে।

আকৃতি ও প্রকৃতি

নাটকে মুখ্যপাত্র অর্থাৎ কার্যব্যাপৃত পুরুষ চারিটি কিংবা পাঁচটি হইবে। ইহার আকার গোপুচ্ছাদির ন্যায় অর্থাৎ ইহার অঙ্কগুলি ক্রমসূক্ষ্ম হইবে। যেখানে ইতিবৃত্তের এক একটি অংশ শেষ হয় সেখানে **অঙ্ক** কল্পিত হইয়া থাকে। এক অঙ্কের মধ্যে প্রসঙ্গত অন্য বিষয়ের বর্ণনা থাকিলে তাহাকে **গর্ভাঙ্ক** বলে। ঘটনার সামঞ্জস্য রক্ষক একটি অংশ অঙ্কে নিবদ্ধ থাকিবে। এক অঙ্কে বহু প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণিত হইবে না। নাটকীয় অঙ্কে গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ বাক্যের বিন্যাস থাকিলেও পদ্যাপেক্ষা গদ্যাংশ অধিক থাকিবে। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্যের বিরোধী কোনও বিষয় অঙ্কে সন্নিবেশিত হইবে না। বহুকাল-নিষ্পাদ্য বৃত্তান্ত পরিত্যাজ্য। সকল অঙ্কে নায়ক উপস্থিত না থাকিলেও ঘটনাদ্বারা প্রতি অঙ্কেই তাহার সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। অঙ্ক অত্যন্ত দীর্ঘ হইবে না। অঙ্কান্তর্গত চরিত্রগুলি রস ও ভাবের উদ্ভব করিবে। সুদূর হইতে দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, বিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপদান ['অভিজ্ঞান-শকুন্তলা' নাটকে দুর্বাশার শাপ বিষ্কম্ভকে নির্বাহ হইয়াছে বলিয়া দূষণীয় নয়] উৎসর্গ, মৃত্যু, কামপ্রবণতা, দন্তচ্ছেদন, লজ্জাজনক দৃশ্য, নগরাদি অবরোধ, শয়ন, স্নান, অনুলেপন প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা নাটকীয় অঙ্কে নিষিদ্ধ।

নাট্যারম্ভের রীতি

নাট্যবস্তুর পূর্বে নটেরা যাহা বলে তাহাকে **পূর্বরঙ্গ** বা **মঙ্গলাচরণ** বলে। নাটকের প্রথমেই পূর্বরঙ্গ বসে, তারপর **সভাপূজা** অর্থাৎ সভাপ্রশংসন। তারপর **কবির নামাদি কীর্তন**, তারপর **প্রস্তাবনা**। নটী, বিদূষক অথবা সূত্রধারের সহচর পারিপার্শ্বিক যেখানে সূত্রধারের সহিত মিলিত হইয়া কথাবার্তা বলে, সেই অংশের নাম প্রস্তাবনা। পূর্বরঙ্গে বিঘ্নোপশান্তির জন্য **নান্দী** অবশ্য কর্তব্য। দেব, দ্বিজ, নৃপ প্রভৃতির আনন্দদায়িনী **স্তুতি** কিংবা আশীর্বাদকেই নান্দী বলে। পূর্বরঙ্গবিধান করেন **সূত্রধার** অর্থাৎ প্রধান নট।

পূর্বরঙ্গবিধান করিয়া সূত্রধার রঙ্গস্থলে ফিরিয়া আসিয়া কাব্যস্থাপনা করেন। বীজ, মুখ বা পাত্রের সূচনা করেন। উপস্থিত অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে প্ররোচনা করেন। যিনি এই সকল কার্য করেন, তিনি **স্থাপক** নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। সূত্রধার বা স্থাপকের সহকারীকে **পারিপার্শ্বিক** বলে। সূত্রধারের বাক্যে যে পাত্র রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে, তাহাকে **কথোদঘাৎ** বলে। যদি এক প্রয়োগে অন্য প্রয়োগ প্রয়োজিত হয় এবং সেই দ্বিতীয় প্রয়োগে কোন পাত্রের প্রবেশ হয়, তাহাকে **প্রয়োগাতিশয়** বলে। উপস্থিত কালকে অবলম্বন করিয়া যখন কোন পাত্র প্রবেশ করে, তখন তাহাকে **প্রবর্তক** বলে। সাদৃশ্য উদ্ভাবনা হইতে যখন পাত্র প্রবেশরূপে অন্য কার্য সাধিত হয়, তখন তাহাকে **আসাগিত** বলে। নেপথ্যভাষিত ও আকাশভাষিত অবলম্বন করিয়া 'প্রস্তাবনা' কর্তব্য। প্রস্তাবনা করিয়া সূত্রধার রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলে বস্তু আরম্ভ হয়।

নাটকীয় বস্তুর প্রকারভেদ

এই বস্তু বা ইতিবৃত্ত দুই প্রকার—**আধিকারিক** ও **প্রাসঙ্গিক**। নায়কের বা অধিকারীর অভিপ্রায়ানুসারে যে মূল কাহিনীর প্রয়োজন হয়, তাহাকে আধিকারিক বস্তু বলে। প্রসঙ্গক্রমে যে আখ্যান মূলকাহিনী গঠনে সাহায্য করে তাহাই প্রাসঙ্গিক বস্তু, যেমন রামাদির কাহিনীতে সুগ্রীবাদির কাহিনী। কোন এক কার্য চিন্তা করিবার সময়, তৎলক্ষণাক্রান্ত অন্য কার্য আগুন্তক ভাবিলে তাহাকে **পতাকাস্থান** বলে।

অর্থোপক্ষেপ

যে কার্য একদিনেই সম্পাদিত হয়, অথচ সেইখানে অঙ্কচ্ছেদ করিয়া, দিবাবসানে অর্থোপক্ষেপ পূর্বক বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহাকেই অর্থোপক্ষেপ বলে। এই অর্থোপক্ষেপ পাঁচ প্রকারের হইয়া থাকে—বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অঙ্কাবতার ও অঙ্কমুখ। অঙ্কের আদিতে যে দৃশ্যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় অতীত বা ভাবী ঘটনার আংশিক আভাস দেয় তাহাই **বিষ্কম্ভক**। প্রথমাঙ্কের সূচনা ব্যতীত অন্য যে-কোন অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে নীচভাষাভাষী নীচ পাত্রদ্বারা অভিনয় হইলে বিষ্কম্ভকই **প্রবেশক**-রূপে গণ্য হয়। যবনিকার অন্তরাল হইতে পাত্র-পাত্রীদের দ্বারা প্রয়োজনীয় বিষয়ের সূচনাকে **চূলিকা** বলে। কোন অঙ্কের শেষ ভাগে সূচিত ঘটনাশৃঙ্খল অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া পরবর্তী অঙ্কের অবতারণা করিলে তাহাকে **অঙ্কাবতার** বলে। যে অঙ্কের মধ্যে সমস্ত অঙ্কের মূল ঘটনা অর্থাৎ সমস্ত নাটকের বীজার্থ সূচিত হয়, তাহাকে **অঙ্কমুখ** বলে।

অর্থপ্রকৃতি

নাটকের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য পঞ্চসন্ধির ন্যায় নাটকীয় অর্থপ্রকৃতির বিভাগও পাঁচটি—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য। যে মূল ঘটনার উপর সমস্ত আখ্যানবস্তু স্থাপিত তাহাকে **বীজ** বলে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সূচনাহেতু মূল প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্ন প্রায় হইলে **বিন্দু** তাহার সূত্র সংযোগ করিয়া দেয়। নাট্যের শেষপর্যন্ত স্থায়ী প্রাসঙ্গিক চরিতকে **পতাকা** বলে, যথা রামচরিতে— সুগ্রীবাদি, শকুন্তলায়—বিদূষকাদি। অংশবিশেষে ঘটিত প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তের নাম **প্রকরী**। যে কার্য আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু প্রাসঙ্গিক নয়, যাহার জন্য উদ্যোগ এবং যাহার সিদ্ধিতে সকল বিষয়ের সমাপ্তি, তাহাই **কার্য**।

পঞ্চসন্ধি

এই কার্যের পাঁচটি অবস্থা থাকে—আরম্ভ, যত্ন, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি (অর্থাৎ বিঘ্নের অপগমে ফললাভ) ও ফলাভাস। এই কার্যগত পঞ্চ অবস্থার যোগে আখ্যানবস্তুর **পঞ্চসন্ধি** কল্পিত হইয়াছে, যথা—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, নির্বহণ বা উপসংহৃতি। যেখানে বীজের অর্থাৎ মূল কারণের উৎপত্তি তাহাকে **মুখসন্ধি** বলে। প্রধান উপায়ে প্রধান ফলের যেখানে ঈষৎ উদ্ভেদ হয় তাহাকে **প্রতিমুখসন্ধি** বলে। সেই উপায় ঈষৎ প্রকাশিত হইয়া যখন পুনঃ পুনঃ তিরোহিত ও আবার তাহার সন্ধান পাওয়া যায়, তখন তাহাকে **গর্ভসন্ধি** বলে। যখন সেই প্রধান উপায় গর্ভ হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া সবিঘ্ন হয়, তখন তাহাকে **বিমর্ষসন্ধি** বলে। যখন সমস্ত সন্ধিগুলিই এক প্রয়োজন সাধনে পর্যবসিত হয়, তখন তাহাকে **নির্বহণসন্ধি** বা উপসংহৃতি বলে।

[৩]

ইংরেজি নাটক

এলিজাবেথীয় যুগ হইতে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি নাটকের শুরু। এ-যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতেছেন শেকস্‌পীয়র। লাতিন, গ্রীক এবং ইতালীয় নাটকের প্রভাবেই শেকস্‌পীয়রের নাটকগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল। তবে শেকস্‌পীয়র পুরাপুরিভাবে নাটক রচনার প্রাচীন পন্থাকে অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার সময় হইতেই রোমান্টিক নাটক রচনার উদ্ভব হয়। এ-বিষয়ে শেকস্‌পীয়র এক আশ্চর্যজনক সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। শেকস্‌পীয়রের পরেই অষ্টাদশ শতকে গোল্ডস্মিথ ও শেরিডনের নাম উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতকে নাটক খুব উচ্চস্তরে উঠিতে পারে নাই। এ-যুগ মূলতঃ কবিতার যুগ। কবি বায়রন ও কবি শেলী নাটক লিখিতে চেষ্টা করিয়াও সফলতা লাভ করেন নাই। তাঁহাদিগের নাটকগুলি উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদেই নাটকে বাস্তবতা দেখা দেয়। রবার্টসন স্বভাবধর্মী নাটক লেখার প্রবর্তন করেন। রবার্টসনের Society ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে লিখিত হয়।

এই সময়ে ইউরোপীয় নাট্য-ধারার মোড় ফিরাইয়া দেন ইব্‌সেন। ইব্‌সেনের মাধ্যমে স্ক্যাণ্ডিনেভীয় প্রভাব সারা ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। তাহারই ফলে ফরাসী ও রুশীয় নাট্য-সাহিত্য বিশেষ উন্নতি লাভ করে। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় নাট্যকারদের মধ্যে নরওয়ের Bjorson, এবং সুইডেনের Strindberg, ফরাসী নাট্যকারদের মধ্যে Angier, Zola, Flaubert, Becque, Brieux ও Maeterlinck এবং রুশীয় নাট্যকারদের মধ্যে Tolstoi, Tchekov ও Gorki-র নাম এ-যুগের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়।

ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসেও এ-যুগ বিশেষ গৌরবোজ্জ্বল। এ-যুগের নাট্য-সাহিত্যকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) স্বভাবধর্মী নাটক (Naturalistic or realistic drama), (২) কল্পনাশ্রয়ী নাটক (Poetic or imaginative drama). স্বভাবধর্মী নাটক লিখিয়া সার্থকতা লাভ করেন Pinero, Jones, Barrie, Barker, Houghton, Noel Coward, Maugham, Galsworthy এবং Bernard Shaw. কল্পনাশ্রয়ী নাটক লিখিয়া যশস্বী হন Yeats, Synge, Drinkwater, Masefield, Abercombie, Bottomley, Munro এবং Berkley.

স্বভাবধর্মী নাটকে নাট্যকার জীবনকে যেমনভাবে দেখিয়া থাকেন, ঠিক তেমনিভাবে চিত্রিত করিয়া থাকেন। তবে সেই সঙ্গে নাট্যকারের কৃতিত্বও যথেষ্ট থাকে। তিনি ফটো তোলেন না, তিনি সৃষ্টি করেন। তাঁহার মানস-দৃষ্টি দিয়া তিনি মানুষের জীবনের সত্যটুকু অনুসন্ধান করেন। সেই সত্য চরিত্র-সৃষ্টি ও ঘটনা-সংস্থাপনের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কথাগুলি এমনভাবে সাজান হয় যে তাহাতে চরিত্র ও গল্পটি সহজেই বিকশিত হয়। গার্হস্থ্য-জীবন স্বভাবধর্মী নাটকের উপজীব্য। বাস্তবজীবন হইতে ইহার উপাদান সংগৃহীত হয় বটে, কিন্তু ইহাতে বস্তুগত সকল জিনিসই গ্রহণ করা হয় না। সাহিত্যের উপযোগী যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই গ্রহণ করা হয়। খানিকটা লেখক মনের দ্বারা-সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অন্যপক্ষে, কল্পনাশ্রয়ী নাটকে থাকে সাংকেতিকতা ও অদ্ভুতভাব, প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি ও সত্য, মানুষের আত্মার রহস্য।

স্বভাবধর্মী নাট্যকার হিসাবে ইব্‌সেনের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ইব্‌সেনের A Doll's House একখানি যুগান্তকারী নাটক। ইব্‌সেনের প্রভাব

ইংরেজি নাট্য-সাহিত্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইব্‌সেন কল্পনাশ্রয়ী নাটকও কয়েকখানা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার The Wild Duck এবং The Master Builder—এই দুইখানি নাটকই সাংকেতিকতা ও কবিত্বে পূর্ণ। মেটারলিঙ্কের The Blue Bird এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নাটক।

বারনার্ড শ বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে ইঁহার প্রভাব অপ্রতিহত। ইনি একজন দার্শনিক এবং গতানুগতিকতা-বিরোধী। কোন প্রচলিত মতই ইনি বিশ্বাস করেন না। ইঁহার ব্যঙ্গের ছুরি অত্যন্ত ধারাল। মানুষ তাহার উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছে দেখিলেই ইনি বিরক্ত হন। প্রথম দিকে ইনি ইব্‌সেনের অনুসরণে বাস্তববাদী ছিলেন, বর্তমানে ইনি অদ্ভুতরসাশ্রয়ী হইয়াছেন। সংলাপ ও আখ্যান রচনায় ইঁহার বৈশিষ্ট্য। ইঁহার অধিকাংশ নাটকই আলোচনা-মূলক।

গলস্‌ওআর্দি ইব্‌সেনের মত বাস্তববাদী। ইনিও সংলাপের মধ্য দিয়া আলোচনা প্রবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু শ'-র মত অতখানি নয়। আধুনিক জীবনের সমাজ-সমস্যা লইয়া ইঁহার অধিকাংশ নাটকের আখ্যান রচিত হইয়াছে। ইঁহার মতে, নাট্যকার কোন বাঁধাধরা নীতি প্রচার করিবেন না। মানুষের জীবনের ও চরিত্রের সহজ অবস্থা বর্ণনা করিবেন; কিন্তু সেই অবস্থাকে নিজ মতবাদের দ্বারা বিকৃত করিবেন না। প্রত্যেক পাঠক এবং দর্শক যেন নিজ নিজ বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুসারে নাটকীয় রস গ্রহণ করিতে পারে।

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধ-বিরতির পর নাটক লেখার পদ্ধতি কিছুটা বদলাইয়া গিয়াছে। যুদ্ধাবসানের পর নানা বিষয়ে বহু প্রতিভাশালী লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে। নাট্য-রচনা বিষয়েও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। প্রত্যেক লেখকের মধ্যে মানুষের লক্ষ্যহীন চঞ্চল জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের অকল্যাণকর অবস্থা ও বর্বরতার নিন্দা করিয়া কয়েকখানি উৎকৃষ্ট নাটকও লিখিত হইয়াছে।

আধুনিক নাটক আজ জাতীয় চিন্তার শক্তিশালী বাহন হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে। তাই বর্তমানের নাট্যকারগণ 'রোমান্স'-রচনার দিকে দৃষ্টি না দিয়া সমাজ-মানসের উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষ ইতিহাস রচনার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ইংরাজি সাহিত্যের রাজ্যে এইরূপ কয়েকজন শক্তিশালী লেখক দেখা দিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ইংরেজ, আইরিশ ও আমেরিকাবাসী—সবাই আছেন। Bax, Hous-man, Noyes, Bennett, O'Neill, O'Casey-র নাম এই সম্পর্কে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বর্তমান নাট্যকারেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তববাদী, কিন্তু সে বাস্তবতা নগ্ন বাস্তবতা নয়। তাঁহাদিগের লেখায় বিশ্ব-মানবের চিরন্তনী আশা-

আকাঙ্ক্ষার ভাব লুক্কায়িত থাকে। সুপ্রসিদ্ধ আইরিশ নাট্যকার ও'কেশী তাঁহার একখানি নাটকে আয়রলণ্ডের দুঃখের দিনের একটি বাস্তব-চিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, আয়রলণ্ড যে দুঃখের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহা বিশ্ব-মানবের দুঃখেরই অন্তর্গত।

আধুনিক নাটক রচনার কোন বিশেষ আদর্শ বা মানদণ্ড নাই। গলস্‌ওআর্দি আধুনিক স্বভাবধর্মী নাটকের কলাকলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"Naturalistic art is like a steady lamp, held up from time to time in whose light things will be seen for a space clearly and in due proportion, freed from mists of prejudice and partisanship." আধুনিক নাট্যকারেরা সর্বদা বুদ্ধি ও বিচার শক্তির দ্বারা প্রাচীন আদর্শের মৃত্যু অথবা স্থায়িত্ব ঘোষণা করেন। ইব্‌সেনের মতে,—"The ideal is dead, long live ideal." বারনার্ড শ' ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "What Ibsen insists on is that there is no golden rule—that conduct must justify itself by its effect upon life and not by its conformity to any rule or ideal."

রস-সৃষ্টি ব্যাপারে আধুনিক নাট্যকারেরা অত্যন্ত সাবধান। কোন কিছুরই বাহুল্য ইঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। বাহিরের জাঁকজমক অপেক্ষা মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের দিকে ইঁহাদিগের ঝোঁক বেশি। কথা অপেক্ষা কথোপকথন ইঁহাদিগের নিকট অধিক মূল্যবান। ইঁহাদিগের মতে সংলাপের মধ্যে দীর্ঘ বক্তৃতার স্থান নাই। কোন চরিত্রই অহেতুক প্রাধান্য লাভ করিবে না। ঘটনা-সংস্থাপনের মধ্যেই চরিত্রগুলি আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিবে।

আঙ্গিক রচনায় আধুনিক নাট্যকারেরা একেবারে নূতন পথ ধরিয়াছেন। আধুনিক নাটক প্রায় অল্প কয়েকটি দৃশ্যে অথবা এক হইতে তিন অঙ্কের মধ্যে সমাপ্ত হয়। আধুনিক নাটকের অভিনয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হইয়া যায়। এই শ্রেণীর নাটকে নৃত্য-গীতের বাহুল্য থাকে না। স্থান-কাল-ঘটনার একটা নিবিড় ঐক্য সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা লইয়া ইহার আখ্যানভাগ রচিত হয়। স্বগতোক্তি (Soliloquy) জনান্তিক (Aside) এবং দূতের মুখে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া অতীত ইতিহাস বর্ণনা প্রভৃতি আধুনিক নাটকে আর দেখা যায় না।

[৪]

আধুনিক বাঙলা নাটক ও নাটমঞ্চ

ইংরেজি নাটকের অনুকরণে আধুনিক বাঙলা নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই আধুনিক বাঙলা নাটকে স্বতন্ত্রভাবে মৌলিকতা ফুটিয়া ওঠে নাই। প্রকৃত স্বভাবধর্মী নাটক বলিতে ইউরোপীয় নাট্য-সাহিত্যে যাহা বুঝায়, আমাদের সাহিত্যে তাহা নাই। তবে আধুনিক কল্পনাশ্রয়ী নাটক-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলী প্রথম শ্রেণীতে গণ্য। আধুনিক নাটক বলিতে আমরা সাধারণতঃ স্বভাবধর্মী নাটকই বুঝিয়া থাকি। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের নাটকাবলী এই প্রবন্ধের বিচার্য নয়।

আধুনিক বাঙলা নাটক লেখা শুরু হয় গত শতাব্দী হইতে। শেকস্‌পীয়রকে অনুকরণ করিয়া বাঙলা নাটকের গোড়াপত্তন হয়। শেকস্‌পীয়রের আদর্শে মাইকেল তাঁহার পঞ্চাঙ্ক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' রচনা করিয়াছিলেন। ইংরেজি নাটকের রচনা-পদ্ধতি শেকস্‌পীয়রকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু আমরা এখনও শেকস্‌পীয়রের অনুকৃতিতে ব্যস্ত আছি। এখনও বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে মাইকেলের যুগ উত্তীর্ণ হয় নাই। ভাবের দিক দিয়া ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে এখনও শেকস্‌পীয়রের অনুকরণ চলিতেছে। তবে রূপ-সৃষ্টির দিক দিয়া আমাদের সামাজিক নাটকগুলির কিছুটা উন্নতি হইয়াছে বলা চলে। যুগধর্মের দিক দিয়া তাহা হইতে বাধ্য। স্বগতোক্তি, সুদীর্ঘ ভাষণ, হৃদয়াবেগের বাহুল্য,—এ সকলই এখন সাম্প্রতিক বাঙলা নাটকে কমিয়া আসিতেছে। অভিনয়ের সময়ও এখন সংক্ষিপ্ত হইতেছে। মোটামুটিভাবে এগুলি শেকস্‌পীয়রের রচনা-পদ্ধতির পরিমার্জিত সংস্করণ। দুই চারিখানি নাটকে ইব্‌সেনের রচনা-পদ্ধতি লক্ষ্য করা যাইতেছে।

বাঙলা দেশে শক্তিমান কবি ও ঔপন্যাসিকের অভাব নাই। কিন্তু শক্তিমান নাট্যকারের পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণ হয়তো, যাঁহারা নাটক লিখিয়াছেন, তাঁহারা রঙ্গমঞ্চের মুখ চাহিয়া লিখিয়াছেন, স্বাধীনভাবে কেহই নাটক রচনা করেন নাই। সেইজন্য তাঁহাদের নাটক নাটক-হিসাবে সার্থকতাও লাভ করে নাই। দুই চারিজন যাঁহারা স্বাধীনভাবে নাটক লিখিয়াছেন, তাঁহাদের নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই বলিয়া তাঁহাদিগের নাটকের আদর নাই। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, নাটক যেমন একদিকে খানিকটা রঙ্গমঞ্চ-নিরপেক্ষ অন্যদিকে আবার তেমনি খানিকটা রঙ্গমঞ্চের সহিত যোগযুক্ত। নাটক প্রকৃতপক্ষে অভিনয়ের বাণী-চিত্র। অভিনয় করিয়া তাহাকে যাচাই করিয়া লইতে হয়।

বাঙলার যে বর্তমানে মৌলিক নাটক বা নাট্যকার নাই তাহা বুঝিতে পারা

যায় নাট্যালয়ের অভিনীত নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই। কিছুদিন হইতে নাট্যালয়ে উপন্যাসের নাট্যরূপ লইয়া অভিনয় আয়োজন চলিতেছে। ইহাতে অর্থাগম কিছু হইতেছে বটে, কিন্তু নাটকের উন্নতি কোনক্রমেই হইতেছে না। ইহাতে বাঙলা নাটক ও নাট্যালয় দিনে দিনে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িতেছে।

আধুনিক বাঙলা নাটককে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) পৌরাণিক, (২) স্বভাবধর্মী, (৩) কল্পনাশ্রয়ী। ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে ধর্ম বা পুরাণকে আশ্রয় করিয়া বর্তমানে কোন নাটক লেখা হয় না। শেকস্‌পীয়রের আগের যুগে বাইবেলকে আশ্রয় করিয়া Mystery, Miracle ও Morality শ্রেণীর নাটকগুলি লেখা হইয়াছিল। ইংরেজি নাটকে ধর্মের যুগ সেখানেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙলা দেশের পক্ষে পৌরাণিক নাটকের এখনও বিশেষ প্রয়োজন আছে। পৌরাণিক নাটকের বিষয়গুলি এখনও বাঙ্গালীর মর্মাশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এখনও পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হইলে বাঙ্গালী দলে দলে গিয়া দেখে এবং আনন্দ লাভ করে। সুতরাং বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে এখনও পৌরাণিক নাটকের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই।

বাঙলাদেশের অধিকাংশ নাট্যলেখকই পালাকার (Playwright), নাট্যকার (Dramatist) নন। আবার সেই পালা-রচনায়ও তাঁহাদিগের মৌলিকতা খুব কম। শেকস্‌পীয়রের আদর্শে তাঁহাদিগের চরিত্রগুলি কথা বলে। সর্বত্রই কথপোকথন অপেক্ষা কথাই বেশি। নাট্যাভিনয় দেখিতে দেখিতে নাট্যকারের কথার জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হয়। স্বগতোক্তি, অসংযত ভাষণ, অসম্ভব হৃদয়াবেগ—একটু পুরাতনধর্মী নাটকে অজস্র পাওয়া যায়। ঐ সব নাটকে কথা ফুরাইয়া গেলে আসে গান, আবার গান ফুরাইয়া গেলে আসে কথা। এমনি করিয়া কথা ও গান হাত ধরাধরি করিয়া চলে। ইহা মোটেই আধুনিকতার লক্ষণ নয়।

একবার একজন সমালোচক লিখিয়াছিলেন,—"বাঙলা নাট্য-সাহিত্যে এখনও কান্নাকাটির যুগ চলিতেছে।" কথাটা বোধ হয় একেবারে মিথ্যা নয়। আজকের দিনেও, যে-কোন থিয়েটার বা বায়োস্কোপে গেলেই এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়। বাঙলায় যে-নাটকে যত বেশি কান্না থাকে, সে-নাটক তত বেশি জনপ্রিয় হয়।

কিন্তু এ-বিষয়ে নাট্যকারদের একটু কর্তব্যও আছে। নাট্যকারদের কাজ কেবলমাত্র দর্শকদের কাঁদানো নয়। নাট্যকারদের কাজ দর্শকদের মনকে সুস্থ ও সবল করিয়া গড়িয়া তোলা। জাতির ধ্যান-ধারণা রঙ্গালয়ের প্রত্যক্ষ আবেদনের ভিতর দিয়া জনসাধারণের কাছে নাট্যকারকেই পৌঁছিয়া দিতে হয়। মানুষের জীবনে নাটক আসে একটি বিশেষ ক্ষণে। সেই বিশেষ

ক্ষণটিকে নির্বিশেষ করিয়া তোলার দিকে থাকে নাট্যকারের লক্ষ্য। তাহার স্থিতিকালও আবার দীর্ঘ নয়। সেই স্বল্পকালের মধ্যে কাহারও জীবনে আসে সুখ, কাহারো জীবনে আসে দুঃখ। সেই সুখ-দুঃখ লইয়া রচিত হয় জীবনের কমেডি ও ট্র্যাজিডি। নাট্যকার রচনা করেন মানুষের জীবনের সেই কমেডি ও ট্র্যাজিডি। তাঁহার রচনায় বক্তৃতার অপেক্ষা থাকে ইঙ্গিত, সমাধানের অপেক্ষা থাকে সংকেত।

আধুনিক নাটককে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে নূতন নাট্যরূপ সৃষ্টি করিতে হইবে। নাটকীয় বিষয়বস্তুতে আজকের দিনের জীবনসমস্যা প্রবর্তন করিতে হইবে। স্থান, কাল ও ঘটনার ঐক্য বিষয়েও কিছুটা সচেতন হইতে হইবে। জনপ্রিয়তার সহজ উপায়গুলি নাট্যকারদের সর্বদা পরিত্যাগ করিতে হইবে। গতানুগতিক পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা ছাড়িতে হইবে। সংক্ষেপে জাতীয় জীবনের মনোহারিত্ব ও আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনা এমন করিয়া সংস্থাপিত করিতে হইবে, যাহাতে অজ্ঞ ও স্বল্পজ্ঞানী জনসাধারণের মনও তৃপ্ত হয়। মানব-জীবনের সাম্প্রতিক দুঃখ, বেদনা, নৈরাশ্য প্রভৃতি তীব্র-মধুর ভাষায় ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। নাটকে সমাজের কতকগুলি বিশেষ চরিত্র না দেখাইয়া সমগ্রভাবে মানুষের জীবনকে দেখাইতে হইবে।

নাটকের কথা বলিতে গেলে আসে রঙ্গালয়ের কথা। নাট্যাভিনয়ের উন্নতি না হইলে নাটকের উন্নতি কখনই হয় না। ইউরোপে নাটক আজ পেশাদারি রঙ্গাধ্যক্ষদের সম্পত্তি নয়। সে-দেশে নাটক আজ সমগ্র জনগণের মানসিক ও আর্থিক উন্নতির বাহনরূপে গৃহীত হইয়াছে। আমাদের দেশে ইহাকে আর কাব্যের অন্তর্গত করিয়া কোণঠাসা করিয়া রাখিলে চলিবে না। নাট্যকারতো নাটকে নূতন আঙ্গিক সৃষ্টি, নূতন রস-কল্পনা করিবেনই, তাহা ছাড়া তাঁহাকে অভিনয়েরও নূতন পথ উন্মুক্ত করিতে হইবে। এ-বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন মঞ্চশিল্পী ও নটনটীরা। জীবনব্যাপী সাধনা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তনে ও-দেশের বহু মঞ্চশিল্পী ও নট-নটী জগৎ-বিখ্যাত হইয়াছেন। নাট-মঞ্চের সংস্কার সাধনে ইউরোপের বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মঞ্চশিল্পী রাইন্‌হার্ট (Reinhardt), মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রবর্তক স্টানিশ্‌লাভ্‌স্‌কি (Stanislavsky) এবং সুবিখ্যাত মঞ্চশিল্প-স্রষ্টা গর্ডন ক্রেগের (Gordon Craig) দান আজ সারা বিশ্বের লোক শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে।

আমরা শুনিতে পাই পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে বাংলা রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চ হইতে যখন চিত্রিত দৃশ্যপট উঠিয়া গেল, তখন তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য আমরা প্রাণপণে কি চেষ্টাটাই না করিতেছি! Revolving stage-এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া গিয়াছে, অথচ বাঙলা রঙ্গমঞ্চ তাহাকে নূতন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। ইহাতে যে অভিনয়ের

কৌশল ও ভ্রান্তি নষ্ট হইয়া যায়—সে খেয়াল কাহারও নাই। ইউরোপে আজ বস্তু-শিল্পের (Plastic art-এর) সাহায্যে নাট্যাভিনয় পরিচালিত হইতেছে। বাঙলা দেশে দুই একখানি নাটকে এইরূপ অভিনয়ের ধারা প্রবর্তনের চেষ্টা দুই একবার দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়িত্বলাভ করে নাই। এ-বিষয়ে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ও শ্রীযুক্ত সতু সেন স্মরণীয়। সতু সেন প্রযোজিত 'ঝড়ের রাতে' ও 'বিষ্ণুপ্রিয়া'র আলোক-সম্পাত বিশেষ প্রশংসনীয়।

আমাদের দেশে নাটক ও নাটমঞ্চের উন্নতি করিতে হইলে এই বস্তুশিল্পের সাহায্য লইতে হইবে। অবশ্য আগামীকালের নাট্যাভিনয় কি রূপ লইবে তাহা এখন আন্দাজ করিয়া বলা অন্যায়। সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চাধ্যক্ষ গর্ডন ক্রেগ যে আগামী কালের অভিনয় পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার মূলে রহিয়াছে Uber Marionette অর্থাৎ ভবিষ্যতের অভিনয় হইবে মৌনতায়, আর অভিনয় করিবে মানুষ অভিনেতা নয়, পুতুল। সুতরাং কালের সঙ্গে পা ফেলিয়া আমাদিগকে সকল সময় চলিতে হইবে। কালোত্তীর্ণ জিনিসকে ধরিয়া থাকিলে আমাদের মৃত্যুকেই বরণ করিয়া লওয়া হইবে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নাট্যাভিনয় ব্যাপারে গতানুগতিকতার পথ অবলম্বন করেন নাই। তিনি ইউরোপীয় নাটমঞ্চের রূপসজ্জাকে ছেলেমানুষি বলিয়াছেন। আবার বাংলা নাটমঞ্চের ঘন ঘন পটক্ষেপণকে তিনি সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "নিজের কবিত্ব কবির পক্ষে যথেষ্ট, বাইরের সাহায্য তাহার পক্ষে সাহায্যই নয়; সে ব্যাঘাত; এবং সে অনেক স্থলে স্পর্ধা। ......অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত।" রবীন্দ্রনাথের মতে দৃশ্যপটের বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া নাটকের গভীর অর্থটি দর্শকদের মনে সহজ, সরল ও স্বাভাবিকভাবে প্রতিফলিত করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলিয়াছেন, সে-কথাগুলি কল্পনাশ্রয়ী নাটকের প্রযোজনা সম্বন্ধে বেশ খাটে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ের সময় এইরূপ পথই অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু স্বভাবধর্মী নাটকের অভিনয় ব্যাপারে বস্তুশিল্পেরই সাহায্য লইতে হইবে। চলচ্চিত্রের রচনায় এই শিল্পের বহুল প্রচার আমাদের দেশেই হইয়াছে; অথচ নাটমঞ্চের অধিকারীরা এ-বিষয়ে একেবারে উদাসীন। এ-কথা সত্য যে, ইহা কিঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ; কিন্তু জাতীয় শিল্প-শিক্ষা ও সৌন্দর্য-বিকাশের ভার যাঁহাদের হাতে রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে কিছুটা উদারভাবাপন্ন হইতে হইবে। সেইসঙ্গে প্রেক্ষাগৃহেরও আমূল সংস্কার সাধন করিতে হইবে। প্রেক্ষাগৃহের বর্তমান আবহাওয়া বদলাইয়া ইহাকে প্রকৃত শিল্প-মন্দিরে পরিণত করা একান্ত প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, যেখানে শিল্পীদের বাস, সে-স্থান কখনো ধূলিমলিন ও কুৎসিত হইতে পারে না।

[৫]

বাঙলা নাট্যালয়ের ইতিকথা

ভাস, শূদ্রক, ভবভূতি প্রাচীন ভারতবর্ষের কবিরা অসংখ্য নাটক লিখিয়াছিলেন। সে সকল নাটক যে এককালে অভিনীত হইয়াছিল, তাহার বহুল প্রমাণ এখনও নানা পুরাণ ও কাব্যে বর্তমান আছে। রামগড় পাহাড়ে রঙ্গালয়ের খোদিত চিত্রগুলি সে-কালের অভিনয়ের এখনও সাক্ষ্য দিতেছে। ভরত-নাট্যশাস্ত্রখানি প্রাচীন ভারতের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধীয় একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। সে-কালে নাট্যকলা যে উন্নতির চরম সোপানে উঠিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে-যুগের নাট্যধারা আমাদের কাছে পৌছায় নাই। সে ধারা হারাইয়া গিয়াছে।

মুসলমান শাসনকালে নাট্য-সাহিত্য প্রসারলাভ করে নাই। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে অভিনয়ের সমর্থন নাই। কিন্তু সে যুগেও বঙ্গদেশে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সপারিষদ 'রুক্মিণী-হরণ'-নামক একটি নাট্যগীতের অভিনয় করিয়াছিলেন। পুরীতে রূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া 'বিদগ্ধ-মাধব' 'ললিত-মাধব' নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রায় রামানন্দের 'জগন্নাথ-বল্লভ' ও পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়'-নাটক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। গঙ্গাধর নামক এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের লেখা 'পারিজাত-মঞ্জরী'-নাটক প্রস্তর গাত্রে খোদিত দেখা যায়।

এই সময়ে এবং ইহার পূর্ববর্তী সময়ে এ-দেশে নাট্যাভিনয়ের সমতুল্য আমোদ-প্রমোদের নানাপ্রকার ব্যবস্থা ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনখানি ঝুমুর-নাটগীতের একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'-ও এই শ্রেণীর নাটগীতি। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের লোক চৈতন্যযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, কথকথা, কবির লড়াই, পাঁচালি, খেউড়, তর্জা, আখ্‌ড়াই, হাফ-আখ্‌ড়াই, পুতুলনাচ প্রভৃতি দেখিয়া আনন্দলাভ করিত। পূর্বে যাত্রার কোন বাঁধাপালা ছিল না। গানগুলি নির্দিষ্ট থাকিত, অভিনেতারা উপস্থিত মত কথোপকথন তৈরি করিয়া লইত। সপ্তদশ শতকে যাত্রার কয়েকটি বাঁধাপালা বাঙলাদেশ হইতে নেপালে গিয়াছিল। নেপালে প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পালাটি ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের কাহিনী লইয়া রচিত।

আমোদ-প্রমোদের বিপুল আয়োজন থাকিলেও রঙ্গপীঠ বা প্রেক্ষাগৃহের কথা তখন জানা যায় না। বর্তমান রঙ্গালয় ও অভিনয়-পদ্ধতি বিজাতি রঙ্গালয়ের অনুকৃতিতে গঠিত। প্রাচীন ভারতের নাট্যাভিনয়ের সহিত ইহার

কোন সম্পর্ক নাই। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হয়। তৎপূর্বে এ-দেশে ইংরেজেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যপদেশে বাস করিতেন। সেই সময়ে তাঁহারা এ-দেশে চিন্তায়, শিক্ষায়, ধর্মে, সামাজিক পরিস্থিতিকে এক নূতন আবহাওয়ায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহারই ফলে ইংরেজ-প্রভাব বাঙালীর মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'ডো'-সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, নাদির শাহ যখন দিল্লী আক্রমণ করিয়া তথাকার লোকদের পীড়ন ও অত্যাচারে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলেন, তখন 'টুকী'-নামক এক বিদেশী অভিনেতা অভিনয় দেখাইয়া নাদির শাহকে মুগ্ধ করেন। তাঁহারই প্রার্থনাক্রমে নাদির শাহ বহু লোককে মুক্তি দেন। ইহাই বোধ হয় এ-দেশে বিদেশীগণ কর্তৃক প্রথম নাট্যাভিনয়।

ইংরেজ-শাসনের গোড়ার যুগে ইংরেজেরা নিজেদের চিত্তবিনোদনের জন্য বাঙলায় সংগীত-ভবন, নৃত্যপীঠ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের এক বৎসর পূর্বে লালবাজারে Play House (১৭৫৬) নাম দিয়া তাঁহারা একটি রঙ্গালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার পরে ক্রমে ক্রমে লায়ন্স রেঞ্জ ও ক্লাইভ স্ট্রীটের মোড়ে The New Play House বা Calcutta Theatre (১৭৭৫), চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের মোড়ে Chowringhee Theatre (১৮১৩), পার্ক স্ট্রীটস্থিত সেণ্ট জেভিয়াস কলেজের সংলগ্নস্থলে Sans Souci (সাঁস্থচি-১৮৩৯) প্রভৃতি রঙ্গালয় খোলা হয়। এই সকল রঙ্গালয়ে ইংরেজি নাটক অভিনীত হইত এবং ইংরেজ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অভিনয় করিতেন।

এই সকল ইংরেজি অভিনয় দেখিয়া ক্রমে এ-দেশীয় বহু দর্শকের মনে নাট্যানুরাগ সমুদিত হয়। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে কাব্য-নাটক পড়িয়া এবং ইংরেজের নাট্যশালায় ইংরেজি অভিনয় দেখিয়া অনেকের মনে ইংরেজের অনুকরণে নাট্যশালা স্থাপনার ইচ্ছা জাগিল। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়োর বাগান বাড়িতে 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই বাঙালী কর্তৃক স্থাপিত প্রথম রঙ্গালয়। বাঙলা নাটকের অভাবে এখানে 'জুলিয়াস সিজর'-এর কিয়দংশ এবং উইলসন সাহেব কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত 'উত্তররাম চরিত' অভিনীত হয়। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে এই রঙ্গালয়ে Nothing Superfluous নামে একখানি প্রহসন খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। তবে এই নাট্যালয় বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই।

এই সময়ে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা তাহাদিগের উৎসবাদিতে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি ও ইংরেজি নাটকের অংশবিশেষ অভিনয় করিত। ১৮৩৭ খ্রীঃ কলিকাতার লাট-প্রাসাদে হিন্দু-কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায়

ছাত্রেরা শেকস্পীয়রের নাটকের অনেকগুলি অংশ আবৃত্তি করিয়াছিল। ১৮২৩ খ্রীঃ ডেভিড হেয়ার একাডেমির ছাত্ররা 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' অভিনয় করে। তাহাদিগের অভিনয় সাফল্য দেখিয়া ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্রেরা ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার নাম দিয়া একটি নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৫৩ খ্রীঃ এই নাট্যালয়ে 'ওথেলো'র অভিনয় হয়। ১৮৫৪ খ্রীঃ এখানে 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' অভিনীত হয়। এই নাট্যাভিনয়ে মিসেস্ গ্রীগ্-নাম্নী একজন ইংরেজ মহিলা পোর্শিয়ার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া সু-অভিনয় করেন। এই রঙ্গমঞ্চেই ১৮৫৫ খ্রীঃ শেকস্পীয়রের 'চতুর্থ হেনরি' ও মেরিডিথ পার্কারের 'আমাটোর' নামে একখানি প্রহসনের অভিনয় হয়। ১৮৫৪ খ্রীঃ 'জুলিয়াস সিজর' অভিনয়ের পর এই নাট্যালয় বন্ধ হইয়া যায়।

বাঙালীদের অভিনয়ে যেমন মাঝে মাঝে ইংরেজ পুরুষ ও মহিলারা অভিনয় করিতেন, তেমনি ইংরেজদের অভিনয়ে বাঙালী অভিনেতারাও কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে যোগদান করিতেন। 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৮৪৮ খ্রীঃ এদেশীয় প্রসিদ্ধ নর্তক বাবু বৈষ্ণবদাস আঢ্য সাঁসুচি নাট্যশালায় ইংরেজদিগের সহিত 'ওথেলো'র অভিনয় করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

এই পর্যন্ত বাঙলা রঙ্গমঞ্চে ইংরেজি নাটকের অভিনয়ের কথা বলা হইল। এইবারে বাঙলা নাটকের অভিনয়ের সূচনার কথা কিছু বলিব। বাঙলা নাটকের অভিনয় সূচনা করেন একজন বিদেশী, নাম তাঁহার খেবাসিম লেবেডিয়েফ্। তিনি ছিলেন একজন রুশদেশীয় পর্যটক। তিনি তদানীন্তন-কালের গবর্ণর জেনারেল সার জন্ শোরের অনুমতিক্রমে কলিকাতার মধ্যভাগে ডুম তলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রীটে) ১৭৭৫ খ্রীঃ একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেন। তাঁহার নিজের বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে, তিনি The Disguise ও Love is the Best Doctor নামে দুইখানি ইংরেজি নাটক অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে The Disguise নাটকখানির বঙ্গানুবাদ দুইবার অভিনীত হয়। ইহার প্রথম অভিনয় হয় ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় অভিনয় হয় ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে। ইহাতে বাঙালী স্ত্রী ও পুরুষ অভিনেতারা অংশ গ্রহণ করেন। ইহার অভিনয়-কালে ভারতীয় সংগীত যোজনা করা হয়। অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে ভারতচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করার ব্যবস্থা ছিল।

বাঙালীর দ্বারা প্রথম নাট্যাভিনয়ের সূচনা হয় শ্যামবাজারের নবীন বসুর বাড়িতে। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে এখানে সুখ্যাতির সহিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাট্যাভিনয় হয়। তৎপূর্বে এখানে আরও নাটক অভিনীত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ জানা যায় না। বিদ্যাসুন্দর নাটকে স্ত্রীভূমিকাগুলি স্ত্রীলোকেরাই গ্রহণ করিয়াছিল। এই অভিনয়ের আরও বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে,

নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য বাড়ির বিভিন্ন অংশে অভিনীত হইয়াছিল। অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকরাও এক স্থান হইতে অপর স্থানে স্থানপরিবর্তন করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বাঙলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের গতি পরিবর্তিত হয়। ইহার পূর্বে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া যে নাট্যশালাগুলির পত্তন হইয়াছিল, তাহার কোনটিই দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। দীর্ঘস্থায়ী না হইবার কারণ হয়তো মূলতঃ এই ছিল যে, এই নাট্যশালাগুলি ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খেয়াল প্রশমিত হইবার পরেই এ-গুলিরও পতন হইয়াছে। তাহাছাড়া দীর্ঘকাল চলিবার মত ভাল নাটক দেশে তখন ছিল না। ভাল নাটক না থাকিলে নাট্যশালা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। এক্ষেত্রে জনসাধারণের শিক্ষা ও রুচির কথাও কিছুটা ভাবিতে হইবে। জনসাধারণের শিক্ষা ও রুচি তখন উন্নত ছিল না বলিয়া নাট্যশালার উন্নতি হয় নাই।

বাঙলা নাট্যশালার পক্ষে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর হইতে মৌলিক নাটকের অভিনয় শুরু হইয়াছে এবং ইংরেজি নাটকের অভিনয় উঠিয়া গিয়াছে। এই বৎসরেই বাঙলার মৌলিক সামাজিক নাটক 'কুলীন-কুলসর্বস্ব'-এর অভিনয় হয়, নূতন-বাজারের রামজয় বসাকের বাড়িতে। 'কুলীন-কুলসর্বস্ব'-এর পূর্বে অবশ্য দুইএকখানি মৌলিক নাটকের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) ও তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'কীর্তিবিলাস' বাঙলার প্রথম দুঃখময় নাটক। 'ভদ্রার্জুন' নাটকের বিষয় মৌলিক না হইলেও, রচনাপদ্ধতি সম্পূর্ণ মৌলিক। কিন্তু এই দুইখানি নাটক অভিনীত হয় নাই।

এই সময় হইতে দেশের সর্বত্র রীতিমত অভিনয় আয়োজন চলিতে থাকে। কতিপয় শখের নাট্যশালার পূর্ণবিকাশ এই সময় হইতে দেখা যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে ১৮৫৬ খ্রীঃ বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' অভিনীত হয়। পরে এই নাট্যশালাতেই কালীপ্রসন্নের রচিত 'বিক্রমোর্বশী' ও 'সাবিত্রী ও সত্যবান নাটক' অভিনীত হয়। ১৮৫৮ খ্রীঃ পাথুরিয়াঘাটার জমিদার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরামর্শে ও পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে 'বেলগাছিয়া থিয়েটার'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। রামায়ণের লেখা নাটক 'রত্নাবলী' এখানে প্রথম অভিনীত হয়। সেই অভিনয়ে ইংরেজি থিয়েটারের অনুকরণে প্রথম দেশীয় ঐক্যতানবাদনের প্রবতন হয়। ইংরেজ দর্শকদের সুবিধার জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন। 'রত্নাবলী'র লিখনভঙ্গি পছন্দ না হওয়ায় বন্ধু গৌরদাস বসাকের অনুরোধে মাইকেল বাঙলা নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে

বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই নাট্যশালা উঠিয়া যায়।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সাফল্যে কলিকাতার নানাস্থানে অভিনয়ের ধূম পড়িয়া যায়। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত হইবার পূর্বে যে সকল শখের নাট্যালয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে নাম করা যাইতে পারে—(১) মেট্রোপলিটন থিয়েটার (প্রথম অভিনয় রজনী—১৮৫৯), (২) পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় (১৮৬২), (৩) শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি (১৮৬৫), (৪) জোড়াসাঁকো থিয়েটার, (৫) বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয় (১৮৬৭), (৬) বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার (পরে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ)—(১৮৬৮) প্রভৃতি। ইহা ছাড়াও বর্ধমান, ভাটপাড়া, চুঁচুড়া, শিবপুর, চন্দননগর প্রভৃতি স্থানেও পাল্লা দিয়া থিয়েটার চলিতেছিল। তখনকার দিনের একটি সংবাদপত্র হইতে জানা যায়—"প্রায় প্রত্যেক গলিতে নাটকাভিনয় আরম্ভ হওয়াতে নিষ্কর্মা লোক মাত্রেই নাটক লিখিবার জন্য একপ্রকার উন্মত্ত হইয়াছে।...যিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই নাটক বলিয়া প্রচার করিতেছেন।"

শখের নাট্যশালার অভিনয়ে সাধারণের মন তৃপ্ত হইতেছিল না। শখের নাট্যশালার অভিনয়ে কেবলমাত্র ধনীলোকদের যাইবার অধিকার ছিল, সাধারণ লোক সেখানে যাইতে পারিত না। সেইজন্য বাগবাজার অ্যামেচার থিযেটারের দ্বারা অভিনীত দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটক যখন অভিনয় সাফল্য লাভ করিল, তখন সেই সম্প্রদায়ের কয়েকজনের মনে টিকিট বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় একটি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনের কল্পনা জাগিল। কালক্রমে এই বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে পরিবর্তিত হইল। ইহাই বাঙলার প্রথম পেশাদারি নাট্যশালা। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' লইয়া ইহার দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়। গিরিশচন্দ্র ঘোষ টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করার বিপক্ষে ছিলেন বলিয়া এই সম্প্রদায়ের একজন প্রধান উদ্যোক্তা হইয়াও তিনি প্রথম দিকে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয়ের সময় গিরিশচন্দ্র অবৈতনিক অভিনেতারূপে ন্যাশনাল থিয়েটারে আসিয়া যোগ দেন।

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। এই সময়ে শরৎচন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গল থিয়েটার' নামে একটি নাট্যালয় খোলেন। এখানে অভিনেত্রী লইয়া অভিনয় আরম্ভ হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। একদল 'ন্যাশনাল থিয়েটার', অন্যদল 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম লইয়া অভিনয় করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে দুই দল মিলিয়া এক

হইয়া গেল। তখন তাহার নাম হয় 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। গিরিশচন্দ্র অবৈতনিক অভিনেতা হিসাবে এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী', নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ', মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ', রমেশচন্দ্রের 'মাধবী-কঙ্কণ' প্রভৃতি নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া অভিনয় করিতে থাকেন। ইহার পরে গিরিশচন্দ্র বেতনভোগী অভিনেতা ও নাট্যশিক্ষক হইয়া নিজের লেখা নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করেন। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের সহিত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের পরিচালকবর্গের মতের অমিল হইল। গিরিশচন্দ্র একজন ধনীলোকের সাহায্যে ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে 'স্টার থিয়েটার'-এর স্থাপনা করিলেন এবং সেখানে অভিনয় করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে 'এমারেল্ড থিয়েটার' স্থাপিত হইলে তিনি সেখানে যোগদান করেন।

বাঙলাদেশের শখের থিয়েটার হইতে যে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহাই ক্রমে পল্লবিত হইয়া নানা নামে ও গোষ্ঠীতে দেখা দিল। ক্রমে সিটি থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, কোহিনুর থিয়েটার, বীণা থিয়েটার, অরোরা থিয়েটার, ইউনিক থিয়েটার, বাণী থিয়েটার, রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার, থেসপিয়ন টেম্পল, মনোমোহন থিয়েটার, প্রেসিডেন্সি থিয়েটার, রিফরমড্ থিয়েটার প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

সাধারণ নাট্যালয়ের ভিত্তি-স্থাপনের পর হইতে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত যতগুলি রঙ্গালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই গিরিশচন্দ্রের সাহায্যে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের তিরোধান ঘটে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে। এই কালের মধ্যে তিনি অসংখ্য নাটক লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের সহকারীদের মধ্যে ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এবং আরও কয়েকজন কর্মী ও শিল্পী বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অমৃতলাল বসু, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রভৃতি অভিনেতাদিগকেও বাঙলাদেশ কোনদিন বিস্মৃত হইবে না। সাধারণ নাট্যশালা স্থাপনের প্রথম দিন হইতেই বহু অভিনেত্রী সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সুকুমারী দত্ত, তারাসুন্দরী, মানদা দাসী, কুসুমকুমারী, তিনকড়ি, নরীসুন্দরী, বিনোদিনী দাসী, সুশীলাবালার নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। নাট্যশালার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্ন, কালীপ্রসন্ন সিংহ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি নাট্যকার হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিমেয়। অনেকগুলি নাটক লিখিয়াছেন এবং সেগুলির বিষয়বস্তু তাঁহার কবি-চেতনার সহিত মিলিয়া সর্বত্রই

অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বহু নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করিয়াছেন এবং নিজেও অনেক অভিনয় করিয়াছেন। কোথাও তিনি গতানুগতিকতার পথে চলেন নাই। তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়া বাঙলার নব যুগের অভিনয়-পদ্ধতি কোন কোন স্থলে নূতন পথে চলিয়াছিল বলা চলে।

বাঙলা দেশের নাট্যাভিনয়ের নূতন যুগ আরম্ভ হয় ১৯২১ সাল হইতে। তখন পুরাতন যুগের তিনটি রঙ্গালয় বাঁচিয়াছিল—স্টার, মিনার্ভা ও মনোমোহন। এই সময়ে পার্শী ধনকুবের ম্যাডান সাহেব Bengali Theatrical Company খোলেন। সেখানে প্রথমে 'অপরাধী কে?' নামে একখানি বাঙলা নাটক অভিনীত হয়। ঐ বৎসর ঐ রঙ্গালয়েই শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ক্ষীরোদপ্রসাদের লেখা 'আলমগীর' নাটকের নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এই শক্তিমান শিল্পীর অভিনয় ক্ষমতা দেখিয়া বাঙালীর বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ইহার পরে কিছুদিন আর তাঁহাকে নাট্য-জগতে দেখা গেল না। এই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে দুইজন শক্তিমান অভিনেতাকে দেখা গেল—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। স্টারে তখন সুখ্যাতির সহিত অপরেশচন্দ্রের লেখা 'অযোধ্যার বেগম' চলিতেছিল। 'অযোধ্যার বেগম' হইতেই রবিবারে Matinee Show-র প্রথম প্রবর্তন হয়। ইহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২৩ সালে স্টারে 'আর্ট থিয়েটারে'র দলভুক্ত হইয়া দেখা দিলেন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। ওদিকে ম্যাডান থিয়েটার চালাইতে লাগিলেন শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ী। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই বাঙলার নাট্যজগতে নবযুগের আরম্ভ হয়।

এদিকে শিশিরকুমারও স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন না। ১৯২৩ সালের বড়দিনে কলিকাতা ইডেন-গার্ডেনে যে একজিবিশন হইল, তাহাতে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' অভিনয় করিলেন। পরে তিনি আল্‌ফ্রেড থিয়েটারে আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহাকে তাঁহার নবচেষ্টায় সাহায্য করিতে লাগিল কয়েকজন যশস্বী সাহিত্যিক ও শিল্পী। এই সময়ে স্টারে সর্বপ্রথম একাঙ্কিকা নাটিকা মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' অভিনীত হইল এবং নূতনের সহিত পুরাতন ধারা আসিয়া মিশিল। দানিবাবু, তিনকড়িবাবু ও অহীন্দ্রবাবু একই সঙ্গে অভিনয় করিতে লাগিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে পুরাপুরি পুরাতন ধারাই চলিতে লাগিল। মনোমোহনের আসর আর জমিল না। শিশিরবাবু ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মনোমোহন থিয়েটার-গৃহ আমূল সংস্কৃত করিয়া 'নাট্যমন্দির' নাম দিয়া যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'সীতা' অভিনয় করিতে লাগিলেন। 'সীতা' নাটকের অভিনয়ে বাংলার নাট্যকলা অতুলনীয় হইয়া দেখা দিল। ইহার পরে শিশিরকুমার, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করিয়া যথেষ্ট

প্রয়োগ-নিপুণতার পরিচয় দিলেন। এই নূতন দল বাঙলা নাট্যশালার প্রয়োগ-কৌশল, সংগীত ও নৃত্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছে। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে শিশিরকুমার সদলবলে আমেরিকা হইতে আমন্ত্রণ পাইয়া অভিনয় দেখাইতে আমেরিকা গিয়াছিলেন। সেখানে বাঙলা ভাষায় অভিনয় করিয়াছিলেন।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত অনেকগুলি নূতন নাট্যশালার সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে মিত্র থিয়েটার, নাট্যমন্দির, নব-নাট্যমন্দির, নাট্যনিকেতন, রঙমহল, নাট্যভারতী, শ্রীরঙ্গম, কালিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অতি অল্পদিন হইল গণনাট্যসঙ্ঘ 'জবানবন্দী', 'নবান্ন', 'ভারতের মর্মবাণী' প্রভৃতি যে সকল অভিনয় আয়োজন করিয়াছিলেন, সেগুলি অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। কংগ্রেস সাহিত্য-সঙ্ঘের 'অভ্যুদয়' একটি স্মরণীয় অভিনয়। এই শেষের যুগের নাট্যকার হিসাবে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বসু, বরদা দাসগুপ্ত, যোগেশ চৌধুরী, মন্মথ রায়, প্রবোধ মজুমদার, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি।

বর্তমানে বাঙলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বড়ই দুর্দিন আসিয়াছে। সেখানে কোন নূতন প্রতিভার সন্ধান মিলিতেছে না। নাটক ও নাট্যাভিনয়—সবই যেন নিচের দিকে নামিয়া যাইতেছে। অভিজাত সম্প্রদায়ের কতিপয় পুরুষ ও মহিলা এখানে-সেখানে কিছুটা নাট-নৈপুণ্য দেখাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের কোন স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নাই বলিয়া, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কোন প্রকার আশা পোষণ করা যায় না।

[৬]

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্যাভিনয়

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি কাব্যাশ্রয়ে গঠিত ; সেইজন্য অনেকে রবীন্দ্রনাথকে নাট্যকার এবং তাঁহার নাটকগুলিকে প্রকৃত নাটক বলিতে দ্বিধাবোধ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি বিশেষভাবে বিচার করা প্রয়োজন। সাহিত্য-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মূল্য অনস্বীকার্য। অভিনয়েও তাঁহার অনেকগুলি নাটক বেশ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। তবে সাধারণ দর্শকদের নিকট তাঁহার নাটকের তেমন আদর হয় নাই। তাহাতে ক্ষতিই বা কি? তাঁহার কাব্য কি সকল লোকে বোঝে? কবি-হিসাবে তিনি যদি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তবে নাট্যকার হিসাবেই বা করিবেন না কেন?

রবীন্দ্রনাথ আপামর সাধারণের জন্য নাটক লেখেন নাই। একটি বিশেষ শ্রেণীর সামনে একটি বিশেষ আবহাওয়ার মধ্যে অভিনীত হইবে বলিয়া তিনি তাঁহার নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকের জন্য তিনি একটি বিশেষ শ্রেণীর দর্শকও তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তাঁহারাই তাঁহার পরিকল্পিত নাট্যাভিনয় দেখিয়া বিপুল আনন্দলাভ করিতেন। পেশাদারি নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না।

প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে তিনি নাটকগুলি রচনা করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙলা নাটকের সহিত তাহার কোন সংযোগ ছিল না। প্রাচীন কালের সংস্কৃত নাটক, যাত্রা, কথকতা, তর্জা প্রভৃতি নাট্যরচনা বিষয়ে তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল। তাঁহার নাটকের দাদাঠাকুর, ঠাকুরদাদা, বাউল প্রভৃতি চরিত্র ভারতীয় সাধকদের অনুকল্পে সৃষ্ট। এই ভারতীয় আদর্শ গ্রহণ করার নিমিত্ত তাঁহার নাটকগুলি গদ্যাত্মক না হইয়া পদ্যাত্মক হইয়াছে। মাঝে মাঝে বিদেশী প্রভাবও কিছু কিছু তাঁহার রচনায় লক্ষ্য করা যায়। তবে তাহা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য হইতেছে গীতিপ্রবণতা ও সৌন্দর্যানুভূতি। বহির্ঘটনার দ্বন্দ্ব কোথাও তাঁহার নাটকে নাই। সর্বত্র একটা প্রশান্ত, স্থির অথচ সুতীব্র অনুভূতির সুর শোনা যায়। এই অন্তর্মুখী সুরের লীলায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। ইহা ভারতবর্ষেরই সুর। ভারতবর্ষের অন্তর্লীন মানসবাণী তাঁহার লেখার মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের উপলব্ধ সত্য হইতেছে বন্ধন ও মুক্তি। উহার ব্যাখ্যা করিলে দাঁড়ায় এইরূপ :—মানুষের আত্ম-প্রকাশের মধ্যে থাকে আনন্দ। সেই আনন্দের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সে পথে আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু। সেই দুঃখ ও মৃত্যুর ভয়ে যে ভীত হয়, সে কখনও আনন্দ পায় না। তাই তাঁহার সকল নাটকেই তিনি বলিয়াছেন যে, ভয়কে জয় করিতে হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর মানুষ অন্তরে-বাহিরে বন্দী। বর্তমান বস্তুধর্মী সভ্যতা মানুষকে কিছুতেই শান্তি দিতে পারিতেছে না। সে মানুষকে নানা বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। মানুষ যদি বাহিরের সকল বন্ধন ভাঙিয়া ফেলিতে পারে তবে সে অন্তরেও মুক্ত হইবে। ত্যাগ ও সংযমের পথ বাহিয়া আসিবে সেই মুক্তি। এই মূল কথাগুলি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নানা নাটকীয় আধারের আশ্রয়ে প্রচার করিয়াছেন।

মোটামুটি ছয় ভাগে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে ভাগ করা যায়—(১) গীতিনাট্য—বাল্মীকি-প্রতিভা, মায়ার খেলা, ঋতু-উৎসব প্রভৃতি ; (২) নৃত্যনাট্য—চণ্ডালিকা, শ্যামা, নৃত্যনাট্য-চিত্রাঙ্গদা, তাসের দেশ প্রভৃতি ; (৩) নাট্যকাব্য—সতী, নরকবাস, কর্ণকুন্তী-সংবাদ, গান্ধারীর আবেদন,

লক্ষ্মীর পরীক্ষা, বিদায় অভিশাপ প্রভৃতি ; (৪) দ্বন্দ্বনাট্য—প্রকৃতির প্রতিশোধ, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, তপতী প্রভৃতি ; (৫) রঙ্গনাট্য—বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, শেষরক্ষা প্রভৃতি ; (৬) রূপক-নাট্য—ঋণশোধ, পরিত্রাণ, রাজা, ডাকঘর, রক্তকরবী, মুক্তধারা, অচলায়তন, ফাল্গুনী প্রভৃতি।

এই সকল নাটকেই রবীন্দ্রনাথের মননশীলতা, হাস্যরস-সৃষ্টি ও ব্যঙ্গ করিবার রীতি নূতন আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলির অন্তরে আছে অফুরন্ত সংগীত। সে সংগীত নিমিষেই ফুরাইয়া যায় না, বহুক্ষণ ধরিয়া অন্তরের মধ্যে বাজিতে থাকে। বহির্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা ভাবের দ্বন্দ্ব লইয়া তাঁহার ট্র্যাজিডিগুলি রচিত হইয়াছে। তাঁহার কমেডিগুলি আনন্দোজ্জ্বল ও মধুর। কোন প্রকার গভীর তত্ত্ব বা জটিল সমস্যা সেগুলিকে ঘোরাল করিয়া তোলে নাই। প্রাত্যহিক জীবনের পট-ভূমিকায় তাঁহার চরিত্রগুলি চিত্রিত হইয়াছে। অথচ সেগুলি প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ নয়। প্রত্যেক চরিত্রেই অনন্ত জীবনের আভাস লক্ষ্য করা যায়।

রূপকনাট্য রচনায় রবীন্দ্র-প্রতিভা বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছে। যদিও রবীন্দ্রনাথের রূপকগুলি আদপেই সহজবোধ্য নয়, তথাপি এ কথা স্বীকার্য যে, ঐ সকল নাটক পাঠের সময় পাঠকের মনে এক স্বপ্নাবেশের সৃষ্টি হয়। রূপক-নাটকগুলির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের মনের সুউচ্চ ধর্মবোধ প্রকাশ পাইয়াছে। সেই ধর্মবোধকেই আমরা আধ্যাত্মিকতা নাম দিয়া থাকি।

এই ধরনের নাটককে অনেকে নাটক বলিতে সংকোচ বোধ করেন। তাঁহাদিগের মত হইতেছে যে, বিচিত্র চরিত্রসৃষ্টি ও বহির্ঘটনামূলক দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ-কথা মানিতেন না। তিনি বলিতেন যে, যদি তিনি মানব মনের ভাব ও অনুভূতিকে সুন্দর ও মধুর-ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তাহাতেই তাঁহার সার্থকতা! নাটকের মধ্যে যদি কিছুটা কবিত্ব থাকে তাহাতে ক্ষতি কি? নাটকতো খানিকটা মায়া হইবে।

এখানে আর একটি কথা আলোচনা করা দরকার। অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথের নাটকে গতি নাই। এ-কথাও সম্ভবতঃ ঠিক নয়। কারণ আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যেও মানুষের মনে থাকে একটা প্রচণ্ড গতি। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

> "বস্তুবাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল, কিন্তু যাহারা অবকাশ-রসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশটাই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ নাই; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহ রচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ

যদি দেখিতে চাও, তবে দেখ ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখ যুগ-যুগান্তরের তাণ্ডব-নৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।”

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মনের বিপুল স্তব্ধতার মধ্যেও থাকে অবিরাম চলার সংকেত। ভিতরের চিন্তা, ভিতরের কল্পনা, ভিতরের অনুভূতির গতিবেগ বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের গতিবেগের চেয়ে অনেক প্রবল। রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকেই এই কথার সুস্পষ্ট নজির মিলিবে। বালক অমলের রুদ্ধজীবন বাহিরের সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল। অনন্তের সহিত মিলিবার আকাঙ্ক্ষায় সে-তো কোনদিন থামিয়া থাকে নাই। সে চলিয়াছে, ক্রমাগতই চলিয়াছে। একদিন মৃত্যু আসিয়া তাহাকে অনন্তের সহিত মিলাইয়া দিল। সেইদিন সত্যসত্যই সে মুক্ত হইল। এইরূপ মুক্তির সংগীত রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই ধ্বনিত হইয়াছে। এই অন্তর্মুখী গতিই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

বাঙলাদেশের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে, রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।[১] তিনি দেশের রুচি বহুলাংশে ফিরাইয়া দিয়াছেন। নূতন ধরনের নৃত্য, গীত, অভিনয়ের মধ্যে সর্বত্রই তাঁহার প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। নাট্যাভিনয় ব্যাপারে তিনি নূতন অভিনয়-পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকের অভিনয়ে তিনি মুহুর্মুহুঃ পটক্ষেপণ পছন্দ করিতেন না। রঙ-বেরঙের দৃশ্যপট তিনি কোনদিনই ব্যবহার করেন নাই। একটি কালো পর্দা রঙ্গমঞ্চের পিছন দিকে টাঙ্গাইয়া অতি নিরলংকারভাবে তিনি অভিনয় করিতে ভালবাসিতেন। তবে সাজ-পোশাকের দিকে তাঁহার নজর ছিল বেশ। প্রাচীন ভারতীয় আবহাওয়া ও রাজপরিবেশ তিনি বিচিত্র পরিচ্ছদের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেন। অভিনয় ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং আরও অনেকে। তিনি নিজেও সু-অভিনেতা ছিলেন। তাঁহার নিজের কল্পিত বহুবিধ চরিত্রাভিনয় করিয়া তিনি সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

১। রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডের ৪২-৫১ পৃষ্ঠায় করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

বাঙলা নাট্য-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ও
উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ও নাটকের আলোচনা

আধুনিক বাঙলা নাট্যসাহিত্যের আবির্ভাবকাল উনিশ শতকে। তার পূর্বেও বাঙলা নাটক ছিল, তবে তার কোনো নিদর্শন অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। যাত্রার নিদর্শন পাওয়া যায় তবে যাত্রা থেকে বাঙলা নাটকের উৎপত্তিও হয় নাই। ইংরেজী নাটক, বিশেষ করিয়া শেকসপীয়রের নাটকের প্রভাবেই বাঙলা নাটকের সূচনা ও বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি হইতে কলিকাতা এবং তার আশেপাশে ইংরেজী রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ইংরেজী নাটক অভিনীত হইতে থাকে। তারপরে স্কুল কলেজেও ইংরেজী কায়দায় রঙ্গমঞ্চ খোলা হইতে থাকে। এই সকল রঙ্গালয়ে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীরা ইংরেজী নাটক দেখিয়া নাটকের প্রতি আগ্রহ বোধ করিতে থাকেন। ফলে নাট্যামোদী ধনশালী বাঙালীরাও তাঁদের গৃহে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করিয়া নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করিতে থাকেন। কিন্তু বাঙলা নাটকের অভাবে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়াই বাঙলা নাটকের অভাব পূরণ করিয়া নিতে হইল। বিলাতি ধরনের রঙ্গমঞ্চে অনূদিত বাঙলা নাটকের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে। ঘেরাসিম লেবেডিয়েফ নামক একজন রুশ ব্যক্তি M. Toddrell রচিত 'The Disguise' নামক একটি ইংরেজী প্রহসনের বঙ্গানুবাদ করাইয়া তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে অভিনীত করাইলেন। সম্ভবত এইটিই প্রথম অভিনীত বাঙলা নাটক। পরে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু থিয়েটারে 'জুলিয়াস সিজার' ও 'উত্তর রামচরিত' নাটক দুইটি অভিনীত হইয়াছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীন বসুর বাড়ীতে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকাকারে অভিনীত হয়। এই সব নাটকাভিনয়ের মধ্য দিয়া বাঙলা মৌলিক নাটকের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

তারাচরণ শিকদার প্রণীত 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) নাটকটিকে বাঙলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা-হরণই নাটকটির বিষয়বস্তু। এই নাটক সম্বন্ধে তারাচরণ ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে অতএব

তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে তাহা সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনা-স্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক-প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য-পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই।" নাটকে সংস্কৃত প্রভাব কম। পাশ্চাত্য নাটকের আঙ্গিকে পাঁচ অঙ্ক ও কতিপয় দৃশ্যে নাটকটি সম্পূর্ণ হইয়াছে। সুসংবদ্ধ কাহিনীযুক্ত বাঙ্‌লা নাটক হিসাবে 'ভদ্রার্জুন' সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য।

যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'ও (১৮৫২) বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রথম বিয়োগান্তক নাটক। তিনি নাটকের ভূমিকাতে লিখিয়াছিলেন, "অনেকের এইরূপে ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়"…। 'কীর্তিবিলাস' পঞ্চাঙ্কে লিখিত। সংস্কৃত নাটকের নান্দী, সূত্রধার কর্তৃক প্রস্তাবনা, গদ্য পদ্যে কৃত্রিম সংলাপ প্রভৃতি অনুসৃত হইয়াছে। কুৎসিত সপত্নীপুত্র-বিদ্বেষ এবং তাহার নিষ্ঠুর পরিণতি নাটকটির কাহিনী। এই কাহিনী রচনায় লেখকের তেমন মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। চরিত্রসৃষ্টি, ভাষাপ্রয়োগ, ঘটনার গ্রন্থন কোনোদিক থেকেই 'কীর্তিবিলাস' তেমন উল্লেখযোগ্যতার দাবী করিতে পারে না।

হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫২) মৌলিক নাটক নয়। শেক্‌সপীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিসে'র অনুবাদ। তবে অনুবাদ বিষয়ে তিনি কিছু স্বাধীনতাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। চরিত্রগুলির ভারতীয় নামকরণ করা, কোনো কোনো স্থলে আখ্যানের মর্মমাত্র গ্রহণ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে নাট্যকারের স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকহিসাবে গ্রন্থটি সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। হরচন্দ্র ঘোষ 'কৌরব বিয়োগ' নামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আরো একখানি নাটক প্রকাশ করেন। মহাভারত কাহিনীভাগ গ্রহণ করিয়া গদ্য পদ্যে নাটকটি লিখিত হইয়াছে। নাটকটি মূলতঃ আখ্যানমূলক, ঘটনার সংঘটন ইহাতে নাই। নাট্যিক চরিত্র, নায়ক নায়িকা প্রভৃতিও নাটকটিতে নাই। হরচন্দ্র ঘোষ 'রোমিও জুলিয়েট' এর অনুবাদ 'চারুমুখ চিত্তহরা' (১৮৬৪), এবং ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্যের অনুসরণে 'রজত গিরিনন্দিনী' (১৮৭৪) নামক আরো দুটি বৈশিষ্ট্যহীন নাটক রচনা করিয়াছিলেন।

এইভাবে বাঙ্‌লা নাটকের যে সূচনা আরম্ভ হইল, পরবর্তীকালে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের হাতে তাহাই পূর্ণ বিকাশলাভ করিল। বাঙ্‌লা নাট্য-সাহিত্যে ইহাকে আদিপর্ব রূপে সাধারণতঃ অভিহিত করা হয়। রামনারায়ণ, 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) এবং 'নবনাটক' (১৮৬৫)

নামে দুখানি সামাজিক, 'বেণীসংহার' (১৮৫৩), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' (১৮৬০) ও 'মালতীমাধব' (১৮৬৭) নামে চারিখানি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং 'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭২), 'কংসবধ' (১৮৭৫) এবং 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৬) নামে তিনটি পৌরাণিক নাটক, 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (১২৭৯ সাল), 'চক্ষুদান' (১৮৬৯) ও 'উভয়সঙ্কট' (১৮৬৯) এই চারিটি প্রহসন এবং 'স্বপ্নধন' (১৮৭৩) নামে একটি ধর্মমূলক নাটক রচনা করেন। এতগুলি নাটক রচনা করিবার জন্যই তাঁহাকে 'নাটুকে-রামনারায়ণ' বলা হইত। 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের জন্যই তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কৌলীন্য প্রথার দোষে ও অসঙ্গতি দেখাইবার জন্যই ইহা লিখিত হইয়াছিল। নাটকটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত। সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী নান্দী প্রস্তাবনা থাকিলেও কাহিনীতে ধারাবাহিকতা নাই। প্লট বলিতে কিছু নাই, কয়েকটি কৌতুককর দৃশ্য শিথিলভাবে সংবদ্ধ। তবে নাটকহিসাবে অপরিণত হইলেও ইহাতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালী কুলীন সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তব চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবরসের পরিস্ফুটনার জন্য নাট্যকার সজীব চরিত্র, কথ্যভাষা ও হাস্যকৌতুকের অবতারণা করিয়াছেন। এদিক থেকে তাঁহাকে অবশ্যই প্রশংসা করিতে হয়। 'নবনাটক'ও উদ্দেশ্যমূলক রচনা। ইহাতে বহুবিবাহ প্রথার দোষ দেখানো হইয়াছে। জনৈক জমিদারের দ্বিতীয়া স্ত্রীর ঈর্ষায় প্রথমা স্ত্রীর ও তার গর্ভজাত পুত্রের নির্যাতন এবং পরিশেষে জমিদারসহ তাদের হত্যা সাধনই ইহার বিষয়। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'র মতো ইহার বাঁধুনি তেমন আলগা নয়। তাঁর 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি প্রহসনগুলিতে তিনি সমসাময়িক সমাজ জীবনের যে ত্রুটিবিচ্যুতি দেখাইয়াছেন তাহাতেও দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনাদির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পৌরাণিক নাট্য রচনাতেও রামনারায়ণ তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তবু ইহাদের মধ্যে 'রুক্মিণীহরণ' নাটকটি, ঘটনা-বিন্যাস, সরস বাস্তবতা এবং ভক্তিমূলকতার জন্য উল্লেখযোগ্যতার দাবী করিতে পারে।

আধুনিক বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের প্রথম শক্তিশালী নাট্যকার হইতেছেন, মধুসূদন দত্ত। তাঁর নাটকগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। রোমান্টিক নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), ঐতিহাসিক নাটক, 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) এবং প্রহসন, 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। তিনিই যথার্থভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য নাটক বিশেষ করিয়া শেক্‌সপীয়রের নাটকের অনুসরণেই বাঙ্‌লা নাট্যধারা গড়িয়া উঠিবে। তিনি একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, "The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country," অতএব তিনি স্থির করিলেন, "It is my intention to

throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit." নাট্যিক প্রতিভার উপযোগী কল্পনাকে বস্তুনিষ্ঠ ও সংযত করিতে পারিলেই মধুসূদনই বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতে পারিতেন। কিন্তু নাটক অপেক্ষা কাব্য-রচনাতেই মধুসূদনের অধিকতর অনুরাগ ছিল, এজন্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি নাট্যরচনায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। তথাপি 'শর্মিষ্ঠা'ই বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ নাটক। মহাভারত থেকে কাহিনী গ্রহণ করিলেও, বিষয় নির্বাচনে, চরিত্র সৃষ্টিতে, আধুনিক ভাবব্যঞ্জনা আরোপণে মধুসূদন যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। পুরাণকে অবলম্বন করিলেও পৌরাণিক ভক্তিভাবের পরিমণ্ডলের পরিবর্তে রোমাণ্টিক প্রেম কল্পনাই নাটকটির মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। সুগ্রথিত একটি কাহিনী এই প্রথম বাঙ্‌লা নাটকে উপস্থাপিত হইল। দেবযানী চরিত্র সৃষ্টিতেও নাট্যকারের চরিত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া পাশ্চাত্য নাটকের রীতিতে 'শর্মিষ্ঠা' রচিত হয়।

'পদ্মাবতী' নাট্যরচনায় মধুসূদনের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক্ পুরাণের 'Apple of Discord' এর কাহিনীকে মধুসূদন ভারতীয় রূপদান করিয়াছেন। চরিত্রগুলিকে মধুসূদন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শচী চরিত্রটি আমাদের মনে দাগ কাটিতে সমর্থ হয়। তবে নাটক হিসাবে 'পদ্মাবতী' সার্থকতার দাবী করিতে পারে না। ইহার প্রধান কাহিনী, ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর প্রেমোপাখ্যান রূপকথার গল্পের মতো অবাস্তব। কাহিনীর পরিণতিও আকস্মিকতা দোষদুষ্ট। নায়ক নায়িকা চরিত্র দুইটির কোনোটিই পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'। শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডির আঙ্গিকে গ্রীক ট্র্যাজেডির ভাব-তাৎপর্য নিয়া ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই নাটকটি রচিত হইয়াছে। কর্ণেল টডের 'Annals and Antiquities of Rajasthan'-এর প্রথম খণ্ডের সপ্তদশ অধ্যায় হইতে বিষয় লইয়া নাটকের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারী রাজনৈতিক চক্রান্তের আবর্তে পরিশেষে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হইলেন এই বিষয়টি নাটকের প্রধান কাহিনী। ইহার পাশাপাশি জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ তার রক্ষিতা বিলাসবতী, বিলাসবতীর সখী মদনিকা, জগৎসিংহের পারিষদ ধনদাস প্রভৃতিদের লইয়া একটি উপকাহিনীও রহিয়াছে। শেক্‌সপীয়রের 'Mingle Drama'-এর অনুসরণে কমেডি ও ট্র্যাজেডির মিশ্রণে কৃষ্ণকুমারী নাটকের শিল্পরূপ বিকশিত হইয়াছে। ভীমসিংহ চরিত্রই নাটকের প্রধান ট্র্যাজিক চরিত্র। তাঁর অন্তরে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে। কিন্তু দুর্বলতার জন্যই তিনি কন্যাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। ভীমসিংহের ভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের চরিত্রটিও সুঅঙ্কিত। তুলনামূলকভাবে কৃষ্ণকুমারী চরিত্র

ততোটা স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঘটনা সংঘাত, করুণ রস সৃষ্টি, ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনা প্রভৃতির বিচারেও এই নাটকটি প্রশংসার দাবী করিতে পারে। বস্তুত বাঙ্‌লা ঐতিহাসিক ও ট্র্যাজেডি শ্রেণীর নাট্যসাহিত্যে 'কৃষ্ণকুমারী' একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা।

গম্ভীর রসের নাটক রচনার মাঝে মধুসূদন দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) মধুসূদনেরই শুধু নয়, বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যেরই অন্যতম দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রহসন। প্রথমটিতে কলিকাতার ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদের প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভণ্ডামি, আর দ্বিতীয়টিতে গ্রাম্য জমিদারশ্রেণীর ভদ্রলোকদের গোপন লাম্পট্য বাস্তবসম্মত ও সরসভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় কাহিনী নাই। এখানে কয়েকটি দৃশ্যে কয়েকটি চিত্র যেন পরপর গ্রথিত হইয়াছে। তথাপি নাট্যিক কৌতুহল, ও সমাজচিত্রের সম্পূর্ণতায় প্রহসনখানি উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রগুলির স্বাভাবিক সংলাপ বাস্তব পরিবেশকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষা সমাজচিত্র অঙ্কনেরই প্রতি নাট্যকার এখানে সমধিক প্রযত্ন লইয়াছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস আছে। ইহাতে কাহিনীও আছে। জমিদার ভক্তপ্রসাদবাবু, 'হানিফ' নামক জনৈক প্রজার স্ত্রী ফতিমার রূপ লালসায় আক্রান্ত হইয়া একজন কুটনী পাঠাইয়া তার কাছে কুপ্রস্তাব রাখেন। তারপর তিনি অভিসারে যাত্রা করেন। কিন্তু ফতিমার স্বামী হানিফের কাছে তিনি উপযুক্ত দণ্ড পাইয়াছেন এবং তাঁর হৃদয়ও পরিবর্তিত হইয়াছে। ভক্ত প্রসাদের বৈষয়িকতা, স্বার্থপরতা এবং রসিকতা সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। দারিদ্র্যপীড়িত, কিন্তু কোপনস্বভাব হানিফের চরিত্রটিও স্বাভাবিক হইয়াছে। এই প্রহসনেও নাট্যকার আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাতে নাটকের সমাজচিত্র বাস্তব রসমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। মধুসূদনের প্রহসন দুইটি উদ্দেশ্যমূলক হইলেও নাট্যকারের অভিজ্ঞতা ও রসসৃষ্টির ফলে উহাদের মধ্যে সর্বজনীনতাও সঞ্চারিত হইয়াছে। সর্বোপরি সুরুচি ও কৌতুকরসের প্রবাহে প্রহসন দুইটি মনোরম রূপ লাভ করিয়াছে।

বাঙ্‌লা নাট্য সাহিত্যের আদিযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হইতেছেন দীনবন্ধু মিত্র। বাস্তবজীবনচিত্র সংবলিত নাট্যরচনার যে ধারা তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহা পরবর্তীকালে অনুসৃত হইলে বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্য নানাদিক থেকে সমৃদ্ধ হইতে পারিত। তাঁর নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "দীনবন্ধুর এই দুইটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপিনী সহানুভূতি তাঁহার কাব্যের গুণ-দোষের কারণ…।" 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) সমসাময়িক কালের নীলবিদ্রোহকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা পঞ্চাঙ্কের ট্র্যাজেডির আঙ্গিকে রচিত

হইয়াছে। তবে নাটকটির উপসংহারে বিয়োগান্তক ঘটনার প্রাধান্য, এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের চেয়ে বহির্দ্বন্দ্বের প্রতি গুরুত্বদান করিবার ফলে নীলদর্পণ ট্র্যাজেডি হিসাবে রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। প্রকৃত নাট্যিক চরিত্রের অভাবও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও নীলদর্পণ নাটকটির মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। ইহাতে নীলকরদের দুঃসহ অত্যাচার মর্মস্পর্শীভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রাম বাঙলার কৃষকদের সহজ জীবনাকাঙ্ক্ষাও অপূর্ব বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, আদুরী প্রভৃতি চরিত্র টাইপ চরিত্র হইলেও প্রাণধর্মে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। এদের মুখে যে ভাষা দেওয়া হইয়াছে তাহাও কথ্য ভাষার বাস্তবরসে অভিসিঞ্চিত।

নীলদর্পণ নাটকে দীনবন্ধু যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিলেও তিনি এই শ্রেণীর নাটক আর রচনা করেন নাই। তবে তিনি কয়েকটি প্রহসন রচনা করেন, সেগুলিতে তাঁর বাস্তবরস সৃষ্টির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' (১৮৭২) এই তিনটি প্রহসনেই সেকালের সামাজিক চিত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে। 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর তো বটেই বাঙলা সাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন। এই প্রহসনটিতে সে যুগের ইংরেজী শিক্ষিত চরিত্রের অধঃপতন ও যন্ত্রণা তুলিয়া ধরা হইয়াছে—নিমচাঁদ চরিত্রের মধ্য দিয়া নিমচাঁদ মদ্যপ, পরান্নজীবী তথাপি সে একেবারে অমানুষে পর্যবসিত হয় নাই। তার পরিহাস, ভাঁড়ামি, রঙ্গব্যঙ্গ, সমস্ত কিছুই ভাণমাত্র। এ সকলের সাহায্যে সে নিজের ব্যর্থতাকেই চাপা দিতে চাহিয়াছে। নিমচাঁদ চরিত্রে এই বিশালতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে নাট্যকারের প্রকৃত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে এই ধরনের জীবনরূপায়ণ নাই তবে হাস্যরসপ্রধান প্রহসন হিসাবে ইহাও একটি সার্থক সৃষ্টি। ইহাতে কাহিনী এবং ঘটনার মধ্য দিয়া হাস্যরস উতরোল হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহবাতিকগ্রস্ত রাজীবলোচন বৃদ্ধ বয়সেও বিবাহ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই। তাঁর সেই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া স্কুলের অকালপরিপক্ক ছেলেরা কিভাবে তাঁকে নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল তারই কৌতুককর কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে এই প্রহসনটিতে। রাজীবলোচন চরিত্রে বার্ধক্যকে অস্বীকার করিবার একটি করুণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ফলে চরিত্রটির প্রতি আমাদের সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়।

'জামাই বারিক' পূর্বের প্রহসন দুইটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ। ইহা কেবলমাত্র সমাজের চিত্র বা নক্‌সা নয়। ইহাতে প্রধান অপ্রধান দুইটি কাহিনীই স্থান পাইয়াছে। ঘরজামাইদের নেতা অভয়কুমারের কাহিনীই নাটকের মুখ্য-কাহিনী। ধনী পরিবারে ঘরজামাই রাখার প্রথাকেই এই প্রহসনে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। দীনবন্ধুর প্রহসনগুলির মধ্যেই এইটিতেই হাস্যরসের প্রাবল্য সবচেয়ে অধিকমাত্রায় অনুভূত হয়।

দীনবন্ধুর নাট্যিক প্রতিভায় কল্পনাশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতাকে মূলধন করিয়াই নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ফলে রোমান্টিক কাহিনী তাঁর হাতে সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) ও 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) মূলতঃ রোমান্স। ইহাতে প্লটগঠনে বৈচিত্র্য আছে, হাস্যরসসৃষ্টিরও প্রয়াস আছে কিন্তু রোমান্টিক নাটকের পরিবেশ কোথাও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। চরিত্রসৃষ্টিও উল্লেখযোগ্যতা লাভ করিতে পারে নাই। 'লীলাবতী' (১৮৬৭) নামে আর একখানি বৃহদাকার নাটক দীনবন্ধু মিত্র 'অপরিমিত আয়াস সহকারে' রচনা করিয়াছিলেন। ইহাও প্রকৃতিতে রোমান্টিক নাটক। প্রেম, প্রেমের প্রতিঘাত, রহস্যময়তা, কৌতুক প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া নাটকটি জমিয়া উঠিয়াছে। ললিত, লীলাবতী নায়ক নায়িকা হইলেও, নদেরচাঁদ, হেমচাঁদ, শ্রীনাথ প্রভৃতি অপ্রধান চরিত্রগুলিই নাটকে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। নাটকটিতে গদ্য সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে পয়ারে রচিত পদ্য সংলাপও সংযোজিত হইয়াছে।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর কয়েকখানি নাটকের আলোচনা

প্রথম পর্বের রচনা বলিয়া আমরা প্রসঙ্গত মধুসূদন ও দীনবন্ধুর কয়েকখানি নাটকের আলোচনা করিতেছি। পরে গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি নাটকের আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

মধুসূদন :

মধুসূদনের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে সাধারণত বলা হইয়া থাকে যে তিনি অলিখিত মহাকাব্যের কবি। তাঁহার নাট্যপ্রতিভা সম্বন্ধেও এ মন্তব্য উপযুক্ত। তিনি 'শর্মিষ্ঠা', 'পদ্মাবতী', 'কৃষ্ণকুমারী' ও প্রহসন দুইটিতে যে নাটকীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তদনুযায়ী সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নাই। নাট্যিক কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্রসৃষ্টি, সংলাপ রচনা, ট্র্যাজিকভাব সৃষ্টিতে তিনি পূর্বের নাট্যকারদের তুলনায় অনেক বেশী দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নাটক বলিতে যাহা বুঝায় তাহা তিনি একখানিও রচনা করিতে পারেন নাই। তিনি ইওরোপীয় নাটকের আদর্শ সম্বন্ধে একটি পত্রে লিখিয়াছেন, "In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment." এই আদর্শের নিরিখে বিচার করিলে মধুসূদনের নিজের নাটকও রসোত্তীর্ণ হয় নাই তাহা বলিতেই হইবে। জীবনের নিগূঢ় বাস্তবতা, মহৎ আবেগ, ভাবানুভূতির গরিমা তাঁহার নাটকেও যথোচিত রসরূপায়ণ লাভ করিতে পারে নাই। এই অসাফল্য সত্ত্বেও বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। তিনিই প্রথম নাট্যকার যিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের

সমৃদ্ধিসাধনে আন্তরিক প্রয়াস করিয়াছিলেন। 'অলিক কুনাট্য রঙ্গ' হইতে নাট্যভারতীকে উদ্ধার করিবার সংকল্প লইয়াছিলেন। যথার্থ নাট্য-রসরসিকতা ছিল বলিয়াই তিনি ইওরোপীয় আদর্শকে লক্ষণীয় মাত্রায় তাঁহার নাট্যসাহিত্যে রূপায়িত করিতে পারিয়াছিলেন। সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রভাব তিনি একেবারে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি সংস্কৃত নাট্যরীতিকে মান্য করিয়াই বাংলানাট্য সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্যরীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার নাট্যপ্রতিভা কতোটা অভ্রান্ত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁহার প্রহসন রচনা দুইটি হইতে। এই প্রহসন দুইটির বাস্তবতা, জীবনরসরসিকতা, সংলাপ রচনার নিপুণতা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। ক্ষুদ্রাকৃতি প্রহসন রচনায় যাহা সহজ, পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় তাহা ততটা সহজ নহে। সে কারণেই মধুসূদনের নাটকে নানা দোষত্রুটির সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু দোষত্রুটিকে বড় করিয়া না দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব যে তিনিই প্রথম বাঙ্‌লা নাটকে একটি সুসংবদ্ধ কাহিনী, দেবযানী, ভীমসিংহ, বলেন্দ্রসিংহের মতো চরিত্র, নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন অস৺ায় মানবজীবনের চিত্র, অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত সংলাপ আমাদের উপহার দিয়াছেন। মানবিকতার স্বচ্ছন্দ পরিমণ্ডলে তিনি তাঁহার নাটকগুলি স্থাপন করিয়াছেন। ধর্মীয় সংস্কারের আবহাওয়া থেকে এইভাবে মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যকে মুক্ত করেন। পুরাণ বা ইতিহাসকে অবলম্বন করিলেও পৌরাণিক ভক্তিবাদ বা অতীতচারিতা মধুসূদনের স্বভাবধর্ম ছিল না। তিনি পুরাণ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক নারীস্বাতন্ত্র্য, ও ব্যক্তিত্ব চেতনাকেই তুলিয়া ধরিয়াছেন।

॥ শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) ॥

শর্মিষ্ঠাকে বিষয়বস্তুর বিচারে পৌরাণিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে। মহাভারতের আদি পর্বের ৭৮ অধ্যায় হইতে ৮৪ অধ্যায়ে বিবৃত দেবযানী ও যযাতির প্রণয়, দেবযানী ও শর্মিষ্ঠার কলহ, শর্মিষ্ঠার দেবযানীর দাসীত্ব গ্রহণ, দেবযানী যযাতির বিবাহ, যযাতি শর্মিষ্ঠার মিলন, দেবযানীর ক্রোধ ও পিতৃসকাশে গমন, শুক্রাচার্য কর্তৃক যযাতির অকালবার্ধক্যের অভিশাপ, পুরু কর্তৃক যযাতির জরাত্ব গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা মধুসূদন গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতের কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান মধুসূদন সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন। শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর ব্যক্তিত্বের সংঘাতই নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় বলিয়া দেবযানীর পূর্বরাগ বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞানে পরিহার করিয়া নাট্যকার কাহিনীর ভাবমুখীনতা বজায় রাখিয়াছেন। একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তিনি যযাতির স্বর্গলাভ, প্রজ্ঞা অর্জন প্রভৃতি প্রসঙ্গও বাদ দিয়াছেন। দুই একটি ছোটোখাটো ঘটনাও নাট্যকার সামান্য পরিবর্তন করিয়াছেন। যেমন নাটকে

শর্মিষ্ঠা ও যযাতির প্রণয় সঞ্চারের দৃশ্য বর্ণনা করা হইয়াছে কিন্তু মহাভারতের কাহিনীতে শর্মিষ্ঠা সন্তানকামনায় পীড়িত হইয়াই যযাতির অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে পাণিগ্রহণে বাধ্য করিয়াছে। আবার নাটকে আছে যে দেবযানী যযাতির আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার কাছে গিয়া যযাতিকে অভিশাপ দিবার জন্য উত্তেজিত করে এবং শুক্রাচার্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও যযাতিকে অভিশাপ দেন। কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, দেবযানীর অনুরোধে নয় শুক্রাচার্য নিজেই ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে শাপ দেন। এইরূপ অল্পস্বল্প পরিবর্তনে নাট্যকারের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এবং এই পরিবর্তন সাধনের ফলে শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনী ও ভাবসংহতি বৃদ্ধিই পাইয়াছে বলিতে হইবে। তবে ঘটনা নয়—ভাবের দিক হইতেই মধুসূদন গুরুতর পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। মহাভারতে যযাতির কাহিনী ছিল মূলত শিক্ষামূলক। কৌরব ও পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ পুরুর মহিমা কীর্তনই সেখানে প্রধান বিষয়। আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া রাজকুমার পুরু যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন তাহারই প্রশংসায় মহাভারতকার পঞ্চমুখ। কিন্তু মধুসূদনের নাটকটি আত্মত্যাগমূলক নয়। ইহাতে আদিরসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নাটকের প্রথমে যযাতি-দেবযানীর প্রণয়, মাঝে যযাতি-শর্মিষ্ঠার প্রণয়, পরিশেষে দেবযানী-শর্মিষ্ঠার সৌহার্দ্য। মূল কাহিনীতে শর্মিষ্ঠার তেমন কোনো মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। পুরুর ত্যাগ মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে শর্মিষ্ঠা মূল মহাভারতে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু মধুসূদন শর্মিষ্ঠাকে বিস্মৃতি হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে স্বামীর ও স্বপত্নীর সোহাগভাগিনী করিয়া আঁকিয়াছেন। দৈত্যবালাকে নায়িকা করিয়া তাহার প্রেমের অধিকার স্বীকার করিয়া মধুসূদন নাটকে আধুনিক নারীস্বাতন্ত্র্যের আদর্শই প্রতিষ্ঠিত করেন। এজন্যই শর্মিষ্ঠাকে যথার্থ পৌরাণিক নাটক বলা যায় না। কারণ বাঙ্‌লা ঐতিহাসিক নাটকে ভক্তিরসপ্রধান পৌরাণিক নাটকের যে ধারা গড়িয়া উঠিয়াছে শর্মিষ্ঠা নাটকে সে ভক্তিরসের বাষ্পমাত্রও নাই। মধুসূদন রোমান্টিক নাটকের আদর্শেই শর্মিষ্ঠা নাটক রচনা করিয়াছেন।

শর্মিষ্ঠা নাটকের প্লট গঠনেও নাট্যকার নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর কলহ বর্ণনার মাধ্যমে নাট্যকার কাহিনীতে যথেষ্ট কৌতূহল সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কে শর্মিষ্ঠা-যযাতির প্রণয় বর্ণনাতেও নাট্যিক সংঘাত লক্ষিত হয়। যে দেবযানী যযাতির প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমগর্বের সৌভাগ্যে গর্বিতা ছিলেন শর্মিষ্ঠার যযাতির প্রতি আসক্তি সেই সৌভাগ্যগর্বে আঘাত হানিল। ফলে নাটকে বিপরীত সংঘাত দেখা দিল। এই সংঘাত চরমতা পাইল চতুর্থ অঙ্কে ক্রুদ্ধা দেবযানির গৃহত্যাগে। তারপরে একের পর এক ঘটনায় নাটকের কাহিনী গতিচঞ্চল হইয়া ওঠে। পঞ্চম অঙ্কে শর্মিষ্ঠা-দেবযানির মিলনের মধ্য দিয়া ঘটনায় যবনিকাপাত সংঘটিত হয়। দেবযানি-

যযাতির প্রণয়ের বর্ণনা কিছু বিস্তারিত হইয়াছে। ইহা সংক্ষিপ্ত হইলেই নাট্যিক গতি তীব্রতর হইত। নাটকের উপসংহারও আকস্মিকতাদোষে দুষ্ট। দেবযানীর হৃদয় পরিবর্তনের ব্যাপার যদি আরো বিশ্লেষিত হইত তাহা হইলেই সঙ্গত হইত।

চরিত্রচিত্রণে দেবযানী চরিত্রটিই উল্লেখযোগ্য। নারীর প্রেম, তেজ, প্রতিহিংসা এবং অনুতাপ প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী গুণ-দোষে চরিত্রটি জীবনচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। [যযাতির কাছ থেকে সে যে আঘাত লাভ করিয়াছে তাহা তাহার একনিষ্ঠ প্রেমানুভূতির চরম অপমান। সে অপমান সে নীরবে সহ্য করে নাই। সে সদর্পে গৃহত্যাগ করিয়াছে। তাহার হৃদয়জ্বালা সে নিজেই শুক্রাচার্যের নিকটে প্রকাশ করিয়াছে এই বলিয়া "হে পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল; হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখব না।" (৪র্থ অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক। দেবযানীর পূর্ব প্রণয়ের কথা মনে রাখিলে যযাতির হৃদয়হীনতার ফলে দেবযানীর অন্তর্জ্বালা যথার্থরূপে অনুধাবন করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু ক্রোধে সে যতই অধীর হোক না কেন সে তো নারী। যযাতিকে সে অন্তর দিয়াই ভালোবাসে। তাই যযাতি জরাগ্রস্ত হইলে তার ক্রোধ, অপমান সর্বকিছু নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। মন্ত্রী বর্ণনা করিয়াছেন "রাণী মহারাজের সেইরূপ দুর্দশা দেখে দুঃখে একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হয়ে উঠলেন; পরে তাঁর প্রিয় সখী পূর্ণিকা তাঁকে একান্তে কাতরা ও অধীরা দেখে পুনরায় মহর্ষির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, ঋষিরাজের অন্তঃকরণ দুহিতাস্নেহে আর্দ্র হলো" ;...(৫ম অঙ্ক/১ম গর্ভাঙ্ক)। এইখানেই দেবযানী চরিত্রের সম্পূর্ণতা।] দেবযানীর সঙ্গে তুলনা করিলে শর্মিষ্ঠা চরিত্রটি অনুজ্জ্বল বলিয়া মনে হইবে। শর্মিষ্ঠাকে মধুসূদন নারীর মর্যাদা দান করিয়াছেন সত্য কিন্তু তাকে সজীব রমণীতে রূপান্তরিত করিতে পারেন নাই। শর্মিষ্ঠা যতটা টাইপ হইয়াছে ততোটা ব্যক্তিত্বময়ী চরিত্রের রূপ লাভ করিতে পারে নাই। [নাটকের প্রথম দৃশ্যে বকাসুর শর্মিষ্ঠার কলহপরায়ণতার বর্ণনা দিয়াছে, কিন্তু পরে আর শর্মিষ্ঠার ঈর্ষা বা নীচতার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। অব্যবহিত পরের দৃশ্যই সে সখীকে তার দুঃখে কাতরতা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং নিজেরও কোনো দুঃখ নাই বলিয়া জানাইয়াছে। শর্মিষ্ঠার অন্তরের সুপ্ত বেদনা নাটকে একবার মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বকাসুর যখন শর্মিষ্ঠাকে লইতে আসে তখন শর্মিষ্ঠা তাহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হয় নাই। সে বলিয়াছে, 'যেমন কোনো ব্যক্তি, কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন করে এসে, তত্রস্থ দেবদেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমূর্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সর্বদা ধ্যান করে,

আমিও সেইরূপ আমার জনক জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো, কিন্তু দৈত্য দেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আর আমাকে অনুরোধ করবেন না।" (৩য় অঙ্ক/৩য় গর্ভাঙ্ক)। এখানেই আমরা শর্মিষ্ঠার যযাতির প্রতি রূপমোহের মৌন পরিচয় পাইয়া তার অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সচেতন হই।]

শুক্রাচার্য চরিত্রটিও নাটকে কিছু পরিমাণে উদ্ভাসিত হইয়াছে। যযাতিকে অভিশাপ দিবার পূর্বে তাঁর দ্বিধার মধ্য দিয়া তিনি নিরপেক্ষতার পরিচয় দান করিয়াছেন। কিন্তু দেবযানীর স্নেহাতিশয্যে তাঁর পিতৃহৃদয় জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি কন্যার অসঙ্গত দাবী মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু স্নেহশীল পিতা হইলেও তিনি নিরপেক্ষতা হারান নাই। [পরে তিনি কন্যাকে উপদেশ দিয়াছেন, "বৎসে, তুমিও তোমার সপত্নী অথচ আবাল্যের প্রিয়সখী শর্মিষ্ঠাকে যথোচিত সম্মান কর ;—আর আপনার সহোদরার ন্যায় এঁর প্রতি পূর্বমত স্নেহ মমতা করবে।" (৫ম অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক)। এইভাবে শুক্রাচার্য দ্বিধা ও সরলতার মাধ্যমে সজীবতা লাভ করিয়াছেন।]

॥ কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) ॥

মধুসূদনের তথা বাঙ্‌লা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হইতেছে কৃষ্ণকুমারী। এই নাটকটি জাতিবিচারে ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। টডের রাজস্থানকে যদি ইতিহাস বলা যায় তবেই কৃষ্ণকুমারীকে যথার্থ ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করা যায়। কিন্তু রাজস্থান যেহেতু অনেক কিংবদন্তী ও গল্পকথায় পরিপূর্ণ সেজন্য আধুনিককালে রাজস্থানকে পূর্ণ ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া হয় না। কাজেই কৃষ্ণকুমারীকে ঐতিহাসিক নাটক না বলিয়া ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকেরই অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে। টডের বিবৃত তথ্যাদি মধুসূদন খুব বেশী পরিবর্তন করেন নাই। তবে কুচক্রী আমীর খাঁ এবং কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থী মানসিংহকে নাটকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করা হয় নাই। ফলে ঐতিহাসিক নাটকের ষড়যন্ত্রজাল ও অস্ত্রের ঝনঝনানি নাটকে ততোটা পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। মধুসূদনের কৈফিয়ৎ, "The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents". ইহা সত্য নহে। জয়পুর রাজা ও মরুদেশের রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মারাঠা সর্দার সিন্ধিয়ার কুমন্ত্রণা, পাঠান সর্দার আমীর খাঁর ক্রূরতা, মারবারে সিংহাসন নিয়া গৃহবিবাদ, কৃষ্ণকুমারীকে নিয়া রাণা ভীমসিংহের সঙ্কট, বিষপ্রয়োগে কৃষ্ণকুমারীর হত্যাসাধন, প্রভৃতি ঘটনার ঘনঘটায় মূল কাহিনী পরিপূর্ণ। স্বীকার করিতেই হইবে যে মধুসূদন এই সমস্ত ঘটনার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। আসলে মধুসূদন ঘটনা অপেক্ষা মানুষের প্রতিই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহিয়াছেন। সেজন্যই তিনি

এত ঘটনার মধ্যেও আবার কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিয়াছেন। জগৎসিংহের একজন রক্ষিতা ছিল, টডের রাজস্থানের এই ইঙ্গিত মাত্র গ্রহণ করিয়া তিনি বিলাসবতী, মদনিকা-ধনদাসের কল্পিত বৃত্তান্ত গড়িয়া তুলিয়াছেন। এরূপ কল্পনা ইতিহাসবিরোধী হয় নাই। ধনদাস-মদনিকার কার্যকলাপ ইতিহাসের ঘটনারাজীকে একটা মানবিক ব্যাখ্যা দিয়াছে। 'Historic Tragedy' হিসাবে কৃষ্ণকুমারী মোটামুটি সার্থক বলা চলে। টডের রাজস্থানের তথ্যকে তিনি বিকৃত করেন নাই। তবে যেটুকু পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা রসসৃষ্টির অনুকূল হইয়াছে। যেমন মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর প্রণয়াকর্ষণ, কৃষ্ণার আত্মহত্যা, প্রভৃতি কল্পনার ফলে ইতিহাস সজীবতা লাভ করিয়াছে। কালানৌচিত্য দোষে কৃষ্ণকুমারী নাটক দুষ্ট হয় নাই। (কিন্তু এরূপ ভারতবোধ সমকালীন স্বদেশ চেতনার দ্বারা তীব্রভাবে মথিত নয় বলে তা এ নাটকের ভাবপরিমণ্ডলের বিরোধী হয় নাই।) ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে কৃষ্ণকুমারীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহাতে ইতিহাস মানবিক ভাবোত্তাপে আবেগাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভীমসিংহের সঙ্কটের মধ্য দিয়া রাজপুতজাতির বিষাদ, বেদনা, চক্রান্ত সমস্ত কিছুই পরিস্ফুট হইয়াছে। কেবলমাত্র মেবারের রাণা ভীমসিংহই নয় নিয়তির কাছে অসহায় মানবমাত্রের ট্র্যাজেডিও এখানে সুন্দরভাবে অভিব্যঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এইভাবে নাটকে সর্বজনীন তাৎপর্যও উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মধুসূদনের নাট্যিক প্রতিভা এই সত্য নিঃসংশয়ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই ইতিহাস নাটকে জীবন্তরূপ লাভ করে, ঘটনার দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নয়। এইজন্যই তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বময় ভীমসিংহ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন।

ট্র্যাজেডি হিসাবেও কৃষ্ণকুমারী নাটক রসোত্তীর্ণ। ইহাতে প্রধানত ভীমসিংহ চরিত্রের মাধ্যমে পিতৃহৃদয়ের মর্মান্তিক বেদনার রূপদান করা হইয়াছে। ভীমসিংহ বিলুপ্তকীর্তি, যুদ্ধক্লান্ত, হতোদ্যম। চতুর্দিকে তিনি শত্রুজালে বেষ্টিত, এই জাল ছিন্ন করিবার শক্তি তাঁর নাই। তথাপি তিনি একেবারে দুর্বলচেতা নন। মানসিংহকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি জগৎসিংহের সঙ্গেই তাঁর কন্যার বিবাহ দেবার সংকল্প করেন। এই সংকল্পের মধ্য দিয়া তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যদি মানসিংহকে কন্যাদানে সম্মত হতেন তাহা হইলে হয়তো তিনি বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিতেন। এইভাবে ভীমসিংহের ট্র্যাজেডির মূলে রহিয়াছে তাহারই দায়িত্ব। বহির্ঘটনার সংঘাত তাঁর অন্তরেও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। এইভাবে একদিকে নিজের রাজ্যকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করিবার প্রয়াস অন্যদিকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় কন্যাকে বাঁচানোর আকুলতা এইরূপ বহির্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন। নাটকের পরিশেষে এইরূপ সংঘাত চরমরূপ লাভ করিয়াছে। তাহা দুইটি নিষ্পাপ প্রাণকে অকালে হরণ করিয়া লইয়াছে এবং আর একটি প্রাণকে উন্মাদে পরিণত করিয়া চিরতরে

বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। ভীমসিংহ চরিত্রে শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজিক চরিত্রের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। তিনি অন্তরে বাহিরে অসহায়। কৃষ্ণকুমারী নাটকে কৃষ্ণকুমারী চরিত্রে গ্রীক ট্র্যাজিক চরিত্রের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকুমারী তার সঙ্গীত, পুষ্পোদ্যান ও আপনার মাধুরী লইয়া তৃপ্ত ছিল। কিন্তু বহির্জগত তাকে নিস্তার দেয় নাই। রাজনৈতিক কুটিল চক্রান্তে তার সুখের জগৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। ইউরিপিডিসের 'Iphigenia Aulis' নাটকের ইফিজিনিয়ার সঙ্গে এদিক থেকে কৃষ্ণকুমারীর সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া এ নাটকে ভাগ্যের যেরূপ প্রাধান্য তাহাও গ্রীক ট্র্যাজেডিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অজ্ঞাত দৈবশক্তির নিষ্ঠুর মথিত মানবজীবনের ট্র্যাজেডিই কৃষ্ণকুমারী নাটকের মূল ট্র্যাজেডি। শিল্পনিপীড়নের শৈলীর বিচারেও কৃষ্ণকুমারী নাটক ট্র্যাজেডি হিসাবে রসোত্তীর্ণ। ইহাতে, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রজাল, কৃষ্ণকুমারীর পদ্মিনীকে স্বপ্নদর্শন, কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার পূর্বে বাইরে ঝড়জল, ভীমসিংহের উন্মাদে পরিণত হওয়া প্রভৃতি স্থূল সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাসৃষ্টিতে নাট্যকারের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বোপরি নাটকটি পূর্বাপর অনির্দেশ্য বিষাদভাবে পরিপূর্ণ।

জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছেন। তাঁকে কেন্দ্র করিয়া বিলাসবতী, মদনিকা, ধনদাসের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। এইটি নাটকের উপকাহিনী। জগৎসিংহ ছাড়া আর সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক। জগৎসিংহের বিলাসবতীর প্রতি আকর্ষণ, বিলাসবতীর জগৎসিংহের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম, কৃষ্ণকুমারীর ছবি দেখাইয়া কৃষ্ণকুমারীর প্রতি জগৎসিংহকে আকৃষ্ট করিবার ধনদাসীয় কৌশল, কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহের উদ্যোগ দেখিয়া বিলাসবতীর মনোবেদনা, সখীর মনোবেদনা লাঘবে মদনিকার প্রয়াস, ধনদাস মদনিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কাল্পনিক ঘটনার দ্বারা নাটকে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে। কেবল তাই নয়, বিলাসবতীর ঈর্ষা, জগৎসিংহের রূপমোহ, মদনিকার সখীপ্রেম, ধনদাসের ধনতৃষ্ণা প্রভৃতির দ্বারা নাটকের পরিমণ্ডল মানবিক অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়াছে। এই উপকাহিনী মূল কাহিনীকে কোথাও বাধা দেয় নাই। বরংচ মূলকাহিনীকে আরো গতিশীল করিয়া তুলিয়াছে। তবে মদনিকার অঘটন ঘটন পটিয়সী চাতুর্যজাল আরো একটু প্রশমিত হইলে সঙ্গত হইত।

চরিত্রসৃষ্টিতেও নাট্যকার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এই নাটকের নায়ক হইতেছেন ভীমসিংহ। মধুসূদন ভীমসিংহকে ইতিহাস হইতে 'A sad and sreious man' রূপেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাটকে তাঁর দুর্বলতাই অধিকমাত্রায় প্রকটিত হইয়াছে। সক্রিয় প্রতিরোধের অভাব তাঁকে ইওরোপীয় ট্র্যাজিক চরিত্রের দৃঢ়তা থেকে বঞ্চিত করিয়াছে। কিন্তু দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি দোষে গুণে মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁর দ্বন্দ্ব, তাঁর যন্ত্রণা, স্পষ্টরূপ পাইয়াছে। কৃষ্ণার হত্যাসাধনের প্রস্তাবে সম্মতিদানের মধ্যে যেমন তাঁর চারিত্রিক হীনতার

পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি তাঁর উন্মাদনাও তাঁর কন্যাস্নেহের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। ভীমসিংহ যখন পরিশেষে 'বলেন্দ্র, ভাই, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!—আমার কৃষ্ণা' বলিয়া আক্ষেপোক্তি করিতে থাকেন তখন তাঁর প্রতি সহানুভূতিতে আমাদের মনপ্রাণ পূর্ণ হইয়া ওঠে। ভীমসিংহ চরিত্রে ক্রিয়াতৎপরতার অভাব থাকিলেও দুঃখভোগের আত্যন্তিকতার মধ্য দিয়াই তাঁর নায়কোচিত মহিমা উদ্ভাসিত হইয়াছে। ভীমসিংহের পরিণতি শেক্‌সপীয়রের রাজা লীয়রের পরিণতির অনুরূপ। কন্যাস্নেহপরায়ণ রাজা লীয়র যেমন উন্মত্তভাবে ক্রুদ্ধ প্রকৃতির তাণ্ডবের মাঝে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ভীমসিংহকেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে প্রলাপ বকিতে দেখা যায়।

কৃষ্ণকুমারীর নামে নাটকটি আখ্যাত হইলেও কৃষ্ণকুমারী চরিত্রটি নাটকে ততোটা পরিস্ফুটনা লাভ করিতে পারে নাই। সরলা প্রেমিকা হিসাবেই নাট্যকার তাকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। নাটকের শেষের দিকে নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাতে সে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে। তখন তার চরিত্রে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিবার অবকাশ নাট্যকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। পদ্মিনীর স্বপ্নাদেশের প্রসঙ্গ আনিয়া কৃষ্ণকুমারী চরিত্রে আত্মত্যাগের আবেগ সঞ্চারিত করিয়াছেন। তবে মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণকুমারী যেরূপ আচরণ করিয়াছে তাহাতে তাহার অভিমান প্রকাশিত হইয়াছে। সে কাকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, 'কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা, যে—' (৫ম অঙ্ক/৩য় গর্ভাঙ্ক)। যখন জানিতে পারিয়াছে যে তার পিতার ইচ্ছাতেই বলেন্দ্রনাথ পিশাচের কার্য করিতে আসিয়াছে তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া সে অভিমানে আহত হইয়াই আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পদ্মিনীর আহ্বান সত্ত্বেও কৃষ্ণকুমারী হয়তো বা বিনাশের পথে ধাবিত হইত না যদি সে পিতার ইচ্ছা সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হইত। কৃষ্ণকুমারী চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি কৃষ্ণকুমারীকে বিকশিত না করিতে পারিলেও তার চারিদিকে নারীত্বের মাধুর্য সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন। মধুসূদনের নিজের ভাষাতেই নাটকের কৃষ্ণকুমারী চরিত্র সম্বন্ধে বলা যায় যে 'dignified yet gentle'.

বলেন্দ্রসিংহ চরিত্রটি ক্ষুদ্র কিন্তু সুঅঙ্কিত। ভীমসিংহের 'contrast' হিসাবেই চরিত্রটি চিত্রিত হইয়াছে। সে দায়িত্বশীল, রাজ্যের স্বার্থকেই সবার উপরে স্থান দিয়াছে। সে জন্যই কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার প্রস্তাবে অমত করিয়াও পরিশেষে সেই ঘৃণিত কার্য করিতে নিজেই অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু তবু সে পাষাণ নয়। কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিতে গিয়া তাহার হৃদয় যন্ত্রণায় বিদ্ধ হইয়াছে। সে নিজেই বলিয়াছে, 'আমার দেখছি মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো, কোনো দিকেই পরিত্রাণ নাই। তা জন্মের মতন বাছার চন্দ্রবদনখানি একবার দেখে নি!" (৫ম অঙ্ক/৩য়

গর্ভাঙ্ক)। কৃষ্ণকুমারীকে সে হত্যা করিতে পারে নাই, তার চাঁদ মুখ দেখিয়া লজ্জায় ক্ষোভে খড়্গ ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে। সে রাজপুত হইলেও সে তো স্নেহশীল পিতৃব্য। তাই শেষ পর্যন্ত স্নেহের কাছে কর্তব্য পরাজয় লাভ করিয়াছে।

মদনিকা চরিত্রটিও নাটকে অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। মধুসূদন নিজেই লিখিয়াছেন, "But that Madanıka is my favourite." বস্তুতঃ মদনিকা চরিত্রটি রোমান্সের চরিত্র। সেক্সপীয়রের কমেডি নাটকে এই ধরনের নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে। তার চরিত্রে বুদ্ধির দীপ্তি, আত্মবিশ্বাস এবং সখীপ্রেমের সমাবেশ ঘটিয়াছে। চরিত্রটিকে নাট্যকার কেবল অঘটনঘটন পটীয়সী রমণীরূপেই গড়েন নাই। বিলাসবতীর দুঃখমোচনের ঐকাগ্র কামনা এবং ধনদাসের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশের মাধ্যমে আমরা মদনিকার হৃদয়ের সন্ধান পাই।

দীনবন্ধু ঃ

বাঙালী সমাজের বাস্তব রূপকার হইতেছেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। তাঁহার নাট্যিক্ প্রতিভা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই মন্তব্য করিয়াছেন,"…যাহা সূক্ষ্ম কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসংগত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।" বস্তুধর্মী নাটক রচনা করিতে হইলে যে ধরনের অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির প্রয়োজন দীনবন্ধুর তাহা পুরোমাত্রায় ছিল। নীলকর পীড়িত কৃষক, মূর্খ ডেপুটি, গুলিখোর বকাটে যুবক, পরমুখাপেক্ষী ঘরজামাই, রঙ্গরসে নিপুণা পরিচারিকা, বিবাহপাগল বৃদ্ধ প্রভৃতি সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষ সম্বন্ধেই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। এই জন্যই তাঁর নাটক প্রহসনে যে বাস্তব সমাজের বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আর কারো নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁর নাটকে জীবন শুধু বাস্তবায়িতই হয় নাই তাহা রসরূপও লাভ করিয়াছে। মোহিতলাল মজুমদার মন্তব্য করিয়াছেন, "জীবনকে বর্ণনায় না করিয়া তাহাকে দর্শনীয় করিবার আবেগেই নাটকের সৃষ্টি হয়। এ আবেগের মূল কল্পনার objectivity, বাহিরের নিকট আত্মসমর্পণ আত্মগত রসকল্পনায় বস্তুসকলকে মণ্ডিত না করিয়া; বস্তু সকলের রস-সত্তায় আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া কল্পনার এই objectivity, উৎকৃষ্ট নাটকীয় প্রতিভার লক্ষণ আমাদের সাহিত্যে অল্পই প্রকাশ পাইয়াছে সেই অল্পের মধ্যে দীনবন্ধুর প্রতিভাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।" দীনবন্ধুর

হাস্যরসরসিকতা তাঁর কবিত্ব শক্তির একটি বিশেষ গুণ। তাঁর জলধর, কেনারাম, রাজীব, বগলা, রামমাণিক্য, বিন্দুবাসিনী অপূর্ব সৃষ্টি। তাঁর হাস্যরসে ব্যঙ্গের কশাঘাত অপেক্ষা পরিহাসের স্নিগ্ধ সৌরভই বেশী। তিনি প্রকৃতই হাস্যরসিক "humourist" ছোটোখাটো দোষক্রটি লইয়া তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসসৃষ্টি করিয়া দোষক্রটির অসঙ্গতিকে বড় করিয়া না দেখাইয়া বিমল কৌতুক রসসৃষ্টির প্রতিই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

দীনবন্ধুর নাট্যসাহিত্যের বড় সীমাবদ্ধতা হইতেছে যে তাহা সর্বদা কালোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে যেমন তিনি সবসময় শিল্পসংযত রূপদান করিতে পারেন নাই তেমনি আবার অভিজ্ঞতার অভাবকেও কল্পনার দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে পারেন নাই। যেখানে তাঁর অভিজ্ঞতার অভাব সেখানে তিনি পুঁথিগত কৃত্রিম আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন।

॥ নীলদর্পণ ॥

এই নাটক সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই লিখিয়াছেন, নীলদর্পণ বাঙ্‌লার Uncle Tom's Cabin. 'টম কাকার কুটির' আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীলদর্পণ নীল-দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী।" সমস্ত সামাজিক নাটকের মতো নীলদর্পণও উদ্দেশ্যমূলক। এই নাটক প্রণয়নে নাট্যকার দুই উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন। প্রথম হইতেছে নীলকরদংশনকাতর প্রজাসাধারণের দুঃখ দুর্দশা সর্বসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত করা এবং দ্বিতীয় হইতেছে উদারহৃদয় ইংরাজ শাসকদের চিত্ত বিগলিত করিয়া নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিকার বিধানের চেষ্টা করা। দুটি উদ্দেশ্য সাধনেই তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন। নীলদর্পণ নাটকে প্রজাপীড়ক নীলকরদের অমানুষিক অবিচারের বাস্তব চিত্র শক্তিশালী ভাষায় নাট্যকার তুলিয়া ধরিয়াছেন। নীলকর-শোষণের সামগ্রিক রূপই নাটকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নীলকরেরা দাদনের নামে প্রজাদের সর্বস্ব লুঠ করিয়া লয়। কোনো প্রজা যদি দাদন নিতে না চায় তবে তাদের লাঠিয়াল দিয়া জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া কুঠিঘরে আটক করিয়া তাহার উপরে জুলুম করিয়া দাদন লিখিয়া দিতে বাধ্য করে। কোনো প্রজা যদি এই শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তবে নীলকর সাহেবরা ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করিয়া তাহাকে শাসন করে। নীলকরেরা দেওয়ান, আমীন, লাঠিয়াল প্রভৃতি দেশীয় লোকদের টাকার দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদের দ্বারাই শোষণের যন্ত্র অব্যাহত রাখে। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক শোষণই নয়, নারীর ইজ্জতের প্রতিও

নীলকরদের বিলক্ষণ প্রলোভন। সেক্ষেত্রে তারা নারী লুণ্ঠনেও পিছুপা হয় না। গোলোক বসু ও সাধুচরণের পরিবার দুইটির দুর্গতি চিত্রণের মাধ্যমে নাট্যকার নীলকরদের সার্বিক শোষণের রূপ অঙ্কন করিয়াছেন। প্রথমেই সাধুচরণ গোলোক বসুকে বলিয়াছে, 'তিন বৎসর হয় নি সাহেব পত্তনি লয়েছে, এর মধ্যে গাঁথান ছারক্ষার করো্যে তুলেছে। দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে।' (১ম অঙ্ক/১ম গর্ভাঙ্ক)। তারপরের দৃশ্যেই দেখি আমিন এবং পেয়াদারা আসিয়া অভুক্ত রাইচরণকে বাড়ী থেকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। শুধু তাই নয় সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণিকে ছোটোসাহেবের প্রসাদী করিবার মতলবও আঁটিয়া যায়। তারপরের দৃশ্যে স্বয়ং উডসাহেব রাইচরণ ও সাধুচরণকে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করে। আমিন রাইচরণের কান মলিয়া দেয়। এই দৃশ্যেই উডসাহেবের সেই বিখ্যাত উক্তি 'বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে' উচ্চারিত হইয়াছে। গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের ফলে শাসনশোষণের অসুবিধা তাই উডসাহেব বলিয়াছে, 'গবরণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক।' (১ম অঙ্ক/৩য় গর্ভাঙ্ক)। নীলকরেরা যাকে তাকে ছয় মাসের কয়েদ করিবার আইনী সুযোগ লাভ করিয়া তাদের অত্যাচার বাড়াইয়া দিতেছে। নাট্যকার ১ম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে রেবতির উক্তির মধ্য দিয়া তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। নীলকরেরা যে আইনকেও প্রহসনে পরিণত করিয়াছিল চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারির দৃশ্যে তাহাও দেখানো হইয়াছে। সেখানে উডসাহেবের সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেট সলাপরামর্শ করিয়া মামলার রায় দিতেছে। নবীনমাধবের প্রতি উডসাহেবের বিষম ক্রোধের কারণ সে নিজেই ব্যক্ত করিয়াছে 'গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।' (১ম অঙ্ক/৩য় গর্ভাঙ্ক)। এইজন্যেই সাহেবের প্রতিশোধও নির্মম। শোষকের ধর্মই হইতেছে বিরোধিতার অঙ্কুর সমূলে বিনাশ করা। উডসাহেবের চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার তাহা ভালো করিয়াই দেখাইয়াছেন। নাটক হিসাবে নীলদর্পণের যে মূল্যই নিরূপিত হউক না কেন এই নাটকে অত্যাচারীর অত্যাচারের যে বাস্তব চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার গুরুত্ব অপরিসীম। বাঙ্‌লা সাহিত্যে এই ধরনের শোষণচিত্র সম্বলিত রচনা হিসাবেই নীলদর্পণ চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। নীলকরদের অত্যাচারের অবসান হইয়াছে কিন্তু শোষণের অবসান হয় নাই। গ্রামের কৃষক সম্প্রদায় আজিও পুলিশ, গুণ্ডা ও জোতদারদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতিত হইতেছে। তাই নীলদর্পণের আবেদন তাদের কাছে আজিও অপরিসীম। নীলদর্পণ নাটকের এই কালজয়ী আবেদনের জন্যই উহা সাময়িক রচনায় সীমাবদ্ধ থাকে নাই। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' কিংবা উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটকের মতো 'নীলদর্পণ'

বিস্মৃত হইয়া যায় নাই। তাহা যুগের কথা হইয়াও যুগোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে।

নাট্যকার নীলদর্পণকে ট্র্যাজেডি হিসাবেই গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহার কাহিনীবস্তু গঠনে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। গোলক বসু ও সাধুচরণের পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া নাটকের কাহিনী সুনির্দিষ্টভাবে পরিণতির দিকে ধাবিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে গোলকচন্দ্র বসুর পরিবারের সুখের চিত্র সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহারই পাশে সাধুচরণের পারিবারিক চিত্রও ফুটিয়া উঠিয়াছে। এবং এখানেই নীলকরদের অত্যাচারের ঘটনাও বর্ণনা করিয়া নাট্যকার প্রথম থেকেই নাট্যিক সংঘাতকে রূপায়িত করিয়াছেন। নবীনমাধব যখনই বলিয়াছে, 'কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা' তখন হইতেই নাটকীয় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। উডসাহেবের ক্রোধোক্তি, 'র‍্যাসকেল—এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব।' (১ম অঙ্ক/৩য় গর্ভাঙ্ক) নাটকের 'Initial Incident' বলা চলে। তাছাড়া নাট্যকার 'Dramatic Irony'-এর সাহায্যে ভাবী ঘটনার প্রতিও নানা ইঙ্গিত দিয়াছেন। সাধুচরণের উক্তি, 'দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ীর দিকে চাওয়া যায় না,'—গোলকচন্দ্রের পরিবারের আসন্ন ট্র্যাজেডির প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়াছে। অনুরূপ একটি সুন্দর 'ড্রামাটিক আয়রণি' প্রযুক্ত হইয়াছে সাবিত্রীর উক্তিতে। ক্ষেত্রমণি যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছে সাবিত্রী তখন তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছে, 'সুখে থাক, সাত বেটার মা হও'—(নেপথ্যে কাশি) (১ম অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)। এখানে সাত বেটার মা হওয়ার আশীর্বাদ, নেপথ্যে কাশির শব্দে বাধাগ্রস্ত হইয়া ক্ষেত্রমণির মর্মন্তুদ পরিণতির আভাস আনিয়া দিয়াছে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে নবীনমাধবের অন্তঃপুরের সম্প্রীতির দৃশ্যটি করুণ রসের 'contrast' হিসাবে অঙ্কিত হইয়াছে। নীলদর্পণ নাটকের প্রথম অঙ্কটি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ট্র্যাজেডি নাটকের অভীপ্সিত করুণ রসসৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়াই নাট্যকার অগ্রসর হইয়াছেন। প্রথম অঙ্কটি তাহার নিদর্শন।

দ্বিতীয় অঙ্কে নাট্যিক সংঘাত তীব্রতর হইয়াছে। নবীনমাধবকে শিক্ষা দেবার অভিপ্রায়ে উডসাহেব মিথ্যা মামলা সাজানোর উদ্যোগ করিয়াছে। প্রজাদের ধরিয়া কুঠিতে আনিয়াছে, তাহাদের মুখ হইতে মিথ্যা সাক্ষ্য আদায় করিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রথম দৃশ্যটিতে তোরাপ প্রভৃতি সাধারণ কৃষকদের সরস সংলাপের মাধ্যমে নীলকরদের অত্যাচার এবং নবীনমাধবের ঘনায়মান সঙ্কট উপস্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য দৃশ্যগুলিতে নায়কের ঘরে বাইরের সংগ্রাম, ক্ষেত্রমণি হরণের উদ্যোগ আয়োজন প্রভৃতি বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে নবীনমাধবের অন্তর্দ্বন্দ্ব কিছু পরিমাণে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নবীনমাধব

স্বগতোক্তিতে জানাইয়াছে, 'আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি, না পরোপকার পরম ধর্ম, সহসা পরাঙ্মুখ হব না, শ্যামনগরের কোনো উপকার করিতে পারিলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, দেখি কি করিতে পারি'—এইভাবে সাহেবদের চক্রান্ত এবং নবীনমাধবের বলিষ্ঠ প্রতিরোধের টানাপোড়েনের মাধ্যমে নাট্যিক ক্রিয়া গতিচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

তৃতীয় অঙ্কে প্রতিপক্ষের প্রবল আস্ফালনে নাট্যিক সংঘাত দ্রুতবেগে পরিণামের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। গোলোক বসুর কয়েদ হইয়াছে, নবীনমাধবের বাগানবাড়ী বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহার আবাদ একপ্রকার রহিত হইয়াছে, তাহার বসত বাটীর পুষ্করিণীর পাড়ে চাষ দিয়া তাহাকে বেইজ্জতি করিবার মতলব আঁটা হইয়াছে। অন্যদিকে ক্ষেত্রমণিকে হরণ করিয়া কুঠিতে লওয়া হইয়াছে। নবীনমাধব তোরাপের সাহায্যে তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে। এই দৃশ্যে যেমন ঘটনার ঘনঘটা আছে তেমনি নবীনমাধবের অন্তর্দ্বন্দ্বেরও সূক্ষ্ম রূপাঙ্কণ আছে। নবীনমাধব স্ত্রী সৈরিন্ধ্রীকে বলিয়াছে, 'তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।' (৩য় অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক)। এই ছোট্ট উক্তির মধ্য দিয়া নবীনমাধবের হৃদয়ের ক্ষোভ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্কে ট্র্যাজেডির 'Falling Action' সংঘটিত হইয়াছে। তৃতীয় দৃশ্যে ইন্দ্রাবাদের জেলখানায় গোলকচন্দ্রের উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে নাটকের 'climax'ও যেন রূপায়িত হইয়াছে। এই ঘটনাটিতেই প্রকট হইয়াছে যে প্রতিপক্ষই প্রবল, নবীনমাধব বিন্দুমাধবের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইতে বাধ্য। নীলকরদের হাতে কঠিন মার সহ্য করা ছাড়া তাহাদের আর গত্যন্তর নাই। প্রথম গর্ভাঙ্কে ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারির দৃশ্যটি অবান্তর। এই দৃশ্যটির পরিণামই নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয়, বিস্তৃত বিবরণ না পাইলেও কিছু আসে যায় না।

পঞ্চম অঙ্ক ট্র্যাজেডির 'catastrophe' বিয়োগান্তক ঘটনারাজীর মধ্য দিয়া পরিবেশিত হইয়াছে। নবীনমাধব তাহার পুষ্করিণীর পাড়ে চাষ রহিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পরিশেষে সাহেবের বক্ষে সজোরে পদাঘাত করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। পতিপুত্রশোকে সাবিত্রী উন্মাদিনী হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি ছোট বধূ সরলতার গলার উপর দাঁড়াইয়া শ্বাসরোধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নিজেও মৃত্যুবরণ করিলেন। অপর দিকে ক্ষেত্রমণিও বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রলাপ বকিতে বকিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইভাবে নবীনমাধবের জীবন-নাটকের ভয়ঙ্কর যবনিকাপাত ঘটিল।

অঙ্কবিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সত্য পরিস্ফুট হয় যে নীলদর্পণ নাটক

কতগুলি খাপছাড়া দৃশ্যের সমষ্টিমাত্র নয়। ইহার প্লট সুগ্রথিত এবং সূচনা থেকে উপসংহার পর্যন্ত কাহিনী সম্পূর্ণ গতিশীল। শেক্‌সপীয়রীয় পঞ্চমাঙ্কের ট্র্যাজেডির আঙ্গিকেই নাটকটি গঠিত হইয়াছে এবং সেই রীতিতেই নাটকটিতে উপকাহিনীরও সংযোজন করা হইয়াছে। করুণ রসের নাটকেও কৌতুকরসের আমদানি করা হইয়াছে। এখানেও শেক্‌সপীয়রের ট্র্যাজেডি নাটকের অনুসরণ আছে। জীবনের বহির্মুখী বিক্ষোভ নাটকে প্রাধান্য পাইলেও কয়েকটি দৃশ্যে সূক্ষ্ম শিল্প-সৌন্দর্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে পদীময়রাণীর আবির্ভাব এবং তার কুমতলব প্রকাশের পরেই নেপথ্যে কৃষক কণ্ঠের সঙ্গীত, যখন 'ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি/মোর মনে জাগে ও তার লয়ান দুটি' সুন্দর ভাববৈপরীত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। ক্ষেত্রমণির মৃত্যুতে মাতা রেবতী যখন আর্তনাদ করিয়া ওঠে, 'নমীর আৎ বুঝি পোয়ালো, আমার সোনার পিত্তিমে জলে খায়, আমার উপায় হবে কি!' তখন তার ক্রন্দনের মধ্য দিয়া সমস্ত ব্যথাতুরা মাতৃহৃদয়ই ক্রন্দন করিয়া ওঠে। ক্ষেত্রমণির বলাৎকারের দৃশ্যটিতেও নগ্ন জীবনসত্য যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও নাট্যকারের উচ্চ ক্ষমতাশক্তির পরিচয় বহন করে।

ট্র্যাজেডি হিসাবে নীলদর্পণের কতকগুলি ত্রুটিও পরিলক্ষিত হয়। এই নাটকে ঘটনাসংঘাত যতোটা প্রাধান্য পাইয়াছে অন্তর্দ্বন্দ্ব ততোটা প্রাধান্য পায় নাই। নীলকরদের অমানুষিক পীড়ন নবীনমাধব, ক্ষেত্রমণির শারীরিক দুর্গতির মধ্য দিয়া যতখানি প্রতিফলিত হইয়াছে, তাদের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ততখানি প্রকাশিত হয় নাই। নবীনমাধবের হৃদয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে তবে তাহা যদি আরো কিছুটা প্রাধান্য পাইত তাহা হইলে বহির্ঘটনা এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান হইত। নায়ক হিসাবেও নবীনমাধব অতিরিক্ত আদর্শপরায়ণ। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক সচেতন না হইয়াই সে প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে নামিয়াছে। ফলে তার পরাভব সম্বন্ধে প্রথম থেকেই কোনো সংশয় থাকে না। নাটকের উপসংহারে বিয়োগান্তক ঘটনার প্রাধান্যও করুণরস সৃষ্টির পথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে। নায়কের মৃত্যুর জন্য মানসিক প্রস্তুতিও গড়িয়া তোলা হয় নাই। ক্ষেত্রমণির মৃত্যু ছাড়া সাবিত্রী, সরলতা কারও মৃত্যু স্বাভাবিক হয় নাই। সেইরূপ আরেকটি আকস্মিক ও চমৎকারিত্ব-পূর্ণ ঘটনা গোলোকচন্দ্র বসুর আত্মহত্যা। গোলোক চন্দ্র বসুর পক্ষে অসম্মানের লজ্জা এড়ানোর জন্য উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু ইহা কাহিনীর সুদীর্ঘ ধারা অনুসরণ করিয়া অনিবার্য পরিণতিরূপে সংঘটিত হয় নাই। এই সমস্ত দোষ-ত্রুটির জন্য নীলদর্পণ ট্রাজেডি হিসাবে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। ইহাতে 'মেলোড্রামা'র লক্ষণই সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে।

চরিত্রসৃষ্টিতে নাট্যকার লক্ষণীয় মাত্রায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

তোরাপ, আহুরী, পদীময়রাণী, ক্ষেত্রমণি, রাইচরণ প্রভৃতি গৌণ চরিত্র সৃষ্টিতেই কৃতিত্বের পরিমাণ সমধিক।—সমাজের উচ্চ বর্ণের তুলনায় তথাকথিত নিম্ন বর্ণের চরিত্রগুলিই নাটকে সজীবতা লাভ করিয়াছে। তাহার কারণ হইতেছে যে এই চরিত্রগুলির ভূমিকা গৌণ বলিয়া চরিত্রে জটিলতা কম। ইহারা 'Flat' বা একমুখীন চরিত্র। ইহাদের চরিত্রে ক্রমবিকাশও নেই। নাটকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইহারা একইভাবে রূপায়িত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই সকল চরিত্রের মধ্যে যে জীবনী-শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা অন্যত্র দুর্লভ। নীলদর্পণ নাটকে যতোগুলি জীবন্ত চরিত্র আছে তোরাপ তার মধ্যে অন্যতম। সে নবীনমাধবের প্রতি যেমন কৃতজ্ঞ তেমনি আবার নিজেকে বাঁচানোর প্রবৃত্তিও তার আছে। সে জন্যই রোগের হস্তে রামকান্তরূপী নাদনা দেখিয়া সে স্বগতোক্তি করে—"সে নাদনা, অ্যাকেনে তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা করবো।" পরবর্তী ঘটনায় সে প্রমাণ দিয়াছে যে সে সবসময়েই ন্যায়ের পক্ষে অবিচারের বিরুদ্ধে। আহুরী চরিত্রটিও সুঅঙ্কিত, প্রধানতঃ হাস্যরসের মধ্য দিয়া সে আমাদের অন্তরে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। সে যখন তার স্বামীর ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ বলে, "মোরে বড্ডি ভালবাস্তো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলো", তখন আমরা হাসিব কি কাঁদিব ভাবিয়া পাই না। তাছাড়া রোগ সাহেবের পাপ-লালসার সংবাদ শুনিয়া সে যখন নিজেকে ক্ষেত্রমণির স্থানে অভিষিক্ত করিয়া বলিয়া উঠে 'সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থুথু! প্যাজির গোন্দো!—মুই ত আর একা বেরোব না. মুই সব সইতে পারি, গোন্দো সইতে পারি নে।" তখন তার বঞ্চিত জীবনের রিক্ততা অতি মর্মস্পর্শীরূপে ফুটিয়া উঠে।

নীলদর্পণ নাটকের অন্যতম শক্তিশালী উপাদান নাটকের ভাষা। নবীন-মাধব প্রমুখ চরিত্রের মুখে যে ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা কৃত্রিম ও আড়ষ্ট। নবীনমাধব যখন বলে, "আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করতে সঙ্কুচিত হয়।" তখন নীলকরদের নিষ্ঠুরতা সংলাপ মাধ্যমে কিছুই প্রকাশিত হয় না। আবার বিন্দুমাধব বিলাপের যে পদ্যময় ভাষা ব্যবহার করে তাহাও তাহার শোককাতরতা প্রকাশ করে না। কিন্তু রাইচরণ যখন বলে, 'আমিন সুমুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক্ করে মোর দিক্তি আস্‌চিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে'। অথবা প্রথম রাইয়তের সংলাপ 'কুঁদির মুখি বাঁক থাকবে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা।" কিংবা ক্ষেত্রমণির আকুলতা, 'ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেট্টয়ে দাও'। তখন ভাষা সমস্ত প্রকার ভাবোত্তাপ লইয়াই পরিস্ফুট হয়। এই ভাবে

কথ্যভাষা ব্যবহারের ফলে চরিত্রগুলি যেমনি সজীব হইয়াছে তেমনি নাটকে বাস্তবরসও সৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন, 'আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর মত থাকে না, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগের মত থাকে না'।

॥ সধবার একাদশী ॥

সধবার একাদশীকে অনেকেই দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাট্যরচনা হিসাবে ইহাকে গণ্য করা চলে না। এই নাটকের কাহিনী, চরিত্রের কোনো ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। নাটকের উপসংহারও স্পষ্ট হয় নাই। অটল নিমচাঁদের ভাব পরিবর্তন হইল কিনা তা বোঝা যায় না। অটল নিমচাঁদকে বলিয়াছে, "নিমচাঁদ ওঠ, বাবা না আসতে আসতে আমরা বাগানে যাই, যে মার খেইচি অনেক ব্রাণ্ডি না খেলে বেদনা যাবে না।" উত্তরে নিমচাঁদ ছড়া কাটিয়া মদ্য পানকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছে

"কি বোল বলিলে বাবা বলো আর বার,
মৃত দেহে হলো মম জীবন সঞ্চার।
মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি।"

অতএব নাট্যারম্ভে নাটক যে স্থানে ছিল নাটকের শেষেও নাটক সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া থাকে। কাজেই ইহাকে নাটক না বলিয়া প্রহসন বলিলেই সমীচীন হইবে। প্রহসন নির্ভর করে পরিস্থিতিগত চমৎকৃতি সৃষ্টির উপরে। অ্যালারডাইস নিকল বলিয়াছেন, "...its main characteristics are the dependence in it of character and of dialogue upon mere situation." সেদিক থেকে সধবার একাদশী জমজমাট। ইহাতে ঘটনা চরিত্রের ক্রমবিকাশ না থাকিলেও হাস্যরস যথেষ্ট আছে। সে কারণেই ইহা কখনো একঘেঁয়ে মনে হয় না। বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রাণবন্ত সংলাপের কৌতুকচ্ছটা আমাদের শেষ পর্যন্ত ধরিয়া রাখে। 'সধবার একাদশী'র প্রারম্ভ সুন্দর। নকুল বলিয়াছে, 'ওহে অটল নাকি মদ ধরেচে?' উত্তরে নিমচাঁদ জানাইয়াছে 'পানায়, খায় না।' নকুল তখন প্রশ্ন করে 'সুরাপান-নিবারণী সভা কচ্চে কি?' নিমচাঁদের উত্তর 'creating a concourse of hypocrites.' প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গরস নিয়া যে যাত্রা শুরু হইল তাহা আর কখনো থামে নাই। রামমাণিক্যের বাঙ্গাল কথা, ঘটিরাম ডেপুটির নির্বুদ্ধিতা, অটলের ছেলেমানুষি এবং সর্বোপরি নিমচাঁদের মর্মভেদী রসিকতার মধ্য দিয়া তাহা ক্রমশ উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কটিতে নিমচাঁদ, অটলবিহারী, ভোলা, রামমাণিক্য, কেনারাম প্রভৃতি রঙ্গের মহাসম্মেলনে কৌতুকরস যেন গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র

সংলাপের সাহায্যে রসসৃষ্টি করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দীনবন্ধু এখানে দিয়াছেন।

নিমচাঁদ চরিত্রটিও অপূর্ব। বাঙলা সাহিত্যে এই চরিত্রটি দ্বিতীয়রহিত। নিমচাঁদ মত্তপ, সে স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করে না, অটলবিহারীর মোসাহেবী করিয়া বেড়ায়, কুকর্মে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সায় দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নিমচাঁদ মনুষ্যত্বহীন নয়। সে বুদ্ধিমান, বিদগ্ধ, সুরসিক। তাই অধঃপতিত প্রতিভাবান ব্যক্তির ট্র্যাজেডি সধবার একাদশীর নিমচাঁদ চরিত্রের মধ্য দিয়া আভাসিত হইয়াছে। নিমচাঁদ ভালো করিয়াই জানে যে সুরাপান নিবারণী সভার যারা উদ্যোক্তা তারা অন্তঃসারশূন্য। সেজন্যই তাদের কটাক্ষ করিয়া সে বলে, 'দেখ দেখি বাবা, আস্পর্দ্ধার কথা দেখ দেখি, মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ কত্তে হবে—পীড়া হয়, প্রতীকার কর্, মেডিকল্ সায়েন্স হয়েচে কি জন্যে? পীড়া আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ-মিলনের সুখ পাবি—' (১ম অঙ্ক/১ম গর্ভাঙ্ক)। শুধু কটাক্ষ করিয়াই সে ক্ষান্ত হয় না, তার চেয়ে বিদ্যাবুদ্ধিতে হীন ঘটিরাম ডেপুটি প্রভৃতিদের উন্নতি দেখিয়া সে একপ্রকার মর্মজ্বালাও অনুভব করে। আত্মসমর্থনে তার উক্তি, 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়'— "These words should be written in letters of gold.—" (২য় অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক) তার মর্মদাহেরই যথার্থ অভিব্যক্তি। নিমচাঁদ মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল, মোসাহেব হইলেও তার প্রকৃতি হীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়নাই। সে সত্যিকার অপরাধকর্ম কখনই করিতে পারে না। অটলবিহারী যখন গোকুল বাবুর স্ত্রীহরণের প্রস্তাব দেয় তখন নিমচাঁদ অসম্মত হইয়া বলে, 'গৃহস্থের মেয়ে বার করবের মতলব কর না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, আমার কথা শোনো, গোকুলো ব্যাটাকে ধরে একদিন খুব করে চাব্‌কে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ, তোমার মেগের কাছে যাও'—(৩য় অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক)। নিমচাঁদের অকর্মণ্যতার পশ্চাতে তার দাম্পত্য জীবনের অসামঞ্জস্য কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অটল যখন তাকে তার স্ত্রীর কাছে যাবার কথা বলিয়াছে তখন নিমচাঁদ উত্তর দিয়াছে, 'Thou sticketh a dagger in me. অটল কি গালাগালিই তুই দিলি।' (৩য় অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক)। এখানেই তার অসুখী দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য এই বিষয়টি বিস্তার লাভ করে নাই। নিমচাঁদ চরিত্রটিই সামগ্রিকভাবে খুব একটা পরিস্ফুটনা পায় নাই। তার ট্র্যাজেডি, তার হতাশা, তার অন্তর্দ্বন্দ্ব সমস্তই আভাসে প্রকাশিত হইয়াছে। ট্র্যাজিক চরিত্ররূপেই নাট্যকার নিমচাঁদকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। যদিও তিনি সম্পূর্ণ সার্থকতা অর্জন করিতে পারেন নাই তথাপি আংশিক সিদ্ধিও অস্বীকার করা যায় না। নিমচাঁদের মধ্য দিয়া সে যুগের শিক্ষিত, প্রতিভাবান, কিন্তু অকৃতার্থ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরই জীবনযন্ত্রণা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর প্রতিভাস্পর্শে শৈশব অবস্থা পার হইল। ইহার পরের স্তরটিকে মধ্যযুগ বলিয়া অভিহিত করা যায়। কিন্তু আদি ও মধ্যযুগের সন্ধিক্ষণে মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ কতিপয় নাট্যকার আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। ইঁহাদের নাট্যপ্রতিভা উচ্চ শ্রেণীর ছিল না, তথাপি ইঁহারা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়া রঙ্গালয়ের চাহিদা মিটাইয়াছেন। মনোমোহন বসুর নাটকগুলি যাত্রাধর্মী, এগুলিকে গীতাভিনয় বলিয়াও উল্লেখ করা হইয়া থাকে। 'রামাভিষেক নাটক' অথবা 'রামের অধিবাস ও বনবাস' (১৮৬৭), 'সতী নাটক' (১৮৭৭), 'হরিশ্চন্দ্র নাটক' (১৮৭৫), 'পার্থপরাজয় নাটক অর্থাৎ বভ্রুবাহনের সঙ্গে অর্জুনের পরাভব' (১৮৮১) এবং 'রাসলীলা নাটক' তাঁর পৌরাণিক নাটক। এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে 'সতী নাটক' শ্রেষ্ঠ। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের বিষয় লইয়া নাটকটি রচিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চ অঙ্কে সম্পূর্ণ। বিয়োগান্তক পরিণতি দর্শকদের মনোমত হইবে না বলিয়া তিনি 'হরপার্বতী' মিলন নামে একটি অতিরিক্ত অঙ্কও যোগ করিয়াছিলেন। দক্ষযজ্ঞনাশ ও দক্ষের শাস্তিলাভ অংশ বর্জন করায় নাটকটিতে গতিশীলতা সঞ্চারিত হইয়াছে। চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার মধ্যযুগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া দেব চরিত্রের আধারে বাঙালী চরিত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে নারদের শিষ্য শান্তিরাম বা শান্তে পাগলা উল্লেখযোগ্য। সে বাইরে গাঁজাখোর পাগল কিন্তু অন্তরে ভাবুক। তার কথিত ছড়া এবং কবিতাগুলি উপভোগ্য হইয়াছে। পৌরাণিক নাটক ছাড়াও মনোমোহন 'প্রণয় পরীক্ষা' (১৮৬৯) ও 'আনন্দময় নাটক' (১৮৯০) নামে দুইটি সামাজিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। প্রণয় পরীক্ষার বিষয়বস্তু বহু-বিবাহ প্রথার দোষ প্রদর্শন। নাটকখানিতে প্লটের গাঁথুনি আছে, সমাজচিত্রণও অনেকাংশে বাস্তব। ব্রাহ্মসমাজকে ব্যঙ্গ করিয়া মনোমোহন 'নাগাশ্রমের অভিনয়' নামে একখানি যৎকিঞ্চিৎকর প্রহসনও রচনা করেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকখানি ইতিহাসাশ্রিত ও কল্পনামিশ্রিত রোমান্টিক নাটক, কয়েকটি প্রহসন এবং অনেকগুলি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। তবে তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে তিনি যে আবেগাত্মক স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহাই বাঙলা সাহিত্যে নূতন ধারার সূত্রপাত করিয়াছিল। তাঁর 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৫), 'সরোজিনী' (১৮৭৯), 'অশ্রুমতী' (১৮৮২) ও 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) ইতিহাসের পটে রোমান্টিক শ্রেণীর নাটক। 'পুরুবিক্রম' নাটকে পুরুর বিক্রম ও প্রণয়, 'সরোজিনী' নাটকে আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ, 'অশ্রুমতী' নাটকে প্রতাপসিংহের স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং তাঁর কাল্পনিক কন্যা 'অশ্রুমতী ও সেলিমের প্রেম', 'স্বপ্নময়ী' নাটকে বাঙলাদেশের শোভাসিংহের বিদ্রোহ ও বর্ধমানরাজ

কৃষ্ণরামের কন্যা স্বপ্নময়ীর সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। এই শ্রেণীর নাটকাবলীর মধ্যে 'সরোজিনী'ই শ্রেষ্ঠ নাটক। চিতোরের রাণা লক্ষ্মণসিংহের চিত্তে দেশপ্রেম এবং সন্তান স্নেহের দ্বন্দ্ব প্রদর্শন করিয়া উচ্চাঙ্গের নাট্যরস সৃষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনাতেও নাট্যকারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭), 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৩০৯) এই চারটি প্রহসন রচনা করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যে সুরুচিসম্মত কৌতুকরস পরিবেশন করিয়াছেন। 'হঠাৎ নবাব' এবং 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের নাটকের অনুবাদ। মধুসূদন, দীনবন্ধুর মতো সমাজের বাস্তবসমস্যাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রাধান্য দেন নাই। তিনি তাঁর প্রহসনগুলিতে একপ্রকার সূক্ষ্ম ও কৃত্রিম হাস্যরস সৃষ্টির দিকেই মনোযোগ দিয়াছিলেন।

মনোমোহন বসু প্রবর্তিত গীতাভিনয় নাট্যধারাকেই পুষ্ট করিয়া রাজকৃষ্ণ রায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছিলেন প্রকৃতিতে সেগুলি পৌরাণিক। তাহাদের মধ্যে 'অনলে বিজলী' (১৮৭৮), 'প্রহ্লাদ চরিত্র' (১৮৮৪), 'নরমেধ যজ্ঞ' (১২৯৮), 'বামনভিক্ষা' (১৮৮৫), 'যদুবংশ ধ্বংস' (১২৯০) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অতিনাটকীয়তা, অলৌকিকতা, ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস, তাঁর এই নাটকগুলিকে যাত্রার বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

সাধক ও ভক্তের জীবনবৃত্তান্ত লইয়া তিনি 'মীরাবাই' (১২৯৬) ও 'হরিদাস ঠাকুর' (১২৯৫) নাটক লিখিয়াছেন। তাছাড়া 'রাজা বিক্রমাদিত্য' (১৮৮৪), 'লৌহকারাগার' (১৮৮০) ও 'বনবীর' (১২৯৯) এই তিনটি ইতিহাস আশ্রিত নাটকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ধাত্রী পান্নার বিষয়বস্তু লইয়া 'বনবীর' নাটকটি রচিত হইয়াছে। নাটকটিতে বনবীরের চরিত্রটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। রাজকৃষ্ণ রায় 'দ্বাদশ গোপাল' (১৮৭৮), 'কলির প্রহ্লাদ' (১২৯৫), 'ডাক্তারবাবু' (১৮৯০), 'জগা পাগলা' (১২৯৭) প্রভৃতি অনেকগুলি প্রহসনও লিখিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া ফারসীকাহিনী অবলম্বনে 'লয়লা মজনু' (১২৯৮) এবং 'বেনজীর বদ্রেমুনির' (১৮৯৩) নামে দুইটি গীতিনাট্যও রাজকৃষ্ণ রায় রচনা করিয়াছিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সাধারণ নাট্যশালা স্থাপিত হইবার ফলে রঙ্গালয় আর ধনীদের একচেটিয়া চিত্তবিনোদনের সামগ্রী থাকিল না। ইহা সর্বসাধারণের সম্মিলিত আনন্দ উপভোগের পীঠস্থানে পরিণত হইল। নাট্যরচনার ক্ষেত্রে সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা নূতন জোয়ার আনিয়া দিল। প্রতিভাবান নট ও বাঙ্‌লা নাট্য সাহিত্যের জনপ্রিয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব হইল। বাঙলা নাট্যসাহিত্য যৌবনে পদার্পণ করিল। গিরিশচন্দ্র ছিলেন অভিনেতা। নাটক অভিনয় করিবার কালে মৌলিক নাটকের অভাব দেখিয়া

তিনি নাট্য রচনায় অগ্রসর হন। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, মহাপুরুষচরিতবিষয়ক প্রভৃতি নানাবিধ শ্রেণীর অসংখ্য নাটক তিনি রচনা করেন। ইহা ছাড়া প্রহসন, পঞ্চরং, রূপক, গীতিনাট্য প্রভৃতিও তিনি রচনা করেন। রঙ্গালয়ের দর্শকদের চাহিদা মেটানোর জন্যই তিনি নাটক লিখিয়াছিলেন। স্থায়ী সাহিত্য মূল্যের দিকে তিনি ততোটা মনোযোগ দিতে পারেন নাই। ফলে তাঁর অধিকাংশ নাটকই যুগের উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হয় নাই। তথাপি তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। দেশীয় ও জাতীয় ভাবকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে বিপুল নাট্যসাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। নাটকের আঙ্গিক, ভাষা ও ছন্দ প্রভৃতি লইয়াও তিনি পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁর চিত্তে ভক্তিভাবের উদ্বোধন হইয়াছিল। তাই তাঁর পৌরাণিক, মহাপুরুষ চরিত বিষয়ক নাটকে ভক্তির পরিমণ্ডল সার্থকতামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। তুলনামূলকভাবে তাঁর সামাজিক নাটক সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। সেখানে ঘটনার ঘনঘটা বাস্তবতার উর্ধ্বস্তরেই সীমাবদ্ধ, জীবনের গভীর স্তরে তা পৌঁছাইতে পারে নাই। গীতিনাট্য রচনার দ্বারাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যজীবনের সূত্রপাত হয়। 'আগমনী' (১৮৭৭), 'অকালবোধন' (১৮৭৭), 'দোললীলা' (১৮৭৮), 'মায়াতরু' (১৮৮১) ও 'মোহিনী প্রতিমা' (১৮৮২) প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের গীতিনাটক প্রথম যুগে রচিত হয়, মধ্যস্তরে তিনি রচনা করেন 'মলিনা-বিকাশ' (১২৯৭), 'মলিনমালা' (১৮৮২), 'আবু হোসেন' (১৩০৩) প্রভৃতি। গীতিনাটকের মধ্যে 'আবু হোসেন' শ্রেষ্ঠ। নাট্যকার ইহাকে কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লেখকের রচনা গুণে কৌতুকরস নাটকের আদ্যন্ত গতিশীল করিয়া রাখিয়াছে।

গিরিশচন্দ্র কতকগুলি হালকা প্রহসন ও রচনা করিয়াছেন, এগুলি পঞ্চরং নামে প্রসিদ্ধ। 'সপ্তমীতে বিসর্জন' (১৩০৩), 'বড়দিনের বকশিশ' (১৮৯৪), 'সভ্যতার পাণ্ডা' (১৮৯৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহাদের আকার খুব সংক্ষিপ্ত এবং ঘটনাও নিতান্ত সাধারণ ও সরল। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে প্রহসনগুলি পরিপূর্ণ।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকগুলির ভিতরে 'রাবণ-বধ' (১৮৮১), 'সীতার বনবাস' (১৮৮২), 'লক্ষ্মণ বর্জন' (১৮৮২), 'অভিমন্যু বধ' (১৮৮১) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাঙ্‌লার প্রাচীন সাহিত্যে দেবতার সঙ্গে মানুষের যে একটি সহজ সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায় গিরিশ-চন্দ্রের পৌরাণিক নাটক সেই ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। আঙ্গিকে এগুলির অধিকাংশই যাত্রাধর্মী। গভীর কোনো দ্বন্দ্ব বা আদর্শের সংঘাত এই নাটকগুলির মধ্যে নাই। নাট্যরূপের মধ্য দিয়া পৌরাণিক কাহিনীই এগুলিতে পরিবেশিত হইয়াছে। তবে গিরিশচন্দ্রের শেষ পর্বের 'জনা' (১৮৯৪) নাটকটি

বাস্তব আবেগ ও প্রবৃত্তির ঘাতপ্রতিঘাতে গতিময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার চরিত্র-সৃষ্টিও সার্থকতামণ্ডিত। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকাবলীর মধ্যে 'জনা' শ্রেষ্ঠ।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ ধর্মসাধকের চরিত্র লইয়া গিরিশচন্দ্র ভক্তিরসপ্রধান রচনা করিয়াছেন যথা, 'চৈতন্যলীলা' (১২৯১), 'বুদ্ধদেবচরিত' (১৮৮৭), 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' (১২৯৩), 'রূপসনাতন' (১২৯৪), 'শঙ্করাচার্য' (১৩১৬), 'কালাপাহাড়' (১৮৯৬), 'নসীরাম' (১৮৯৬), 'পূর্ণচন্দ্র' (১৮৮৮) প্রভৃতি। ঐতিহাসিক পটভূমিকা থাকিলেও এগুলিকে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। কিংবদন্তী, অলৌকিক জনশ্রুতি প্রভৃতিই প্রধান অবলম্বন। ভক্তির সুরটিই জীবন চরিতের উপাদান অতিক্রম করিয়া প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। প্রকৃতিতে এগুলি গিরিশ ঘোষের পৌরাণিক নাটকের সমধর্মী।

গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটকও রচনা করেন। তাদের মধ্যে 'চণ্ড' (১২৯৭), 'সৎনাম' (১৯০৪), 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাসিম' (১৩১৩), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৩১৪) ও 'অশোক' (১৩১১) উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইতিহাসের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা। তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' যেন ইতিহাস-গ্রন্থেরই নাট্যরূপ। ঐতিহাসিক প্রামাণিক ঘটনাগুলি তিনি অনেকাংশেই অবিকৃত রাখিয়াছেন। অবশ্য ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেশাত্মবোধের আবেগ-আকুলতাও তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিও সেযুগে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শান্তি' (১৩১৫), 'মায়াবসান' (১৮৯৮) প্রভৃতি সামাজিক নাটকগুলিতে পারিবারিক সমস্যার জটিলতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। 'প্রফুল্ল' নাটকটি সেকালে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। যোগেশের সাজানো বাগান শুকাইয়া যাইবার মর্মন্তুদ কাহিনী লইয়া নাটকটি গড়িয়া উঠিয়াছে। যোগেশ চরিত্রটির মধ্যে ট্র্যাজিক চরিত্রের সূক্ষ্মতা কিছুটা রহিয়াছে বলিয়া তার বিলাপ এখনও আমাদের অন্তর স্পর্শ করে। অতিনাট্যিক ঘটনার আধিক্যের ফলে নাটকের পরিণাম অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে। গিরিশচন্দ্রের সমস্ত সামাজিক নাটকেই প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, মৃত্যুর ঘনঘটা পরিলক্ষিত হয়। সমাজ বা পরিবারের সমস্যার অন্তস্থলে তিনি কখনও প্রবেশ করেন নাই। বাহিরের ঘটনার উপরে জোর দেবার ফলে চমকপ্রদ পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হইয়াছে, প্রকৃত বাস্তবরস পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

এখানে আমরা গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি নাটকের আলোচনা করিতেছি। গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটক সমকালে জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হইলেও কালের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই। তাঁর 'রাবণবধ', 'লক্ষ্মণবর্জন', 'পাণ্ডব গৌরব', 'চৈতন্য লীলা', 'হারানিধি', 'বলিদান' বর্তমানে অভিনীত হয় না, অভিনীত হইলেও

তাহা দর্শক চিত্তে আবেদন সৃষ্টিতে অক্ষম। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনেই গিরিশচন্দ্র অধিকাংশ নাটক রচনা করেন এ সত্য অস্বীকার করা চলে না। এ জন্যই তাঁর নাটকাবলীতে দর্শকদের চাহিদা পূরণের সব শর্তই পালিত হইয়াছে। ভক্তিরস, নৈতিক শিক্ষা, আমোদ প্রমোদ, ঘটনার ঘনঘটা প্রভৃতি উপাদানে তিনি তাঁর নাটকাবলী পূর্ণ করিয়াছেন। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই বাঙলা সাহিত্যে যে সকল নাট্যধারার সূচনা হইয়াছিল গিরিশচন্দ্র তাহাদেরই পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি নূতন কোনো আদর্শ তুলিয়া ধরেন নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের সংঘর্ষের নূতন আলোড়নে তখনকার সাহিত্য আলোড়িত। গিরিশচন্দ্র কিন্তু এই সংঘর্ষের সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই। তিনি দেশীয় ঐতিহ্যকে বরণ করিয়াছেন, বিদেশী ভাবধারাকে সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, 'এজন্য যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে, দেশীয় স্বভাব-শোভা, দেশীয় নায়ক-নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয় স্রোত তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে।' ধর্মপ্রাণ হিন্দু যে বণিক সভ্যতার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া ধর্মপ্রাণতা বজায় রাখিতে পারিতেছে না, বণিকসভ্যতার প্রলোভন তাকে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিতেছে, ধর্মের স্থানে মানবিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে গিরিশচন্দ্র এ সমস্ত সত্য অনুধাবন করিতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁর নাটকে প্রকৃত পক্ষে কোনো দ্বন্দ্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অঙ্ক ও দৃশ্যে বিভক্ত হইলেও তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ক্রমবিকশিত হইয়া উপসংহারে ধাবিত হয় নাই। এখানেও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের পরিবর্তে দেশীয় যাত্রার ধারাই অনুসৃত হইয়াছে। শেক্‌সপীয়রের দ্বন্দ্ববহুল নাট্যিক আঙ্গিক গিরিশচন্দ্র অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু সে অনুসরণও নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হইতে পারে নাই। শেক্‌সপীয়রের অনুসরণে তিনি নাটক মধ্যে, আকস্মিক মৃত্যু, নিষ্ঠুর হত্যা, বিষ প্রদান, ভৌতিক চরিত্র, নারীর ছদ্মবেশ প্রভৃতির সমাবেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সমস্ত উপাদানকে শিল্পসৌন্দর্যে সুষমাময় করিতে পারেন নাই। শেক্‌সপীয়রের নাটকের জটিল ও সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব গিরিশচন্দ্রের নাটকে নাই বলিলেই চলে। রোমান্টিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকে গিরিশচন্দ্র এক ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা গৈরিশ ছন্দ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। এই ছন্দে ভাব দ্রুত ও গতিময় হইয়া উঠিয়াছে। আন্দোলিত মনের তরঙ্গাঘাত এই ছন্দে বাণীরূপ লাভ করে। কথোপকথনের পক্ষেও এই ছন্দ সহজসাধ্য। গিরিশচন্দ্র তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতেও কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়া এক ধরনের বাস্তবতা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকে সিরিওকমিক শ্রেণীর এক প্রকার

চরিত্রও সৃষ্টি করিয়াছেন। এই চরিত্রগুলি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। এইভাবে ভাষা, চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়েও গিরিশচন্দ্র সচেতনভাবে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সংযোজন করিতে পারিয়াছেন যার ফলে বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই।

॥ বিল্বমঙ্গল ॥

বিল্বমঙ্গলকে ঠিক পৌরাণিক নাটক বলা চলে না। ইহা মহাপুরুষ জীবনীমূলক নাটকেরই অন্তর্ভুক্ত। নাট্যকার ইহাকে প্রেমবৈরাগ্যমূলক নাটক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিল্বমঙ্গল, চিন্তামণি, ভিক্ষুক, বণিক, বণিকপত্নী সকলেই কৃষ্ণ প্রেমসাধিকা। সখ্য, বাৎসল্য কৃষ্ণপ্রেমের ভিন্ন ভিন্ন রসকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাতে অহেতুক ভক্তি, গুরুতত্ত্ব, ধর্মসমন্বয় প্রভৃতিরও বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রচার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই টহলদারের গানে বৈরাগ্যের সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। 'কেউ কারো নয় দেখনা চেয়ে, কবে ফুটবে আঁখি?/ আপন রতন বেছে নে চল, হরি বলে ডাকি।' এই হরিপিপাসা সার্থক হইবে যখন বাসনার আবিলতা দূরে চলিয়া যাইবে। হইলও তাই। বিল্বমঙ্গল যখন অন্ধ হইলেন তখন, 'বাসনা মলিন আঁখি কলঙ্ক ছায়া ফেল্‌বে না তায়/ আঁধার হৃদয় নীল উৎপল চিরদিন রবে পায়'। নাটক শেষে দেখানো হইয়াছে শুধু বিল্বমঙ্গলই নয়, চিন্তামণি, বণিক, বণিকপত্নী, ভিক্ষুক পাগলিনী, সোমগিরি সকলেই কৃষ্ণদর্শনে আসিয়াছে। সকলেরই কৃষ্ণদর্শন প্রাপ্তি হয়। এইভাবে পরিপূর্ণ মিলনানন্দে নাটকের যবনিকাপাত হইয়াছে।

বিষয়বস্তুতে এ নাটকে নূতনত্ব নাই। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সমাজ কল্যাণমূলক যুগোচিত প্রেমভক্তিরও কোনো নিদর্শন নাটকে নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মধুর রসাত্মক প্রেমধর্মেই নাটকটি পরিপূর্ণ। তবে নাটকটিতে বিল্বমঙ্গলের জীবনকাহিনীর বিকাশ এবং উপকাহিনী গ্রন্থনে নাট্যকারের কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া নাটকটিতে একদিকে আধ্যাত্মিকতা অন্যদিকে বাস্তবতা সুন্দর ভাববৈপরীত্যের সৃষ্টি করিয়াছে। বারবণিতা, ভিক্ষুক চোর, কপট সাধুর কার্যকলাপ নাটকে মানবিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। সংলাপেও এই ভাববৈপরীত্য সুপরিব্যক্ত। গৈরিশ-ছন্দে ভক্তিভাব যেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে অপরদিকে কথ্যভাষায় স্থূল বাস্তবরস সৃষ্টি হইয়াছে।

॥ জনা ॥

জনা গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক। পৌরাণিক নাটকের ভক্তিভাব-

পূর্ণ পরিমণ্ডলের সঙ্গে মানবিক প্রবৃত্তির সুন্দর সমন্বয় নাটকে দৃষ্টিগোচর হয়। পৌরাণিক নাটকের প্রায় সমস্ত লক্ষণই জনা নাটকে রহিয়াছে। জনার ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অশ্বত্থ গাছের দগ্ধ হওয়া আবার ভক্ত বৈষ্ণবের আবির্ভাবে সেই বৃক্ষে নবপত্র পল্লবের সঞ্চার, মদন ও রতির আবির্ভাব, মায়ানায়িকাদের মায়াপ্রভাব, গঙ্গারক্ষকদের প্রহরা, প্রবীর, মদনমঞ্জরী ও জনার মৃত্যুশেষে কৈলাসে আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি অসংখ্য অলৌকিক ঘটনায় নাটকের আদ্যন্ত পরিপূর্ণ। নাটকের ঘটনাস্থলও কৈলাস পর্বতে, একাধিকবার স্থানান্তরিত হইয়াছে। নাটকের অন্যতম সক্রিয় চরিত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি নিজেই স্বীকৃতি জানাইয়াছেন, "ধরিয়াছি নর-দেহ ধরার রোদনে।" (২য় অঙ্ক/৪র্থ গর্ভাঙ্ক)। এই শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ সবসময়েই নর-দেহধারীর উপযুক্ত থাকে নাই তাহা অমানুষিকও হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃষকেতুকে জানাইয়াছেন

"যে নিঃশ্বাসে অশ্বত্থ শুকাল
ভস্মতায় হইত অর্জুন।
বৃক্ষরূপে আমি তাহা করেছি গ্রহণ,
বিষহীন ভুজঙ্গিনী জনা এবে।
(৪র্থ অঙ্ক/১ম গর্ভাঙ্ক)

তিনি নাটক শেষে নীলধ্বজকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়াছেন যার ফলে কৈলাসে পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূদের দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন রাজা নীলধবজ। নাটকের প্রারম্ভটিই আরম্ভ হইয়াছে কৃষ্ণরতি দিয়া। নীলধ্বজ কল্পতরুসম জামাতা অগ্নিদেবের কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন,

কল্পতরু যদি তুমি দেব বৈশ্বানর
দেহ বর,
যেন নটবর নবঘন-কায়
বাঁশরি বয়ান ত্রিভঙ্গিম ঠাম
নররূপী নারায়ণে পাই দরশন।

নীলধ্বজের এই প্রার্থনা পূরণের মধ্যেই নাটকের মূল সুর ধ্বনিত হইয়াছে। নাটক মধ্যে যেভাবে কারণে অকারণে কৃষ্ণভক্তির উচ্ছ্বাস দেখানো হইয়াছে তাহা পৌরাণিক নাটকেই সম্ভব। এখানে মহাদেব হরি বলে নাচেন, প্রমথগণ, যোগিনীগণ হরির স্তবগানে মুখর, রাজা নীলধ্বজ কৃষ্ণকে পুত্রনিধন-কারীর সখা জানিয়াও তাঁহার শরণ নেন, বিদূষক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনর্গল কৃষ্ণের ব্যাজস্তুতি করিয়া যান, বিদূষককে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কৃষ্ণ বৃন্দাবনে

যুগলমূর্তিতে দেখা দেন। বিদূষক এবং বৃষকেতু চরিত্র দুইটি কৃষ্ণভক্তের দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। নাটকের অধিকাংশ সঙ্গীতগুলিই ভক্তিভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই সংযোজিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। দৈবলীলার মাহাত্ম্য প্রদর্শনই নাটকটির প্রধান উদ্দেশ্য। যদিও প্রবীর ও জনার বিরোধিতা দেখানো হইয়াছে কিন্তু সে শক্তি যে শ্রীকৃষ্ণের শক্তির কাছে পরাভূত হইবেই নাটকের প্রথম থেকেই সে ইঙ্গিত দেওয়া হয় ফলে নাট্যিক কৌতূহলও ক্ষুণ্ণ হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন,

'নীর হেরি নারীচক্ষে, দয়া না করিব,
প্রবীরে বধিব।'

এবং তার পূর্বে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে তিনি প্রবীরবধের উপায়ও করিয়াছেন। কাজেই দৈব অথবা পুরুষকারের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নাটকের সংঘাত গড়িয়া ওঠে নাই। পৌরাণিক নাটকের আদর্শেই জনা নাটকে দৈবশক্তির জয়গান উচ্চারিত হইয়াছে। নাটকের পরিণতিতেও শান্তরসের সঞ্চার করিয়া সব দুঃখকষ্টের সমাধান করা হইয়াছে। নাটকের শেষে স্থাপিত ক্রোড় অঙ্কটি এই উদ্দেশ্যেই আকস্মিকভাবে হইলেও সংযোজিত হইয়াছে।

পৌরাণিক নাটক হিসাবে গঠিত হইলেও জনার মাতৃহৃদয়ের সংঘাত কেন্দ্র করিয়া নাটকটিতে একপ্রকার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইয়াছে। তবে সেই দ্বন্দ্বকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস নাট্যকার করেন নাই। সে কারণে সম্ভাবনা সত্ত্বেও জনা নাটকে নাট্যিক সংঘাত বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। প্রথম অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে মাতাপুত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে জনার মাতৃহৃদয়ের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। জনা প্রবীরকে বলিয়াছেন,

'নয়ন আনন্দ তুমি জীবন আমার
ভাবি মনে পাছে তোর হয়, অকল্যাণ।'

কিন্তু প্রবীর যখন বীরত্বমন্ত্রে মাতাকে উদ্বোধিত করিল তখন জনার অন্তরে পরিবর্তন সাধিত হইল। তিনি পুত্রের পক্ষ গ্রহণ করিলেন। তাঁর বিরোধিতা নাটকের ঘটনারাজীকে সম্পূর্ণ বিপরীত খাতে প্রবাহিত করিল। তিনি অনিচ্ছুক মন্ত্রী সেনাপতি সকলকে যুদ্ধে সম্মত করাইয়া নাটকের নিস্তরঙ্গ আবহাওয়ার মধ্যে যুদ্ধ তথা সংঘাতের তূর্য-নিনাদ ঘোষণা করিলেন। জনার বিরোধিতায় শ্রীকৃষ্ণকেও সক্রিয় হইতে হইল। এইভাবে প্রবীরের পতন পর্যন্ত নাটকটি গতিশীলতায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্ক হইতে জনার একক প্রতিবিধিৎসা নাটক মধ্যে নূতন কোনো তরঙ্গ সৃষ্টি করিতে পারিল না। তাহা ছাড়া অর্জুনকে বিনাশ করিবার জন্ত ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস পরিত্যাগের ব্যাপারটিও অমানবিক হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া যথার্থ নাট্যরস সৃষ্টি হইতে পারে নাই। জনার প্রতিবিধিৎসাও নিস্তরঙ্গ তাহা কার্যকারণ সম্পর্ক মানিয়া চলে নাই। পুত্র নিধনে

যাঁর এত ক্রোধ তাঁকে স্নেহশীলা মাতারূপে গণ্য করিতেই সংশয় হয়। তিনি স্বাহাকে এই বলিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন,

'কে রাক্ষসী মা বলিস্ মোরে ?
মরেছে প্রবীর, মরেছে কুমার,
পুত্র, পুত্রবধূ মম পড়িয়ে শ্মশানে—
ফুরায়েছে মা বলা আমার।

(৪র্থ অঙ্ক/৫ম গর্ভাঙ্ক)

কেন স্বাহা কি তার কন্যা নয়? প্রবীরের মৃত্যুতে যাঁর শোক ক্রোধে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে প্রবীর বাঁচিয়া থাকিতে সেই মাতার স্নেহের স্বরূপও নাটকে তেমন স্পষ্ট করিয়া আঁকা হয় নাই। এসব কারণে নাটকমধ্যে জনার মাতৃস্নেহের দ্বন্দ্বও পরিণতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতা অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই।

নাটকের চরিত্রের মধ্যে জনাই প্রধান। জনার অস্তিত্ব মানবিক হইলেও দেবীত্বের উপাদানও সেখানে আছে। তিনি জাহ্নবীর মহাসহচরী ভোগ লালসায় পৃথিবীতে আসিয়াছেন আবার ভোগলালসা অন্তে কৈলাসে গিয়া মহাদেবকে চামর ঢুলাইয়া সেবা করিয়াছেন। প্রতিহিংসায় উন্মাদিনী জনার ক্রোধনিঃশ্বাসে অশ্বথ বৃক্ষ পুড়িয়া গিয়াছে। তাঁহাকে গঙ্গারক্ষকেরা পাহারা দিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু দেবী জনা নয় মানবী জনাই নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছেন। জনা বীরপুত্রকে ভালোবাসিয়া তাঁহার বীরত্ব গৌরব সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বীরমাতা। কিন্তু তথাপি তো তিনি মাতা। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে তাঁর মাতৃহৃদয়ের সুন্দর অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়। স্নেহময়ী মাতৃহৃদয় পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া কম্পিত, ক্ষত্রিয় জননী সবলে সেই আশঙ্কার কণ্ঠ রোধ করিয়া দিতেছেন। পুত্রবধূকে ভৎসনার মধ্যে জনার মাতৃহৃদয়ের আশঙ্কাই তির্যকভাবে আভাসিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি সমস্ত দুর্বলতা কঠিন সংযমে পরিহার করিয়া লইয়া বীরপুত্রের সাধনার সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্বকে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। সে কারণেই নিষ্ক্রিয় সেনাপতি ও মন্ত্রীদের তিনি বীরমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করিতে পারিয়াছেন। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আবার ব্যাকুলা মাতৃহৃদয়ের সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু এখানেও তিনি দুর্বলতাকে সবলে পরিহার করিয়া গঙ্গাপূজা করিয়া মনকে সুস্থির করিয়াছেন। কিন্তু স্থৈর্য জনার ভাগ্যে নাই। রণক্ষেত্রে পুত্রকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া জনা শোককে অনলে পরিণত করেন। সেই শোকের অনলে তিনি চতুর্দিক ভরিয়া দিতে চাহিয়াছেন কিন্তু কেহই তাঁহার কথা শোনে নাই। ব্যর্থ প্রতিহিংসায় জনা শেষে গঙ্গার শীতল সলিলে সব জ্বালা জুড়াইলেন। জনা চরিত্রের এই পরিণতির মধ্যে ট্র্যাজিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তিনি সকলের উপেক্ষিতা, সকলের

পরিত্যক্তা। কেহই তাঁর আকুলতা বোঝে না। আসলে জনার চরিত্রে অতিরিক্ত স্নেহই, তাঁর ট্র্যাজেডির মূল কারণ। এই স্নেহ ক্রোধে পরিণত হইয়া জনা চরিত্রের সমস্ত সামঞ্জস্যকে নির্মূল করিয়া দিয়াছে। স্নেহময়ী জনার চিত্র যদি আরো একটু বিস্তৃত পাওয়া যাইত এবং তাঁর প্রতিহিংসাও যদি আরো বাস্তব সম্মত হইত তবে জনা চরিত্রটি ট্র্যাজিক চরিত্র হিসাবে সার্থক হইতে পারিত।

জনা ছাড়া এ নাটকে নীলধ্বজ, প্রবীর প্রভৃতি চরিত্রের তেমন কোনো বিশেষত্ব ফোটে নাই। বিদূষক চরিত্রটিতে ব্যাজস্তুতির মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি স্ফুরণের প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এদিক থেকে চরিত্রটির পরিকল্পনায় নাট্যকারের কৃতিত্বের পরিচয় রহিয়াছে। সে সরস কথাবার্তা বলিয়া নাটকের ভক্তি ও প্রতিহিংসার আবহাওয়াতে সজীবতা আনিয়াছে। সংস্কৃত বিদূষক ও ইংরেজী ফুল ধরনের চরিত্রের অনুসরণে এ চরিত্রটি সৃষ্টি করা হইয়াছে। তার চরিত্রের কৃষ্ণভক্তি ছাড়াও রাজভক্তিও লক্ষণীয় মাত্রায় রহিয়াছে।

॥ প্রফুল্ল ॥

গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক ও অন্যতম জনপ্রিয় নাটক প্রফুল্ল। নাটকটিকে সামাজিক নাটক না বলিয়া পারিবারিক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করাই সঙ্গত। কারণ এখানে মদ্যপানের কুফলতারূপ সামাজিক সমস্যা প্রাধান্য পায় নাই। যোগেশের সাজানো বাগান শুকাইয়া যাওয়ার কাহিনীই নাটকটির প্রধান কাহিনী। যোগেশের একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শটি জীবন দিয়াও রক্ষা করিল তারই ভ্রাতৃবধূ প্রফুল্ল। এজন্যই চরিত্রের দিক থেকে নয়, আদর্শের দিক থেকেই নাটকের নামকরণ হইয়াছে প্রফুল্ল। রমেশ চরিত্রটিকে যোগেশের নিঃস্বার্থপরতার বিপরীতে নৃশংস স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো হইয়াছে। যোগেশ এবং রমেশের সংঘাত যথাক্রমে সংযুক্ত একান্নবর্তী পরিবার এবং স্বার্থপর পৃথক পরিবারের সংঘাত। রমেশ যোগেশকে জুয়াচোরে পরিণত করিয়াছে, তাহাদেরকে বাটী থেকে বিতাড়িত করিয়াছে, ছোটো ভাইকে জেল খাটাইয়াছে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে মারিয়া ফেলিবার চক্রান্ত করিয়াছে এবং সে চক্রান্তে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নিজের স্ত্রীকেও হত্যা করিয়াছে। অথণ্ড স্বার্থপরতার 'টিপিকাল' নিদর্শন রমেশ। এই স্বার্থপরতার রন্ধ্রপথেই যোগেশের সাজানো বাগানে আগুন জলিয়াছে এবং সে আগুনে রমেশ নিজেও পুড়িয়াছে অন্যদেরও পোড়াতে চেষ্টা করিয়াছে। তবে পরিণতিতে তার প্রয়াস সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করে নাই। যোগেশের বংশধর যাদব বাঁচিয়াছে। গিরিশচন্দ্র যুগের সমস্যাকে রূপ দিতে গিয়া এইরূপ একটি মনোমত সমাধানও ইঙ্গিতে রাখিয়া গিয়াছেন। সামাজিক নাটক হইলে এটি নিশ্চিত ট্র্যাজেডি হইত কিন্তু পারিবারিক নাটক বলিয়াই

পরিবারের কল্যাণীবধূর আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়া আশার রাগিনী ধ্বনিত হইয়াছে।

নাটকটির গঠন ট্র্যাজেডি নাটকের অনুসরণেই গড়িয়া উঠিয়াছে। যোগেশ যখন সারাজীবনের শ্রমে একটি সুখী পরিবারকে গড়িয়া তুলিয়াছে সেই সময়েই ব্যাঙ্ক ফেলের ঘটনায় সেই পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিল। যোগেশ এই আকস্মিক আঘাতে স্বাভাবিক ভাবেই বিচলিত হইল। সে মদ্যপান করিয়া আত্মবিস্মৃত হইল। তারপরে যখন সম্বিত্ ফিরিয়া আসিল তখন যোগেশ সংকল্প করিল সব কিছু বিক্রয় করিয়া পাওনাদারদের টাকা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়া দিবে। এইভাবে যোগেশ ভাগ্যের মার প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু রমেশ সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে যোগেশের শত্রুতা করিতে লাগিল। সে মাকে বুঝাইয়া যোগেশের দুর্বলতার সুযোগে তাহাকে দিয়া বাড়ী বেনামী মর্টগেজ করিবার কাগজপত্র সই করিয়া নিল। এই ভাবে পাওনাদারদের প্রতারিত করিয়া যোগেশ বিবেক দংশনে কাতর হইয়া ক্রমাগত মদ্যপান করিতে লাগিল। মাতাল অপবাদ দিয়া রমেশ যোগেশকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিল। যোগেশ যেন সমস্ত কিছু বুঝিতে পারিয়াই হতোদ্যম হইয়া গেল। রমেশের বিরুদ্ধে তথা ভাগ্যের বিরুদ্ধে সে আর কোনো প্রতিরোধ করে নাই। নিষ্ক্রিয় মাতাল হইয়া পত্নীকে রাস্তায় মরিতে দেখিয়াছে, পুত্রের হাত হইতে পয়সা কাড়িয়া লইয়া মদ খাইয়াছে। মাঝে মাঝে 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। যোগেশ মদ্যপ হইয়া নিষ্ক্রিয় হইলেও ঘটনাস্রোত থামিয়া থাকে নাই। একদিকে যোগেশের ভৃত্য পীতাম্বর অন্যদিকে তার ছোটো ভাই সুরেশের সমবেত চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত রমেশের খলতা ধরা পড়িয়াছে। প্রফুল্লকে হত্যা করিবার পরে পুলিশ আসিয়া তাহাকে গ্রেফ্তার করিয়াছে। রমেশ, জগমণি ও কাঙালীচরণের কার্যকলাপ আতিশয্য দোষদুষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানদা, উমাসুন্দরী, প্রফুল্লর মৃত্যুও আকস্মিক। কাজেই ঘটনা গ্রন্থনে ট্র্যাজেডি অপেক্ষা মেলোড্রামার আদর্শই অধিক মাত্রায় অনুসৃত হইয়াছে। মর্মন্তুদ ঘটনার সাহায্যেই করুণ রস ফোটানোর চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অনুরূপ কোনো সূক্ষ্ম শিল্পশৈলীর আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। নাট্যকার যদি পারিবারিক ট্র্যাজেডির বদলে যোগেশের চরিত্র ট্র্যাজেডি হিসাবে নাটকখানি প্রণয়ন করিতেন তাহা হইলে অনেক অবান্তর ঘটনা পরিহার করিতে পারিতেন। তাহা হইলে ভাবাবেগমুক্ত হইয়া এটি প্রকৃত ট্র্যাজেডি হইয়া উঠিতে পারিত। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের অনুসরণ করায় নাট্যকার নাটক মধ্যে অবিশ্বাস্য সব ঘটনার আমদানি করিয়াছেন। যে রমেশকে স্বার্থপরতার জীবন্ত মূর্তি বলিয়া নাটকে দেখানো হইয়াছে সেই রমেশের স্বার্থপরতার কোনো পরিচয়ই কি যোগেশ পূর্ব জীবনে পায় নাই? যোগেশকেও কুশলী বৈষয়িক পুরুষ রূপে বর্ণনা করা

হইয়াছে যে নিজের উদ্যোগে শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর এত বড় সংসারকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং বৈষয়িক সাফল্যের শিখরে পদার্পণ করিয়াছে সেই পুরুষসিংহ যোগেশের কোনো পরিচয়ই আমরা নাটকে পাই না। যথার্থই ব্যাঙ্ক ফেল করিয়াছে কিনা, ব্যাঙ্ক আবার টাকা শোধ দিতে পারিবে কিনা এ সমস্ত সম্পর্কে কোনো খোঁজ খবরই সে নেয় নাই। তার ভৃত্য পীতাম্বর যতোটুকু পারিয়াছে চেষ্টা করিয়াছে যোগেশ তাহাও করে নাই। জ্ঞানদা, উমাসুন্দরী, যাদবের যে পরিণতি দেখানো হইয়াছে তাহাও অস্বাভাবিক। মেয়েদের যে শ্বশুরবাড়ী ছাড়াও বাপের বাড়ীর আত্মীয়স্বজন থাকে, বিপদে আপদে তারা খোঁজ খবর নেয়, নাটকে সেরূপ আত্মীয়স্বজনের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। ভজহরি বৃত্তান্তও নাটকে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করিতে পারে নাই। মোটকথা ট্র্যাজেডি নাটকের কার্যকারণ সূত্র প্রফুল্ল নাটকে রক্ষিত হয় নাই। পারিবারিক ট্র্যাজেডি রূপে কল্পনা করিলেও নাট্যকার হিন্দু মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারকে, মাতাল, চোর, শয়তানের জগতে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

যোগেশ চরিত্রটি নাটকের প্রাণ। এই চরিত্রটিতে ট্র্যাজিক উপাদান লক্ষিত হয়। যোগেশের একটা আদর্শ ছিল, সেই আদর্শচ্যুতির ফলেই তার দুর্দশা। যোগেশের সমস্ত ক্ষোভের মধ্য দিয়া তার সেই আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়াই অমানুষিক আচরণ সত্ত্বেও চরিত্রটি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো জ্বালাময়। যোগেশ যেমন করিয়া বাঁচিতে চাহিয়াছিল তেমন করিয়া বাঁচিতে পারে নাই বলিয়াই তার অভিমান তাকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিয়াছে। যোগেশ দলিল সই করিয়া দিয়াই রমেশকে বলিয়াছে, 'কি, কি, কি ভাবছ? কাজ গুছিয়েছ, আমি বুঝতে পেরেছি। যা খুশী কর, আমায় মদ দাও।' (১ম অঙ্ক/৪র্থ গর্ভাঙ্ক)। মদ্যপান নয় এই অভিমান কাতরতাই যোগেশ চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা এবং তার ট্র্যাজেডির মূল কারণ। এর ফলেই ব্যাঙ্কে যাবার পথে ব্যাপারীগণের তিরস্কার শুনিয়া সে মনের দুঃখ ভুলিবার জন্য মদ খাইয়া নাচিতে লাগিল। যোগেশ চরিত্রে উদ্যমশীলতা নাই, ফলে নায়কোচিত মহিমাও তার নাই। সম্পূর্ণ 'passive' দুঃখভোগী চরিত্র হিসাবেই যোগেশ চরিত্রের ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

॥ সিরাজদ্দৌলা ॥

গিরিশচন্দ্র অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে নানাদিক দিয়া 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি উল্লেখযোগ্য। এটি ঐতিহাসিক নাটকরূপে সমকালীন যুগপ্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'প্রতাপাদিত্য' নাটক রচনা করিয়া দেশপ্রেম প্রচারের যে ধারার সূত্রপাত করিয়াছিলেন তাহারই অনুসরণে

গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলা নাটকটি প্রণয়ন করেন। এজন্যই এ নাটকের সিরাজ বলিতে পারেন 'হে অমাত্যগণ, আমায় শত্রু বিবেচনা করবেন না। কিন্তু যদি সত্যই শত্রু হই, আমি আপনাদেরই শত্রু, বাঙ্‌লার নই। আপনাদের যদি বর্জন করা আমার অভিপ্রায় হয়, আপনাদের পরিবর্তে বঙ্গবাসীকেই রাজকার্য প্রদান করব। আপনাদের আত্মীয় বান্ধব, স্বদেশ-নিবাসী নির্বাচিত হবে, কোন বিদেশী রাজকার্য প্রাপ্ত হবে না। হিন্দুমুসলমানগণ এক স্বার্থে বাঙলায় আবদ্ধ, সে স্বার্থের বিঘ্ন হবে না। বঙ্গবাসীর পরিবর্তে বঙ্গবাসীই কার্যভার প্রাপ্ত হবে।' এবং 'বঙ্গের সন্তান হিন্দুমুসলমান,/ বাঙ্গালার সাধহ কল্যাণ,/ তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ/ নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর।' (১ম অঙ্ক/৫ম গর্ভাঙ্ক)। সিরাজ চরিত্রকে বাঙ্‌লার স্বাধীনতা রক্ষাকারী দেশপ্রেমিক নবাবরূপে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রেরণা নাট্যকার লাভ করেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থ হইতে। এইভাবে সিরাজদ্দৌলা নাটকে হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতি, ইংরেজ বিদ্বেষ, স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রভৃতি যুগোচিত বিষয়ের প্রক্ষেপ ঘটিয়াছে বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। কারণ যথার্থ ঐতিহাসিক নাটকে প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী কল্পনা থাকে না। সিরাজদ্দৌলা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এ সত্য আবিষ্কার সম্পূর্ণ ভাবে এ যুগের। সেকারণেই সিরাজদ্দৌলাকে ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক বলা চলে, পুরোপুরি ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না।

ইতিহাসের ভাবসত্যকে বিকৃত করিলেও ইতিহাসের বস্তুসত্যকে এ নাটকে প্রায় অবিকৃত রাখা হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা অভিযান, কলিকাতায় ইংরেজদের দমন, কাশিম বাজার কুঠিতে মীরজাফর প্রভৃতি অমাত্যদের সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ঘসেটি বেগমের সিরাজদ্দৌলার বিরোধিতা, সিরাজদ্দৌলার বদমেজাজ, পলাশীর যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতা, মোহনলালের বীরত্ব, সিরাজদ্দৌলার পলাশীর প্রান্তর হইতে পলায়ন, মহম্মদী বেগ কর্তৃক হত্যাসাধন প্রভৃতি অধিকাংশ ঘটনাই ইতিহাস অনুগ। সিরাজদ্দৌলার দেশপ্রেম ছাড়া বদমেজাজ, অমাত্যগণের অবমাননা, অস্থিরতা, ভীতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও ইতিহাসসম্মত। মীরজাফর, রাজবল্লভ, জগৎ শেঠ, মোহনলাল, মীরমদন, ঘসেটি বেগম, লুৎফান্নেসা, ক্লাইব, ওয়াটস, মুঁসা লা, প্রভৃতি প্রধান চরিত্রগুলিও ঐতিহাসিক। তাঁদের কার্যকলাপ ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যও ইতিহাসবিরোধী নয়। করিমচাচা এবং জহরা চরিত্র দুইটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। জহরা চরিত্রের অসম্ভব কার্যকলাপ যদি আরো কিছুটা সংযত করা যাইত তাহা হইলে ঐতিহাসিক নাটকে এরূপ কাল্পনিক চরিত্র সম্পূর্ণ মানাইয়া যাইত। করিমচাচা চরিত্রটির পরিকল্পনা সেদিক থেকে

ঐতিহাসিক নাটকের অনুপযোগী হয় নাই। নাটকের ভাবগাম্ভীর্য, পরিবেশরচনা, পরিণাম সমস্ত কিছুই ঐতিহাসিক নাটক উপযোগী। নাটকটির সংলাপ রচনাতেও নাট্যকার ঐতিহাসিক সিরিয়াসনেস বজায় রাখিয়াছেন। যদি নাট্যকার ঘটনার ঘনঘটা আরো কিছু পরিমাণে হ্রাস করিতে পারিতেন তাহা হইলে নাটক হিসাবে সিরাজদ্দৌলার শিল্প গৌরব বৃদ্ধি পাইত। ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি নাট্যকারের সমধিক নিষ্ঠা ছিল বলিয়াই গিরিশচন্দ্রের নাটকটি ইতিহাসগ্রন্থের নাট্যরূপায়ণ বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত কবিকল্পনা দ্বারা তিনি নাটকের ইতিহাসকে জীবন্ত করিতে পারেন নাই এই আফশোষ নাটক পাঠের পরে আমাদের থাকিয়াই যায়।

ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি হিসাবেও সিরাজদ্দৌলা উল্লেখযোগ্য। সিরাজ চরিত্রকে 'ট্র্যাজিক হিরো' করিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। সেইজন্যেই তাঁর চরিত্রে অন্তর্নিহিত দুর্বলতাও রহিয়াছে। বদ মেজাজই সিরাজ চরিত্রের পতনের মূল কারণ। সিরাজের এই স্বভাবের জন্যই সিরাজের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের আত্মীয়স্বজন ও বাহিরের শত্রুরা সকলেই ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাঁর বিরোধিতা করিতে অগ্রসর হয়। বিচার ভ্রান্তিও সিরাজ চরিত্রে রহিয়াছে। তিনি শত্রুর চক্রান্ত বুঝিতে পারিয়াও তাঁদের শঠতায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। করিমচাচা সিরাজ চরিত্রকে সমালোচনা করিয়া বলিয়াছে, 'নবাব মদ ছেড়ে খালি ভাবছেন এ করি কি ও করি।··· এই দু'নৌকোয় পা দিয়েই প্যাঁচে পড়েছে।' (৩য় অঙ্ক/২য় গর্ভাঙ্ক)। সিরাজ চরিত্রে উদ্যমশীলতার অভাবও নেই। প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। সিরাজ চরিত্রের পতনে ভয় এবং শোচনার সংযোগে উত্তম করুণরসও সৃষ্টি হইয়াছে।

গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শিষ্য অমৃতলাল বসু রঙ্গরস সৃজনের জন্য বাঙলা নাট্যসহিত্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন। তিনি সেকালে রসরাজ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রহসন রচনাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ, রক্ষণশীল হিন্দুসম্প্রদায়, স্ত্রীস্বাধীনতার আতিশয্য প্রভৃতি সমস্ত কিছুকেই তিনি ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত করিয়াছেন বলিয়া একপ্রকার সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামি তাঁর প্রহসনগুলির রসসৃষ্টিকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে এই সঙ্গে এ সত্যও স্বীকার করিতে হইবে যে ভাঁড়ামি ও অশ্লীলতার পঙ্ক হইতে তিনি প্রহসনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অমৃতলালের বিশুদ্ধ প্রহসন হইতেছে 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১২৮৩), 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' (১৮৮৬), 'কৃপণের ধন' (১৩০৭), ও 'বিবাহ বিভ্রাট' (১২৯১) প্রভৃতি। 'চোরের উপর বাটপাড়ি' ও 'কৃপণের ধন'-এর উপরে মলিয়েরের প্রহসনের প্রভাব অনুভূত হয়।

অমৃতলাল কতকগুলি নাটকও রচনা করেন। তার মধ্যে 'তরুবালা' (১২৯৭), 'বিমাতা বা বিজয়বসন্ত' (১৩০০), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৩০৬), 'আদর্শবন্ধু' (১৩০৭), 'খাসদখল' (১৯১২), 'নবযৌবন' (১৯১৪) এবং 'যাজ্ঞসেনী' (১৩৩৫) উল্লেখযোগ্য। হরিশ্চন্দ্র এবং যাজ্ঞসেনী পৌরাণিক নাটক। 'খাসদখল' অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ নাটক বলা যাইতে পারে। নাট্যকাহিনীটি আদ্যন্ত কৌতূহলদ্দীপক। চরিত্রচিত্রণেও নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মোক্ষদা চরিত্রটি সুপরিস্ফুট।

দ্বিজেন্দ্রলাল :

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আবির্ভাবে বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্য এক অভিনব শ্রী ও সমৃদ্ধি লাভ করিল। রচনার আঙ্গিক, ভাষা, ভাব প্রভৃতি সমস্ত দিক থেকেই লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিল। রঙ্গালয়ের রুচি দ্বারা প্রভাবিত না হইয়া তিনি সাহিত্যিক উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হইয়াই নাটক রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁর নাটকগুলিও প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

প্রহসন রচনা দিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যজীবন আরম্ভ করেন। তাঁর 'কল্কি অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২) এবং 'পুনর্জন্ম' (১৯১৯) প্রভৃতি প্রহসন তাঁহাকে প্রথম নাট্যকাররূপে স্বীকৃতি দিয়াছিল। এইগুলির ভিতরে তিনি যে হাসির গানগুলি সংযোজিত করিয়াছিলেন তাহাতেই প্রহসনগুলি জনসমাদর লাভ করিয়াছিল। বিষয়বস্তু কিংবা ঘটনাসংস্থাপন কোনো দিক থেকেই এগুলি উচ্চাঙ্গের হয় নাই। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ পরিবেশন করাই এগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি প্রাচীন এবং নবীন উভয় সম্প্রদায়ের দোষত্রুটিই তাঁর প্রহসনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। 'পুনর্জন্ম' প্রহসনটিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলা যাইতে পারে। এক কৃপণ, নির্মম ও স্বার্থপর সুদখোরের হাস্যকর পরিণতি প্রদর্শিত হইয়াছে। নির্দোষ কৌতুকরসে প্রহসনটি পরিপূর্ণ। প্রহসনটি ক্ষুদ্রাকৃতিও বটে।

দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি পৌরাণিক নাটকও রচনা করেন। তার মধ্যে 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮) ও' ভীষ্ম' (১৯১৪) উল্লেখযোগ্য। এগুলির বিষয়বস্তু পুরাণের হইলেও এগুলিকে বিশুদ্ধ পৌরাণিক নাটক বলা চলে না। তিনি ভক্তিরসপূর্ণ পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক রুচির উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অলৌকিকতাও আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়া মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। 'পাষাণী' নাটকে তিনি পুরাণকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া একটি লৌকিক জীবনের বাস্তবরসসমৃদ্ধ আলেখ্য রচনা করিয়াছেন। 'সীতা' নাটকটিতে সীতা চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। সীতা বনবাসের কথা জানিতে পারিয়া স্বামীর সত্য রক্ষা

করিবার জন্য স্বেচ্ছায় বনে গিয়াছেন। নিজের চরম দুঃখের দিনেও তিনি অতীত স্বামী সৌভাগ্য চিন্তায় বিভোর। সংলাপ রচনাতেও নাট্যকার দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকাবলীর মধ্যে 'সীতা' নাটকটি শ্রেষ্ঠ।

ঐতিহাসিক নাট্যরচনাতেই দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার স্ফূর্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'তারাবাই' (১৩১০), 'প্রতাপসিংহ' (১৩১২), 'দুর্গাদাস' (১৩১৩), 'নুরজাহান' (১৩১৪), 'মেবারপতন' (১৩১৫), 'সাজাহান' (১৩১৭), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৩১৮) ও 'সিংহলবিজয়' (১৩২২) দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক। ইতিহাসের নিষ্প্রাণ শরীর কল্পনার স্পর্শদ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকে। তিনি শেক্সপীয়রের অনুসরণে চরিত্রের ভিতরে গভীর দ্বন্দ্ব অনুপ্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। উচ্চভাব, প্রবৃত্তির সংঘাত, আবেগাত্মক সংলাপে তাঁর ঐতিহাসিক নাটক বাঙ্‌লা সাহিত্যের সম্পদস্বরূপ। সমকালীন দেশপ্রেমের আবেগকে তিনি অস্বীকার করেন নাই, তবে ইহাই তাঁর নাটকে প্রাধান্য পায় নাই। তাঁর 'নুরজাহান' নাটকে সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষাদান্ত পরিণতি তীব্র সংঘাতের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। 'সাজাহান' নাটকে বৃদ্ধ, অসহায় সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্ব সূক্ষ্মব্যঞ্জনাসহকারে পরিস্ফুট হইয়াছে। ঘটনার ঘনঘটা, বিভিন্ন ভাবতরঙ্গ, মানবশক্তির অসহায়তা সমস্ত কিছু অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন ভাবৈক্য লাভ করিয়াছে। এই নাটকের ঔরঙ্গজীব চরিত্রটিও নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কন শক্তির দক্ষতার পরিচয় বহন করে। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সাজাহান'ই দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ রচনা।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেণীতে আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত'। এই নাটকের চাণক্য চরিত্রটি বাঙ্‌লা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকীয় চরিত্র। তাঁর ব্যক্তিত্ব, প্রতাপ, অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই নাটকের ভাষাও সূক্ষ্ম কবিত্বমণ্ডিত। 'মেবারপতন' নাটকটিও সেকালে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তবে নাটকটি বিশেষ ভাবাদর্শের বাহন হওয়ায় তাহার ঐতিহাসিক অংশটা বেশ কিছুটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। তিনি অনেক নাটকে ইতিহাস বহির্ভূত ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন এবং সব সময় ইতিহাসকে যথাযথভাবে অনুসরণ করেন নাই। 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজীবের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া সাজাহান বলেন—'এরকম কখনও ভাবিনি। অভ্যস্তও নই'—। এই কথাটি সাজাহানের মুখে কি শোভা পায়! পিতার বিরুদ্ধে তাঁর নিজের বিদ্রোহের কথা কি সাজাহান বৃদ্ধ বয়সে ভুলিয়া গিয়াছেন? তবে সম্ভবত নাট্যকার সাজাহানের বাৎসল্য প্রেমের প্রগাঢ় রূপ দেখাইবার উদ্দেশ্যে পুত্রের বিরুদ্ধতা স্নেহশীল পিতাকে কতখানি আঘাত করিতে পারে তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল দেশপ্রেমে উদ্বোধিত হইয়াই ঐতিহাসিক নাটক রচনা শুরু করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনা অপেক্ষা চরিত্রের দ্বন্দ্ব পরিবেশই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। 'সাজাহান', 'নুরজাহান' প্রভৃতি তার সার্থক দৃষ্টান্ত। সাজাহান নাটকে আমরা মমতাজ-বিয়োগ ব্যথায় ক্লিষ্ট স্নেহান্ধ পিতা সাজাহানের সাক্ষাৎ পাই। সম্রাট সাজাহান এখানে পরাজিত। পিতা সাজাহান নিজের স্নেহের দুর্বলতার কাছে অসহায়। নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনা পরিবেশের মধ্যে সাজাহানের পিতৃহৃদয়ের দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন। ইতিহাসের মানুষগুলিকে তিনি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দান করিয়াছেন। সমগ্র নাটকটিতে সাজাহানের দুঃখদাহনের ট্র্যাজেডিই প্রবল। 'নুরজাহান' নাটকে শের আফগানের সঙ্গে নূরজাহানের বিবাহিত জীবন হইতে শুরু করিয়া নানা আঘাত সংঘাত দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া ভারতসম্রাজ্ঞী হওয়া—নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতার জন্য মনুষ্যত্বের, বিবেকের অপমৃত্যু ঘটাইয়া নৃশংসতার চরমে উঠিয়া একেবারে উন্মাদগ্রস্তা হওয়ার মধ্যেই নূরজাহানের ট্র্যাজেডি পরিণতি লাভ করিয়াছে। নারী জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য—তার চারিত্রিক সুকোমলতা এবং প্রেমনিষ্ঠা। নূরজাহানের মধ্যে তা অনুপস্থিত। তাহার নৃশংসতা শেষ পর্যন্ত তাহার একমাত্র কন্যাকেও বিদ্রোহিনী করিয়াছে। ক্ষমতালোভ নূরজাহানকে তাহার সহজ স্বাভাবিক স্তর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিল। সে স্বাভাবিক জ্ঞানটুকুও হারাইল। শেষ উন্মাদগ্রস্তা নূরজাহান—ক্ষমতা লোভী গর্বান্ধ নূরজাহানের ব্যর্থতার শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ। নূরজাহান চরিত্রটি শেক্সপীয়রের লেডি ম্যাকবেথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। খসরুর প্রাণনাশ, শারিয়ারের চক্ষু উৎপাটন এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে—সে মস্তিষ্ক-বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই পাইল না।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্য চরিত্রের বিশ্লেষণই নাট্যকারের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। কন্যাহারা নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ নির্মম চাণক্য কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া আবার নিজেকে ফিরিয়া পান। এখানে চন্দ্রগুপ্ত এমন কি পুরাণ-ইতিহাস আশ্রিত কাহিনীও চাণক্য চরিত্রের কাছে গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। সমালোচকের মতে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবতঃ সংবেদনশীল, জ্ঞানের দিক দিয়া সঞ্চয় তাঁহার পর্যাপ্ত এবং অনুভূতির সূক্ষ্ম গতিতরঙ্গ পর্যবেক্ষণে তাঁহার আনুবীক্ষণিক পারদর্শিতা। ঐ পারদর্শিতা আসিয়াছিল চিত্তের সংবেদনশীলতা হইতে এবং আংশিকভাবে শেক্সপীয়র প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক অনুশীলনের ফলে। '…দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সর্বাপেক্ষা অসামান্য বৈশিষ্ট্য—হৃদয়ভাবের ও ব্যক্তিত্বের দ্বান্দ্বিক গতির ভিতর দিয়া নানা ব্যক্তিত্বযুক্ত চরিত্রসৃষ্টি।' কিন্তু এই দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিতে গিয়া নাটকের গতিপ্রবাহের একবেণীত্ব সবসময় বজায় রাখিতে পারেন নাই।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ঃ

এই যুগের আর একজন খ্যাতনামা নাট্যকার হইতেছেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। তিনি রোমান্টিক, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি শ্রেণীর অসংখ্য নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁর নাট্যরচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রঙ্গালয়ের চাহিদা মিটানো। কল্পনা প্রাধান্যই তাঁর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ সমস্ত কিছুই তাঁর রোমান্টিক কবি মনের উচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। এগুলিকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—ঐতিহাসিক ও ছদ্ম ঐতিহাসিক। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে 'প্রতাপাদিত্য' (১৩১৩), 'পদ্মিনী' (১৩১৩), 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৩ ', 'অশোক' (১৩১৪), 'চাঁদবিবি' (১৩১৪), 'নন্দকুমার' (১৩১৪). 'বাঙ্গালার মসনদ' (১৩১৭) ও 'আলমগীর' (১৩২৮)। 'আলমগীর' নাটকটিতে ঔরঙজীবের শেষ জীবনের অসহায়তা মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে ইতিহাসের প্রতি আনুগত্য ইহাতে কম। ক্ষীরোদপ্রসাদের ছদ্ম ঐতিহাসিক নাটকাবলী হইতেছে 'রঘুবীর' (১৩১০), 'খাঁজাহান' (১৩১৯), 'আহেরিয়া' (১৩২০), 'বঙ্গে রাঠোর' (১৩২৪), প্রভৃতি। এগুলিতে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা বা ঐতিহাসিক চরিত্র নাই। কিংবদন্তী অথবা ঐতিহাসিক পটভূমিকাতে কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনারই প্রাধান্য। আবেগ-আতিশয্য ও চমকপ্রদ ঘটনা সংস্থানই এই শ্রেণীর নাটকের বিশেষত্ব।

ক্ষীরোদপ্রসাদ অনেকগুলি পৌরাণিক নাটকও রচনা করিয়াছেন। 'বভ্রুবাহন' (১৩০৬), 'সাবিত্রী' (১৩০৯), 'উলুপী' (১৩১৩), 'ভীষ্ম' (১৩২০), 'মন্দাকিনী' (১৩২৮) ও 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩), তাঁহার পৌরাণিক নাটক। ইহাদের মধ্যে নরনারায়ণ অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ। কর্ণ চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজিক চরিত্রের সূক্ষ্মতা প্রদর্শন করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। ভক্তিরসের সঙ্গে নাট্যিক সংঘাতের সমন্বয় সাধন করিয়া ইহাতে নাট্যকার উচ্চস্তরের কলা-কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। এই নাটকের সংলাপ রচনাও কবিত্বমণ্ডিত ও প্রশংসার যোগ্য।

চিত্তবিনোদনের দিকে মুখ্যত লক্ষ্য রাখিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ কয়েকখানা গীতি নাটকও রচনা করিয়াছিলেন। 'আলিবাবা' (১৮৯৭), 'বরুণা' (১৯০৮) ও 'কিন্নরী' (১৯১৮), ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'আলিবাবা' নাটকটি অভূতপূর্ব জনসমাদর লাভ করিয়াছিল। রোমান্স, কৌতুক ও রহস্যের একত্র সমাবেশে আলিবাবার আখ্যান অংশ জমজমাট।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রীতি যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—অন্য নাটকে তেমন প্রকাশ কমই আছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকের মাধ্যমে জীর্ণপ্রাণ নিষ্ক্রিয়

বাঙালীকে আত্মসচেতন ও দেশসচেতন করিয়া তোলার ঐকান্তিক প্রয়াস পাইয়াছেন। নাটকের জন্য ঐতিহাসিক আখ্যানবস্তু গ্রহণ করিয়াছেন আর তাঁর সম্মুখে ছিল পরাধীন দেশের চিত্রখানি। তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু গ্রহণ করিলেও অনেক সময় জাতির ও যুগের প্রয়োজন অনুসারে তিনি নিজে তার প্রয়োজনানুগ রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'আলমগীর' নাটকে আলমগীর ও রাজসিংহের মিলনের দৃশ্যটি অথবা ভীমসিংহের প্রতি আলমগীর ও উদিপুরীর অপত্যস্নেহ প্রভৃতির মধ্য দিয়া অসাম্প্রদায়িক মনোভাব যে স্বাধীনতা লাভের জন্য—জাতীয় ঐক্য বিধানের জন্য একান্ত প্রয়োজন—নাট্যকার তাহা উদার ও বলিষ্ঠভাবে দর্শকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উপরন্তু বাঙালীর জন্য বাংলার ইতিহাস হইতে প্রতাপাদিত্য চরিত্র গ্রহণ করিয়া জাতির প্রাচীন গৌরবকে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে ভবানন্দের বিশ্বাসঘাতকতা, অন্যদিকে প্রতাপের ধর্মদ্রোহিতা, পিতৃব্যহত্যা প্রতাপের সর্বনাশের কারণস্বরূপ নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রতাপের অন্যায়, ভবানন্দের বিশ্বাসঘাতকতা প্রতাপের ধ্বংসের প্রধান কারণ। শুধু ঐতিহাসিক কাহিনীই নয়, অনেক সময় ক্ষীরোদপ্রসাদ ইতিহাসের দুয়েকটি চরিত্র বা সামান্য কাহিনীর অংশ লইয়া বাকি কাহিনী নিজেই কল্পনার সূত্রে গাঁথিয়া নাটক রচনা করিয়াছেন। তাঁর 'আহেরিয়া' বা 'বঙ্গে রাঠোর' তার সার্থক দৃষ্টান্ত।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'কুমারী' নাটকখানি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সমাজে যে জাতিভেদ প্রথা আছে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজে ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি যে অবহেলা রহিয়াছে—তার কুফল সম্বন্ধে তিনি নির্ভীকভাবে 'কুমারী' নাট্যকাব্যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের মতে, "সমাজের শক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইলে সর্বাগ্রে অস্পৃশ্যতা-বাদাদি সর্বপ্রকার সামাজিক সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া সকলকে সমান অধিকার দিতে হইবে। ইহার ফলে অন্যান্য সামাজিক রোগ আপনা হইতেই বিদূরিত হইবে; কারণ গণশক্তি প্রবল হইলে কোনো অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার প্রশ্রয় পাইতে পারে না। ক্ষীরোদপ্রসাদ এই কথা বুঝাইয়াছিলেন তাঁহার 'কুমারী' নাটকে।" সে যুগের ঘোর কুসংস্কারের মধ্যে এই ধরনের প্রগতিশীল মতবাদ বিপ্লবাত্মকই বটে। মনে হয়, তান্ত্রিকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁর এই ধরনের মনোভাব দেখা দিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঃ

রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শে বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্য স্বতন্ত্র রূপ লাভ করিল।

বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের গতানুগতিক ধারায় রবীন্দ্রনাথ কম নাটকই রচনা করিয়াছেন। তাছাড়া কলিকাতার রঙ্গালয়ের মুখাপেক্ষী হইয়াও তিনি নাটক রচনা করেন নাই। এসব কারণে বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাটক একটি পৃথক অধ্যায় এরূপ বলিলেও ভুল বলা হয় না। তত্ত্বপ্রতিপাদনের স্পৃহা, সূক্ষ্ম কবিত্ব, পরিশীলিত সংলাপ, সহজ নাট্য-আঙ্গিক, এইগুলিই তাঁর নাটকের বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্য সাহিত্য যেমন তাঁর ব্যক্তিত্ব দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত তাঁর নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধেও একথা যথার্থ বলা চলে। সেজন্যই রবীন্দ্র নাটকের ধারা তাঁর পরবর্তীকালে অনুসৃত হইতে পারে নাই। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, রূপক-সাংকেতিক নাটক, নৃত্যনাট্য, সামাজিক নাটক ও প্রহসন, নাট্যসাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখাতেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিভার স্পর্শ রাখিয়াছেন।

'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) ও 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮), এই দুইটি গীতিনাট্যের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যায় যে এগুলি 'সুরে নাটিকা'। বাল্মীকি প্রতিভায় বাল্মীকির কবিত্ব লাভের বিষয় আখ্যাত হইয়াছে। ইহার উপরে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। নাটকটিতে দেশী বিদেশী সুর সংযোজনার দ্বারা সঙ্গীতের মায়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। নাটক হিসাবে ইহা মোটেই পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। কাহিনীর অপরিসর ক্ষেত্রে বাল্মীকি চরিত্রটিও বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। 'মায়ার খেলা' নাটকে প্রেমের মিলনবিরহ শিথিল কাহিনীর মাধ্যমে পরিবেশিত হইয়াছে। প্রেমের সংঘাত অপেক্ষা গীতিকাব্যিক ভাবমাধুর্যই এ নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে। কাজেই ঘটনা চরিত্র বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। মায়াকুমারীগণের গানে আছে—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না
শুধু সুখ চলে যায়,
এমনি মায়ার ছলনা! —গানে অভিব্যক্ত

এই তত্ত্বটিই নাটকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

কাব্যনাট্যের ধারাটিই রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ ধারা। 'রুদ্রচণ্ড' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯৩) ও 'মালিনী' (১৮৯৬)। এগুলি মূলতঃ শেকসপীয়রীয় নাট্যধারাতেই রচিত হইয়াছিল। এগুলিতেও তত্ত্ব প্রতিপাদনের প্রতি নাট্যকারের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। স্বার্থপরতায় আবদ্ধ প্রেম বিশ্বের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। এই সাধারণ সত্যটিই এই নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে নানাভাবে ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তত্ত্বের পাশাপাশি জীবনের বিচিত্র সুরের রাগরাগিণীও এইগুলিতে বাজিয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের

ট্র্যাজেডি নাটক রচনার প্রয়াসও এই পর্বেই সার্থকতা লাভ করে। এর পরে রবীন্দ্রনাথ, আর গতানুগতিক ট্র্যাজেডি রচনা করেন নাই। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম মৌলিক নাট্যকাব্য। এই নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, "এই আমার হাতের প্রথম নাটক যা গানের ছাঁচে ঢালা নয়। এই বইটি কাব্যে এবং নাট্যে মিলিত।" এই নাটকটিতেও তত্ত্বের প্রাধান্য তবে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যের বীজ ইহাতে প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া ইহার গুরুত্ব রহিয়াছে। 'রাজা ও রাণী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। দাম্পত্য প্রেমের সীমাবদ্ধতার সংঘাত লইয়া সুন্দর নাট্যবস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে। নাটকের পরিণতিতে ঘটনার ঘনঘটা অতিনাট্যিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে কারণে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটিকে সংশোধন করিয়া 'তপতী' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তবে সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে 'তপতী'কে 'রাজা ও রাণী' নাটক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা চলে না। এই নাটকের নায়ক বিক্রমদেবের দুর্বার প্রবৃত্তির তাড়না অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলেই সমস্ত নাটকটিতে ট্র্যাজেডির দুঃখদুর্বিপাক নামিয়া আসিয়াছে। নায়িকা সুমিত্রা চরিত্রটিও প্রথম দিকে ব্যক্তিত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত। নাটকটিতে প্রেমবৃত্তান্তের মধ্যে লিরিক প্রবাহের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক। পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডির রীতিতে ইহা লিখিত। তাঁর বিখ্যাত 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনেই ইহা রচিত। নাটকটিতে ঘটনার সংঘাত, ভাবের সংঘাত, হৃদয়ের সংঘাত এই তিন প্রকার দ্বন্দ্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাহিনীতে একমুখীনতাও লক্ষ্য করা যায়। অবান্তর বিষয় বা ঘটনা কিছুই নাটকে স্থান পায় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম এবং প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল।' এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্ব তীব্রভাবে নাটকে রূপলাভ করিয়াছে। তবে নাটকে তত্ত্বের ভারে মানবিক আবহাওয়াও যে একেবারে ক্ষুণ্ণ হয় নাই তা বলা যায় না। গোবিন্দমাণিক্য চরিত্র রক্তমাংসের মানুষ রূপে ফুটিতে পারে নাই। তুলনামূলকভাবে রঘুপতি, জয়সিংহ এই দুইটি চরিত্র প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে ট্র্যাজিক চরিত্ররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের সংলাপও ভাবপ্রবাহের উত্থান-পতনের সঙ্গে সুসমন্বিত হইয়া আবেগবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

মহাভারতে আখ্যাত মণিপুররাজ দুহিতা চিত্রাঙ্গদার কাহিনী লইয়া 'চিত্রাঙ্গদা' নাটক লিখিত হইয়াছে। নরনারীর প্রেমসম্বন্ধের কামগন্ধহীনতার ভাবটিই নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে। ফলে চিত্রাঙ্গদা একটি তত্ত্বের

বাহন হইয়া উঠিয়াছে। নারীত্বের চিরন্তন আদর্শের প্রতীক রূপেই চিত্রাঙ্গদা নাটকে ফুটিয়াছে। অর্জুনও শাশ্বত পুরুষের প্রতিনিধি। ঘটনা বা চরিত্রের দ্বন্দ্ব নাটকে নাই বলিলেই চলে। তবে সম্ভোগপ্রধান প্রেমের যে বিস্তৃত আলোচনা নাটকটিতে আছে তাহা রবীন্দ্র নাটকের অন্যত্র অনুভব করা যায় না। যৌবনের চঞ্চল নদীর আবেগের সৌরভে নাটকের পরিমণ্ডল স্পন্দিত হইয়াছে।

'মালিনী' নাটকটি বৌদ্ধযুগের পটভূমিকায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও ঐতিহাসিক পরিবেশ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রিয় একটি আদর্শই রূপায়িত হইয়াছে। 'বিসর্জনের' মতো এ নাটকেও প্রথা ও সংস্কারের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্ব সংঘাত প্রদর্শিত হইয়াছে। মালিনীকে কল্যাণময়ী প্রেমের, সুপ্রিয়কে হৃদয়ধর্মের এবং ক্ষেমঙ্করকে সংস্কারের প্রতিনিধিরূপে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত প্রথার স্থলে প্রেমকেই নাটকে জয়ী করা হইয়াছে। নাটকটির গঠনশৈলী কিছু স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, "মালিনীর নাট্যরূপ সংযত, সংহত এবং দেশকালের ধারায় অবিচ্ছিন্ন।" গ্রীক ট্র্যাজেডি নাটকের সংক্ষিপ্ত ও সংহত নাট্যরূপেই মালিনী গঠিত হইয়াছে। চরিত্র-চিত্রণেও নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মালিনী, ক্ষেমঙ্কর, সুপ্রিয় তিনটি চরিত্রই ভাব-প্রাধান্য সত্ত্বেও সু-অঙ্কিত হইয়াছে। নাটকের পদ্যসংলাপও পরিমিত ও ভাবের যথাযথ প্রকাশে সমর্থ হইয়াছে। 'বিদায়-অভিশাপ', 'গান্ধারীর আবেদন,' 'কর্ণকুন্তীসংবাদ' প্রভৃতিকে রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কথোপকথনের মাধ্যমে কাহিনী পরিবেশিত হইয়াছে এবং নাট্যকার মোটামুটিভাবে নেপথ্যে থাকিয়াছেন বলিয়া ইহাদের মধ্যে বহিরঙ্গগতভাবে নাটকের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তরঙ্গভাবে, এগুলির মধ্যে নাটকোচিত মানসিক দ্বন্দ্ব এবং আদর্শের বিরোধও লক্ষিত হয়। আবেগ উচ্ছ্বাসের স্বল্পতা, রচনার পরিমিতি ও সহজ উপসংহার এই নাট্যকাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য। পৌরাণিক পরিমণ্ডলে এগুলির কাহিনী গ্রথিত হইলেও বাঙলা পৌরাণিক নাটকের ভক্তিরস পরিবেশন করা নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল না। বরং কিছু নাটকের সমকালীন সমস্যারই তির্যক প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। 'কর্ণকুন্তী-সংবাদই' এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের পরিবর্তে কর্ণ ও কুন্তী চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বই এখানে প্রাবল্য লাভ করিয়াছে। কুন্তীর একটি সংবাদকে কেন্দ্র করিয়া যেভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল মানসিকতাকে এখানে বর্ণিত করা হইয়াছে তাহা নাট্যকারের রসসৃষ্টির প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করে। মহাভারতের কর্ণচরিত্রকেই রবীন্দ্রনাথ এখানে আরও মহীয়ান করিয়া আঁকিয়াছেন। তাঁর প্রলোভন, তাঁর দুর্বলতা, অভিমান পরিশেষে দুর্বলতা জয় প্রভৃতি ভাবতরঙ্গে চরিত্রটি প্রাণবন্ত রূপ লাভ করিয়াছে। তাঁর উক্তি—

"জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।"

আমাদের অন্তর স্পর্শ না করিয়া পারে না।

'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬) এই নাটকগুলিকে রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রাচীন রূপক নাটকের গতানুগতিক ধারাতে এগুলি রচিত হয় নাই। তত্ত্বরূপাঙ্কনই এগুলির মূল লক্ষ্য বলিয়া অনেকে এগুলিকে তত্ত্ব নাটক নামেও অভিহিত করিয়াছেন। সমাজনীতি, অরূপচেতনা, যৌবনের জয়গান, প্রভৃতি ভাব এই সব নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্য দিয়া উদ্ঘাটিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কবিত্বশক্তি ও অরূপচেতনার প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করে এই নাট্যধারা। ঘটনা বা চরিত্রের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা আদর্শ বা ভাবগত সংঘাতের উপরেই নাটকগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রসঙ্গত রূপক ও সংকেত সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে। সমালোচকের মতে, 'যুগে যুগে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়, তার জীবন জিজ্ঞাসারও রূপান্তর ঘটে। শেক্‌সপীয়রের যুগের জীবন জিজ্ঞাসা ও সমস্যা বর্তমান কালের নাট্যকারের কাছে অনেক সময় গৌণ বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। সেদিনের কথাকে এই দিনে মনে হবে, 'With little meaning though the words are strong'। পরের দিকে বাইরের দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোলাহল যে পরিমাণে কমে এল, সেই পরিমাণে আন্তর নীরবতা অপূর্ব রহস্যমধুর রূপ ধারণ করে নতুন অর্থগৌরবে প্রকাশ পেতে থাকল। আগে যাকে সামান্য বলে মনে করা হতো, পরের দিকে তারই মধ্যে মানুষ অনন্ত রহস্যের মাধুর্য খুঁজে পেল। এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও রহস্য সংকেত প্রথম ধরা দিল কবিতা ও গানে—পরে তার প্রকাশ দেখতে পাই নাটকে। পাশ্চাত্যে মেটারলিংক, ইবসেন প্রভৃতি এই ধরনের নাটক রচনা করিয়াছেন। এই ধরনের নাটককে Symbolical Drama বা সংকেত-প্রধান নাটক বলা হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই রূপক ও সাংকেতিক নাটকের প্রথম ও সার্থক প্রবর্তক। রূপক নাটক সংকেত-প্রধান নাট্যধারারই অংশ বিশেষ। পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী ভাগ করিতে গেলে রূপককে Allegorical এবং সংকেত-প্রধানকে Symbolical বলা যায়। তবে রূপকেও সাংকেতিকতা থাকিবে। এই দুই-এর পার্থক্য দেখাইতে গিয়া সমালোচক বলেন 'রূপকের কাজ বোঝানো আর সংকেতের কাজ বাজানো'। তিনি আরও বলেন—'রূপক সংকেত প্রভৃতি বললেই একটা ধোঁয়াটে আবরণের কথা মনে হয় যার অন্তরালে থেকে যায় নিহিতার্থটি। এই আবরণ এমন একটা অস্পষ্টতার সৃষ্টি করে যে কাছের জিনিস দেখাও দুর্লভ হয়ে ওঠে। আবার অনেক সময় মেঘান্তরিত

সূর্যের মতোও তা ভাস্বর। যখন জ্ঞান ও বুদ্ধির অপ্রত্যক্ষ অথচ Intuition-গ্রাহ্য কোনো abstract idea-কে ভাষায় ও বর্ণে মূর্ত করে তোলা হয় তখনই রূপক, সংকেত প্রভৃতির সৃষ্টি করে।' সংকেত—অনুভূতিদ্যোতক (emotional) ও ভাবদ্যোতক (intellectual)—উভয় প্রকারই হইতে পারে। রবীন্দ্র নাটকে এই দুই ধরনের সংকেত বর্তমান। রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্গুনী, মুক্ত-ধারা, রক্ত করবী, কালের যাত্রা, তাসের দেশ প্রভৃতিকে সাংকেতিক নাটকের পর্যায়ে ফেলা হয়। ইহাদের মধ্যে রাজা, ডাকঘর প্রভৃতিকে রূপক প্রধান বলা যায়। অনেকে রবীন্দ্র নাটক আলোচনার সময় রূপক, সংকেত প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগের পরিবর্তে উল্লিখিত নাটকগুলিকে 'রূপক-সাংকেতিক নাটক'ও বলিয়াছেন।

প্রকৃতির ঋতুচক্রে যেমন, তেমনি মানুষের অন্তরেও সর্বদা পরিবর্তনের পালা চলিতেছে। দুঃখদুর্বিপাককে এড়াইয়া নহে, তাহাকে মুক্ত প্রাণে স্বীকার করিয়া নিলেই মুক্তি পাওয়া যায়। এই ভাবাদর্শের উপরে ভিত্তি করিয়া 'শারদোৎসব' নাটকটি রচিত হইয়াছে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকের একটি সাধারণ চরিত্র ঠাকুরদাদা চরিত্রকে প্রথম পাই।

'রাজা' নাটকের কাহিনী গ্রহণ করা হইয়াছে বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী হইতে। অরূপকে রূপের মধ্যেও খুঁজিতে হইবে আবার শুধু রূপ লালসার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও তাঁহাকে পূর্ণরূপে পাওয়া যাইবে না। রূপাতীতের মধ্যেও তিনি বিস্তারিত। নাটকের রাণী সুদর্শনা—তাঁহাকে সৌন্দর্যের মধ্যে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া রাজা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেন নাই। অবশেষে দুঃখের আঘাতে অহঙ্কার ও অভিমানের অবসান হইলে তিনি রাজার পরিপূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। এই তত্ত্বটিই রাজা নাটকে পরিস্ফুট হইয়াছে। জাতক কাহিনীকে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন। এই নাটকে সুদর্শনার মানস দ্বন্দ্বের রূপটি গতিবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তবে অবান্তর ঘটনার সমাবেশের ফলে রূপক নাটকের নিবিড়তা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত তত্ত্ব আরোপণ এই নাটকের অন্যতম প্রধান দোষ।

'অচলায়তন' নাটকে অর্থহীন সংস্কার ও প্রথানুগত্যের সীমাবদ্ধতার সমালোচনা করা হইয়াছে। অচলায়তন নামক একটি আবাসিক শিক্ষাভবনে অনুষ্ঠিত প্রাচীন সনাতন ধর্মীয় আচার সমূহের নিষ্প্রাণ জগত পঞ্চকের প্রাণস্পর্শে কিভাবে ধ্বংস হইয়া গেল, তাহারই বিবরণ নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানেও রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধকাহিনীকে মনোমত ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। মহাযান বৌদ্ধমতের পরিবেশ রচনা বাস্তব এবং রসোজ্জ্বল। নাটকের প্রথমে পঞ্চক চরিত্রটি আকর্ষণীয় হইলেও শেষ পর্যন্ত চরিত্রটি সজীব থাকিতে পারে নাই।

বরং তার দাদা মহাপঞ্চক চরিত্রটির মধ্যে পৌরুষত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

'ডাকঘর' নাটকটিই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ রূপক নাটক। এই নাটকের অমল চরিত্রের মাধ্যমে মানবত্মার সুদূরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মানবাত্মা মর্ত্যজীবনের রূপরসগন্ধস্পর্শে আকুল হইলেও মর্ত্যজীবন থেকে পরিত্রাণের মধ্যেই তাহার সার্থকতা। নাটকের পরিশেষে অমলের মহানিদ্রা এই সত্যের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছে। বিদেশী সমালোচকের মতে, 'Amal personifies man's longing for free and natural development'. বন্ধন মুক্তির আনন্দই ডাকঘরের প্রধান বক্তব্য। অমলের সুদূর-প্রীতি মাধব দত্ত, ঠাকুরদা, মোড়ল, সুধা এবং দইওয়ালা প্রভৃতির সংস্পর্শে আসিয়া যেরূপ রসোজ্জ্বল রূপলাভ করিয়াছে বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। এইসব চরিত্রের দ্বন্দ্বে নাটকখানি নাট্যরসেও পরিপূর্ণ হইয়াছে। নাটকের পরিণতিতে একপ্রকার চাপা বিষাদভাব আমাদের আকুল করিয়া তোলে। ক্ষুদ্র কিন্তু সংহত অবয়ব নাটকের রসসৃষ্টির অনুকূল।

'ফাল্গুনী' নাটকে স্থবিরের শাসননাশী বিদ্রোহী যৌবনের জয়গান করা হইয়াছে। বসন্ত এখানে নবীন প্রাণের প্রতীক। বসন্তের প্রথম শিহরণ অনুভব করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দচঞ্চল একদল তরুণ পথে বাহির হইয়া আসিল। এই তরুণ দলসর্দার, দাদা সকলকে একত্র করিয়া বসন্তোৎসবে মত্ত হইয়া উঠিল। নাটকটিতে প্রকৃতির আনন্দ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাকে অনেকে ঋতুনাট্যেরও অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন।

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬) নাটকটিকেও অনেকে রূপক নাটকের অন্তর্গত মনে করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গের বীর প্রতাপ-আদিত্যকে লইয়া লিখিত হইলেও ইহাকে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না। প্রতাপ-আদিত্য এবং তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার ইতিহাসকে খুব বেশী মর্যাদা দেন নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রতাপ-আদিত্যকে প্রাণহীন অত্যাচার এবং উদয়াদিত্য ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রভৃতিকে হৃদয় ধর্মের প্রতিনিধিরূপেই চিত্রিত করা হইয়াছে। উদয়াদিত্য, বিভা, ধনঞ্জয় সকলেই পরিশেষে পথে নামিয়া আসিয়া রাজশক্তির প্রায়শ্চিত্ত মানসে মুক্তিপথে যাত্রা করিয়াছে এই ব্যঞ্জনার মাধ্যমেই নাটকের যবনিকাপাত হইয়াছে।

'মুক্তধারা' (১৩২৯), 'রক্তকবরী' (১৩৩১), 'কালের যাত্রা' (১৩৩৯) এই নাটকগুলিকে রবীন্দ্রনাথের অবিমিশ্র সাংকেতিক নাটক বলা যায়। এই সকল নাটকেও রূপক আছে বটে তবে রূপকের অভেদত্ব ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নাট্যকার ইচ্ছা করিয়াই সংকেতের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। তাহা ছাড়া এই সকল নাটকে সমকালীন সমস্যারও বাস্তব

প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা জীবনের সমস্যাকে আলোকপাত করাই এই সকল নাটকে লেখকের মূল প্রতিপাদ্য।

'মুক্তধারা' নাটকে যন্ত্রসভ্যতার আতিশয্যের সমালোচনা করা হইয়াছে। যন্ত্রের নাগপাশ হইতে মানবসভ্যতাকে মুক্ত করিতে হইলে প্রয়োজন কঠোর সংগ্রামের এবং প্রাণোৎসর্গের। সমালোচকের মতে, 'রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রকে কখনও অস্বীকার করেননি বা অশ্রদ্ধাও জানাননি, কিন্তু মানুষের প্রাণের উপর তার উদ্ধত প্রতিষ্ঠাকে তিনি কখনও স্বীকার করেন না।' রবীন্দ্রনাথ জানেন, 'প্রাণ দিয়েই তবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়।' যুবরাজ অভিজিৎ প্রাণদানের মধ্য দিয়াই যন্ত্রের আধিপত্যের অবসান সূচনা করিলেন। যন্ত্র ও জীবনের সংঘাত লইয়াই মুক্তধারার নাট্যবস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে তত্ত্ব থাকিলেও তত্ত্ব-প্রাধান্য নাই। যন্ত্ররাজ বিভূতি ও উত্তরকূটের প্রজাসাধারণের সঙ্গে ধনঞ্জয়, অভিজিৎ ও শিবতরাইয়ের প্রজাদের সংঘর্ষ গতিবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। অভ্রভেদী লৌহ যন্ত্রের মাথা ও ভৈরব মন্দির চূড়ার ত্রিশূলের প্রতীক সূক্ষ্ম ভাব-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করিয়াছে। মুক্তধারার জলকল্লোল, অম্বরের 'সুমন সুমন' বলিয়া বুকফাটা আর্তনাদ, ভৈরবপন্থীদের উদাত্ত গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি দর্শক-পাঠকচিত্তে নানা ভাব-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। রাজা রণজিৎ, যুবরাজ অভিজিৎ, যন্ত্ররাজ বিভূতি প্রভৃতি চরিত্রগুলিও সুপরিকল্পিত। ভাবে, ভাষায়, পরিবেশ রচনা কৌশলে, ঘটনাবিন্যাসে 'মুক্তধারা' রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট নাটক।

'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ নাটক। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার শোষণের বিস্তৃত চিত্র এবং সেই শোষণের অবসানের বিষয় লইয়া নাটকের আখ্যানবস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রধান চরিত্র রাজা সবসময়েই নেপথ্যে থাকেন। শেষে তিনিও মুক্তির সন্ধানে পথে বাহির হইয়া আসিলেন। রাজা চরিত্রটির মাধ্যমেই বুর্জোয়া শ্রেণীর দমন-পীড়ন ও অসহায়তার বৈশিষ্ট্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে। তবে রাজা অপেক্ষাও নাটকটির প্রধান সৌন্দর্য নির্ভর করিতেছে নন্দিনী চরিত্রের উপরে। নন্দিনী গ্রামের মেয়ে। তার প্রেমিক রঞ্জনের সন্ধানে সে যক্ষপুরীতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। তার আবির্ভাবে যক্ষপুরীতে ওলোটপালট শুরু হইয়াছে। পরিশেষে রাজাও তার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া নিজেই নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। নন্দিনীর আভরণ রক্তকরবীর মঞ্জরী। এই রক্তকরবীই শ্রমিকশ্রেণীর বেদনারক্তিম জীবনপ্রীতিরই প্রতীক। প্রতীকের ব্যঞ্জনা, সংলাপের তীক্ষ্ণতা, গীতিরসের ঔজ্জ্বল্য ও পরস্পরবিরোধী জীবনযাত্রার সংঘাত সমস্ত কিছু মিলিয়া রক্তকরবী বাঙ্‌লা তথা বিশ্ব সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নাটকে পরিণত হইয়াছে। এই নাটকে দানবীয় শক্তির উপর মানবীয় প্রেমের জয় ঘোষণা করা হইয়াছে। যে যক্ষপুরী হইতে প্রেম ও সৌন্দর্য নির্বাসিত—সেখানে প্রেমের তথা প্রাণের দুর্নিবার বেগ আসিয়া 'লুব্ধ

দুশ্চেষ্টার বন্ধন জালকে' আঘাতের পর আঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। কৃত্রিমতার নাগপাশ হইতে মানুষ মহান মৃত্যুর মধ্যে মুক্তি লাভ করে।

'কালের যাত্রা' বইখানার প্রথম নাট্যরূপ 'রথের রশি'তে দেখানো হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠী, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মন্ত্রবল, স্ত্রীলোকদিগের পূজা, সৈনিকদের বাহুবল এবং রাজার টানে যে রথ চলিল না তাহা শেষ পর্যন্ত শূদ্রের স্পর্শমাত্র সচল হইয়া উঠিল। নাটকটি ক্ষুদ্র এবং তত্ত্বনির্ভর। ইহাতে নাট্যলক্ষণ তেমন পরিস্ফুট হইতে পারে নাই।

'তাসের দেশ' (১৯৩৩), 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' (১৯৩৬), 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' (১৯৩৭), 'শ্যামা' (১৯৩৯) এইগুলি রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ নৃত্যনাট্য। এগুলির বিষয়বস্তু তাঁর পূর্বতন রচনা হইতে আহৃত। নৃত্যকলা, অভিনয় ও সঙ্গীতের সমন্বয়ে এই নাটকগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য নৃত্যনাট্যের সঙ্গে এইগুলির প্রধান পার্থক্য হইতেছে যে পাশ্চাত্ত্য ব্যালেতে কণ্ঠসংগীতের কোনো ভূমিকা নাই। আমাদের মনে হয়, ভারতের মর্মস্থলেই তার প্রকাশ-প্রেরণা নিহিত। কিন্তু রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের নৃত্য কণ্ঠসংগীতের উপরেই নির্ভরশীল। এই ধরনের নাটকে গান আছে, নৃত্য আছে—সেই সঙ্গে সার্থক নাট্যরসও আছে। এইসব নৃত্যনাট্যের পরিণতি যেন —'ends with a note of calm.'

গতানুগতিক ধারায় রবীন্দ্রনাথ সামাজিক নাটক রচনা করেন নাই। সাধারণতঃ 'শোধবোধ' (১৩৩৩), 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫) ও 'বাঁশরী' (১৩৪০) এই তিনটি নাটককে সামাজিক নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গল্পগুচ্ছের 'কর্মফল' গল্পটির বিষয়বস্তু নিয়া 'শোধবোধ' নাটক রচনা করা হইয়াছে এবং 'শেষের রাত্রি'র বিষয়বস্তু লইয়া লিখিত হইয়াছে 'গৃহপ্রবেশ'। ইহাদের নাট্যিক বৈশিষ্ট্য তেমন পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। 'বাঁশরী' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের শেষ নাটকও বটে তাছাড়া ইহাতে কতকগুলি অনন্যসাধারণ লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায় যাহা রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে বিরলদৃষ্ট। বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতায় সমগ্র নাটকটি শাণিত আকার লাভ করিয়াছে। এখানে ঘটনার ঘনঘটা নাই। অন্তর্দ্বন্দ্ব দ্বারাই এখানে নাট্যিক সংঘাত গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। নাট্যকার তাহাতে সার্থকতাও লাভ করিয়াছেন। প্রেমের কামনা ও আত্মত্যাগই নাটকের বিষয়বস্তু। বাঁশরী চরিত্রটি তার বাস্তবপ্রেমের অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তার অভিমানের তলায় রহিয়াছে গভীর অন্তর্জ্বালা। এই চরিত্রটিই নাটকের প্রাণ।

প্রহসন নাটক রচনাতেও রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। 'শেষরক্ষা' (১২৯৮), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭), 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯০৮) প্রভৃতি প্রহসন তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁর প্রহসন বিশুদ্ধ হাস্যকৌতুক ও পরিচ্ছন্ন রুচিতে পরিপূর্ণ। ঘটনার জটিলতা

ও পরিস্থিতি সংঘটনের চমৎকারিত্বের উপর নির্ভর না করিয়া বাগবৈদগ্ধ্য এবং অন্তর্লীন রসের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রতিই রবীন্দ্রনাথের সমধিক প্রযত্ন ছিল। ফলে তাঁর প্রহসনগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। তবে সহৃদয় রসিকের চিত্তে এদের আবেদন অনস্বীকার্য। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ক্ষুদ্রাকৃতি প্রহসন। বৈকুণ্ঠের খাতা বৈকুণ্ঠের কাছে খুবই প্রিয় কিন্তু তার এই দুর্বলতাই অপরের হাস্যরসের উদ্রেক করিয়াছে। কিন্তু নাট্যকার বৈকুণ্ঠ চরিত্রটিকে সহানুভূতি দিয়া গড়িয়াছেন। শেষ পর্যন্ত বৈকুণ্ঠকে সকলের অবজ্ঞাত দেখিয়া তাহার প্রতি সমবেদনায় আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। একপ্রকার সূক্ষ্ম করুণ রসেই প্রহসনটির কৌতুকরস পরিসমাপ্ত হইয়াছে। 'চিরকুমার সভা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ প্রহসন। চিরকুমার সভার কৌমার্যব্রত এবং তাহার অবসান, নাটকটির বিষয়বস্তু। বৈরাগ্য এবং সন্ন্যাসধর্মকে ব্যঙ্গ করা হইলেও ব্যঙ্গরস নয়, 'উইট্' বা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যই প্রহসনটির প্রাণ। কাহিনী, চরিত্রসৃষ্টিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্তু সরস, অর্থপূর্ণ, পরিশীলিত সংলাপের বাণীভঙ্গি আমাদের চোখ ধাঁধাইয়া দেয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের যে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই।

রবীন্দ্রত্তোর বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যকে আমরা আধুনিক পর্বের অন্তর্ভূক্ত করিতে পারি। এই যুগের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে বৈচিত্র্য। বিচিত্র বিষয়, বিচিত্র আঙ্গিক, বিচিত্র রীতিতে বর্তমানে অসংখ্য নাটক রচিত হইতেছে। একাঙ্ক নাটক, অনুবাদ বা বিদেশী ভাব অবলম্বনে নাটক, রহস্য নাটক প্রভৃতি নূতন নূতন নাট্যশাখা গড়িয়া উঠিতেছে। ইউরোপের সাম্প্রতিক নাট্যসাহিত্যের সহিত সংযুক্ত থাকিবার চেষ্টা করিয়া আধুনিক নাট্যসাহিত্য সঞ্জীবনী রস আহরণ করিবার প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল বা রবীন্দ্রনাথের মত একক প্রতিভা না থাকিলেও ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, রোমান্টিক প্রভৃতি নানাবিষয়ে অসংখ্য নাট্যকার নাটক রচনা করিয়া বাঙ্‌লাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছেন। এই সকল নাট্যকারদের মধ্যে নিশিকান্ত বসুরায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, বনফুল প্রভৃতিদের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁদেরও পরবর্তীকালে আর একদল নাট্যকারও আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহাদের ভিতরে বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সলিল সেন, কিরণ মৈত্র, ধনঞ্জয় বৈরাগী, উৎপল দত্ত প্রভৃতিদের নাম করা যাইতে পারে।

নিশিকান্ত বসুরায়ের 'দেবলা দেবী' (১৩২৫) ও 'বঙ্গে বর্গী' (১৩২৯) এই দুইখানি ঐতিহাসিক নাটক সেকালে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। 'বঙ্গে বর্গী' নাটকে মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতের বঙ্গ আক্রমণের আলেখ্য রচনা করা

হইয়াছে। ভাস্কর পণ্ডিতের চরিত্রের দ্বন্দ্ব আবেগমথিতভাবে নাটকে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী' (১৯২৮) ও 'সীতা' (১৩৩১) নাটক দুইটিও সেকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 'দিগ্বিজয়ী'তে নাদির শাহের বিচিত্রজীবনের ভাবতরঙ্গকে নাটকীয় সংঘাতে মুখর করিয়া তোলা হইয়াছে। 'সীতা' পৌরাণিক নাটক। রামচন্দ্র চরিত্রের হৃদয় দ্বন্দ্ব ইহাতে সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'রাখীবন্ধন' (১৩২৭), 'অযোধ্যার বেগম' (১৩২৮) ও 'ইরাণের রাণী' (১৩৩০) এই তিনখান ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি কয়েকটি সামাজিক ও পৌরাণিক নাটকও লিখিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় অপরেশ-চন্দ্র তেমন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। বরং পৌরাণিক নাটক রচনায় তিনি কিছু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সর্বাধিক খ্যাত নাটক 'কর্ণার্জুন' (১৯২৩)। নিয়তির চক্রান্তে কর্ণের জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল তাহারই করুণ আলেখ্য এই নাটকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' (১৯৩০) এবং 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯৩৮) এই দুইটি ঐতিহাসিক নাটক যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। শিবাজীর জীবনকাহিনী লইয়া গৈরিক পতাকা রচিত হইয়াছে। সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজের ট্র্যাজিডিকে রোমান্টিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হইয়াছে। সেজন্য এই নাটকে সিরাজের দুঃখময় আবেদনশীল রূপটিই অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। 'স্বামী-স্ত্রী' (১৯৩৮), 'তটিনীর বিচার' (১৯৩৯), 'মাটির মায়া' (১৯৪৩) প্রভৃতি কয়েকখানি সামাজিক নাটকও শচীন্দ্রনাথ রচনা করিয়াছিলেন। মন্মথ রায়ের 'অশোক' (১৯৩৩) ও 'মীরকাশিম' (১৯৩৮) এই দুইটি ঐতিহাসিক নাটক প্রসিদ্ধ। 'অশোক' নাটকে ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনা ও নাট্যিক কৌতূহল সৃষ্টিতে নাট্যকার উচ্চাঙ্গ কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁর 'চাঁদসদাগর' (১৯২৭), 'দেবাসুর' (১৯২৮), 'কারাগার' (১৯৩০) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকগুলিও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কংসের অত্যাচারের কাহিনীর উপরে পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ শক্তির উৎপীড়নের রূপক আরোপ করিবার ফলে 'কারাগার' নাটকটি সেকালে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। এই নাটকে কংসচরিত্রের পরিকল্পনায় নাট্যকার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মহেন্দ্র গুপ্ত অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির ভিতরে 'পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিতসিংহ' (১৯৪০), 'রাণী ভবানী' (১৯৪২), 'রাণী দুর্গাবতী' (১৯৪৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার নাটকে ঐতিহাসিকতাই প্রধান—চরিত্রের দ্বন্দ্ব বা ভাবের সূক্ষ্ম তাৎপর্য সেখানে তেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আধুনিক সামাজিক নাটকে বাস্তব সমস্যার বিশ্লেষণে বিধায়ক ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব অবিসংবাদিত। তাঁর 'মাটির ঘর' (১৯৩৯), 'বিশ বছর আগে' (১৯৪৬), 'ঝান্সীর রাণী' (১৯৫৪), 'ক্ষুধা' (১৯৫৭) প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য।

বনফুল 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯) ও 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪৫), এই দুইটি চরিত-নাটক লিখিয়া বাংলা সাহিত্যে একটি নূতন নাট্যধারার সূত্রপাত করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদন নাটকে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনের ট্যাজেডি মর্মস্পর্শীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নাটকটির সংলাপ প্রয়োগেও নাট্যকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 'বিদ্যাসাগর' নাটকে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকে কেন্দ্র করিয়া বিদ্যাসাগরের চরিত্রকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। তবে 'শ্রীমধুসূদনে'র মতো 'বিদ্যাসাগর' নাটক ততোটা সরসতা অর্জন করিতে পারে নাই।

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪), নাটকটিকে কেন্দ্র করিয়া নবনাট্য আন্দোলন গড়িয়া ওঠে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় একটি কৃষক পরিবার কিভাবে বিপর্যস্ত হইল তারই করুণ কিন্তু বাস্তব কাহিনী নাটকটিতে পরিবেশিত হইয়াছে। গণজীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে, বাঙ্‌লা নাট্য সাহিত্যে 'নীলদর্পনে'র পরেই 'নবান্ন'র স্থান। 'নবান্ন'র পর 'কলঙ্ক' (১৯৪৬), 'মরাচাঁদ' (১৯৪৬), 'গোত্রান্তর' (১৯৬০) প্রভৃতি নাটকেও বিজন ভট্টাচার্য সমকালীন সমস্যার বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' (১৩৫৮), 'ছেঁড়া তার' (১৩৫৯) এবং 'দুঃখীর ইমান' (১৩৪৪) প্রভৃতি নাটকে নব্যনাট্য আন্দোলনেরই বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁর নাটকাবলীতে সমাজের উপেক্ষিত ও অত্যাচারিত জনসাধারণের জীবনকাহিনীই রসরূপ লাভ করিয়াছে। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তরাল' (১৯৪৫), 'তরঙ্গ' (১৯৪৬), 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭), 'মোকাবিলা' (১৯৪৯), 'মশাল' (১৯৫৪) প্রভৃতি নাটকে যুদ্ধোত্তর বাঙ্‌লাদেশের সমাজজীবন অনাবৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। পরিবেশ রচনা, বাস্তব সংলাপপ্রয়োগ, ঘটনার গতিশীলতা, জীবনানুভবের আবেগ প্রভৃতির সমন্বয়ে তাঁর নাটক উদ্দেশ্যমূলকতার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া প্রকৃত নাট্যরূপ গ্রহণ করিয়াছে। সলিল সেনের নাটক আধুনিককালে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তাঁর 'নূতন ইহুদী' (১৯৫৩), 'ডাউন ট্রেন (১৯৫৯), 'দর্পণ' (১৯৬০) প্রভৃতি বাঙালী জীবনের বহুবিচিত্র উপাদানকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের সমস্যা সহানুভূতির সঙ্গে রূপদান করিয়া আধুনিক কালে কিরণ মৈত্র সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তাঁর 'বারো ঘণ্টা' (১৯৫৮), 'নাটক নয়' (১৯৫৮), 'তৃষ্ণা' (১৩৭১) প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য। মঞ্চসফল নাটক লিখিয়া ধনঞ্জয় বৈরাগী খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি অনেক নাটক রচনা করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে 'ধৃতরাষ্ট্র' (১৯৫৭), 'একপেয়ালা কফি' (১৯৬০), 'রজনীগন্ধা' (১৯৬০) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। আধুনিক কালের শক্তিমান অভিনেতা উৎপল দত্তও কতগুলি নাটক রচনা করিয়াছেন। 'ছায়ানট' (১৯৫০), 'অঙ্গার' (১৯৫৯), 'ঘুম নেই' (১৯৬১) প্রভৃতি নাটকে তিনি এ যুগের যন্ত্রণাকে সার্থকভাবে রূপদান করিয়াছেন।